স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(প্রথম খণ্ড)

সপ্তম সংস্করণ, পৌষ, ১৪০৯

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক পঞ্চাশ টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) [2002]
প্রকাশক—স্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০
(উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩৩৪-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

"সাধন কুঞ্জ"
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬-২২০৩২২৮

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

(প্রথম খণ্ড, প্রথমার্দ্ধ)

বাংলা ১৩৫০ সালে (ইংরাজী ১৯৪৩) "অখণ্ড-সংহিতা" প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহার প্রচ্ছদ-পত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সর্ব্বত্রখ্যাত একটি সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতটী সর্ব্বত্র "অখণ্ড-সঙ্গীত" নামে প্রসিদ্ধ।

যথা,—

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥
ছোট-বড় সব এক হয়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণবলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥
অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থপ্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত এবং সহস্র সহস্র জনসভাতে গীত এই সঙ্গীতটী ইহার আগে আরও দুই একখানা পুস্তিকাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু "অখণ্ড-সংহিতা"র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় মুদ্রণের সহিত একটা সুগভীর রহস্যও ছিল। এই "অখণ্ড-সংঙ্গীতে" যে আদর্শ ও তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, "অখণ্ড-সংহিতা"ও সেই তত্ত্ব ও আদর্শই প্রচার করিতেছে। "অখণ্ড-সংহিতা"তে যে বাণী প্রচারিত হইয়াছে, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সেই বাণীর জীবন্ত প্রতীক। সহিত্য-রচনার ধর্ম্মে নহে, জীবনের বিকাশেরই ধর্ম্মে এই মহাগ্রন্থের আবির্ভাব।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমূল্য উপদেশ-বাণী সংগ্রহের কৃতিত্ব একাকী আমাদের নহে। বহু জনের শ্রম এমত্র মিলিত হইয়া এই মহাগ্রন্থের রূপ পাইয়াছে। অপ্রত্যাশিত মহৎ ভাগ্যই শ্রীশ্রীবাবামণির এই দীনাতিদীন সন্তানদ্বয়কে এই সুমহৎ সম্পাদনের সহিত যুক্ত করিয়াছে।

* * *

এমন কোনও সমস্যা নাই, যাহার সমাধানের জন্য লোক পাগলের মত ছুটিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পদপ্রান্তে না গিয়াছে। নিমেষের জন্য দ্বিধা নাই, সঙ্গে সঙ্গে সমাধান মিলিয়াছে। দুর্দ্দান্ত সমালোচক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কত স্নেহভরে কত সমাদরে তিনি মহাতার্কিককেও গ্রহণ করিয়াছেন। আজ তিনি বারাণসীতে তাঁহার সকল কর্ম্মের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, বিশাল বিশ্বের সহিত যোগাযোগ সহজতর হইয়া গিয়াছে। আজ

কত দিগ্দেশ হইতে কত জাতীয় শ্বেতাঙ্গ, পীতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ মুমুক্ষু নারনারী তাঁহার পদতলে আশ্রয় পাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু "অখণ্ড-সংহিতার" উপদেশ-সমূহ যেই সময়কার, সেই সময়ে তিনি মরুভূমিতে জলসিঞ্চন করিয়া চলিয়াছেন,—এক দিকে কঠোর ব্রত "অভিক্ষা" তাঁহাকে সকল দিকের সকল প্রকার অর্থসাহায্য-সংগ্রহ হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছে, অপর দিকে তিনি জনসমাজে অপরিচিত অখ্যাত একজন সাধারণম্মন্য জনসেবক মাত্র। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ভারতীয় নবজাগৃতির, নবসংস্কৃতির ও নবরূপায়নের ইতিহাসে দুইটী অতি অসাধারণ মহাদানের দাতা। শব্দই শক্তি, শব্দই ব্রহ্ম, তিনি দান করিয়াছেন দুইটী মহান্ শব্দ এবং নিজ জীবনে তাহাদের পরিপূর্ণ অনুশীলন করিয়া তাহার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। একটী শব্দ "অখণ্ড", অপর শব্দটী "অভিক্ষা"। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর যাবতীয় সাহিত্য অন্বেষণ করিলে পেশোয়ার হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত কোনও স্থানের কোনও সাহিত্যিক বা দার্শনিক সৃষ্টি-কলার মধ্যে এই দুইটী শব্দকে হয়ত একেবারেই পাওয়া যাইবে না। "অভিক্ষা" একেবারেই নূতন সৃষ্টি, ইনিই ইহার স্রষ্টা ও প্রচারক, নিজ জীবনব্যাপী অফুরন্ত জনসেবার মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্যক্-রূপে নির্ব্বাসিত করিয়া নিয়া দুশ্চর তপস্যায় জনকল্যাণ-দানের ইনিই দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক। আর, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য আদি নানা সম্প্রদায়ের শত প্রকারের সাম্প্রদায়িক মতবাদের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কোনও মত বা পথের বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যা, অসূয়া, নিন্দাবুদ্ধি বা

গর্হণরুচি প্রদর্শন না করিয়া, প্রতিটি খণ্ড খণ্ড মত ও খণ্ড খণ্ড পথ যে একটী মহত্তম, বৃহত্তম, সর্ব্বালিঙ্গনকারী তত্ত্বে আসিয়া মিলিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণস্বরূপ উচ্চারণ করিলেন একটী আভিধানিক শব্দ যাহা নানা প্রয়োজনে, নানা ব্যঞ্জনায়, নানা অর্থে, নানা ক্ষেত্রে, নানা জনে আজকাল প্রতি কথায় ব্যবহার করিতেছেন। সেই শব্দটি হইতেছে "অখণ্ড"।

উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রথম "অখণ্ডমণ্ডলী" স্থাপন করেন। বিশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে তিনি "অখণ্ডের" সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন,—

"যে মে পুত্রাঃসুতাঃ সন্তি ভবন্ত্যখণ্ডসংজ্ঞকাঃ।
যস্মাদখণ্ডাদাদর্শাৎ সর্ব্বে তে মম জীবিতম্।।"

অর্থাৎ, "আমার যেই সকল পুত্র-কন্যা আছে, সকলেই অখণ্ড-আদর্শ গ্রহণহেতু আমার জীবন-স্বরূপ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা 'অখণ্ড' এই সংজ্ঞাতেই সংজ্ঞাত হউক।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

"মণ্ডলীং স্থাপয়িত্বা চ মন্যেত গুরু-বিগ্রহম্।
আনুগত্যঞ্চ তস্যাং হি জানীয়াদ্ গুরু-সেবনম্।।"

অর্থাৎ,—"অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়া তাহাকে শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ শরীর বলিয়া গণনা করিবে এবং সেই মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্যপূর্ণ সেবাকে শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবা বলিয়া জ্ঞান করিবে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

"ব্যক্তিকেন্দ্রিক-সুখাচ্চ প্রত্যাহারকৃতং মনঃ।
প্রেম্নাহি বিনিযোজ্যেত সর্ব্বেষাং কুশলায় চ।।"

অর্থাৎ,—"ব্যক্তিগত সুখ হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া সকলের কুশলে প্রেমসহকারে তাহাকে নিয়োগ করিবে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছেন,—

"আকৃষ্য কীর্ত্তনেন বা স্বাধ্যায়েন স্তবেন বা।
খণ্ডে খণ্ডে বিভক্তান্ চ কুর্য্যাদেকমখণ্ডকম্।।"

অর্থাৎ,—"হরিওঁ নামকীর্ত্তন, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ বা অখণ্ড-স্তোত্রের মধুর সুরে আকর্ষণ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ব্যক্তিগুলিকে ও জাতিগুলিকে এক অখণ্ডে পরিণত কর।"

শ্রীশ্রীবাবামণি উল্লিখিত আদেশ-সমূহ এবং অপরাপর নির্দ্দেশ তাঁহার প্রতিটী পুত্রকন্যার পক্ষে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাকে বাধ্যকর করিয়াছে এবং সমবেত উপাসনার প্রারম্ভে "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠকে বাধ্যকর কিন্তু প্রীতিপ্রদ ও পরমলাভদ স্বাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছে।

প্রধানতঃ সমবেত উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঠ করিবার জন্যই "অখণ্ড-সংহিতা"র প্রকাশ হয়। সমবেত উপাসনাকে অন্য কথায় আমরা "অখণ্ডোপাসনা" বলিয়া থাকি। সেই কারণেই এই মহাগ্রন্থের নামকরণ হয় "অখণ্ড-সংহিতা"। কিন্তু পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন যে, ইহা কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। এই মহা গ্রন্থ-মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলেরই প্রয়োজনীয় উপদেশসমূহ রহিয়াছে। সকলে মিলিয়া পাঠের সময়ে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন, কেননা ইহাতে

অনেকের অনেক ব্যক্তিগত সমস্যারও সমাধান রহিয়াছে, যাহা সকলকে লইয়া পাঠের উপযোগী নাও হইতে পারে।

একই প্রশ্ন দশ জনে দশ সময়ে দশ রকমে করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি দশ জনকেই প্রাণের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উত্তর দিয়াছেন। হতাশ সান্ত্বনা পাইয়াছে, পাপীর চিত্তজ্বালা নিবিয়াছে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের পথনির্দ্দেশ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, যে-কোনও পাঠক বা পাঠিকা নিজ জীবনের দুঃখপ্রদ সমস্যার সরল মীমাংসা এই মহাগ্রন্থের কোথাও না কোথাও পাইবেন। এই মহাগ্রন্থ কত শত বা কত সহস্র নরনারীর যে সংশয়চ্ছেদন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা-নির্ণয় সম্ভব নহে। দুর্ব্বল, সমস্যাকূল, নিরাশ্রয়, ব্রতচ্যুত, পথভ্রষ্ট, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, দিঙ্‌নির্ণয়ে অক্ষম সহস্র সহস্র সংসার-দাব-দগ্ধের জ্বালাময় ক্ষতে এই গ্রন্থের উপদেশ শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়াছে। এই শ্রেণীর যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে স্বকীয় বিশেষত্বে "অখণ্ড-সংহিতা" অতুলনীয়। ইহার কোনও স্থানে এক কণা উপদেশও এমন ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, যাহাতে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সাধকের মনে আঘাত লাগিতে পারে। পরন্তু সর্ব্বশ্রেণীর সাধকেরা ইহাতে সাধন-পথের পাথেয় পাইবেন।

কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি কোনও দেবতার পূজার প্রচারক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর নহেন। যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত এই সকল পূজা করেন বা এমন কি পরবর্ত্তী কালে যেই সকল সমসাময়িক মানববিগ্রহকে ভগবানের আসনে বসাইয়া মানুষ অন্তরের অপার ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ

হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কোনও মত বা পথের তিনি প্রচারক নহেন। নিজের গরীয়ান্ গুরুত্বকে সখ্যের মধুময় আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া, সর্ব্বস্ব দান করিয়াও বিনিময়ে কাহারও কাছে কিছুমাত্র প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া, জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় অর্পণ করিবার পরেও একটী প্রাণীকে নিজের নিকটে কোনও প্রকার বাধ্য-বাধকতার অধীনস্থ না করিয়া ভাবের বৈরাগী অনাসক্ত যোগী অবিরাম চলিয়াছেন, শত শত সহস্র সহস্র বিপন্ন নরনারীকে সহায়তা করিয়া,—ইহাই যাঁহার জীবনকারুর বিশেষত্ব, তিনি প্রচলিত মত ও পথের হট্টগোলের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া না ফেলিয়া সকল মত ও সকল পথের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য কোন্ স্থানে মিলিবে তাহারই করিবেন নির্দ্দেশদান, ইহাই অতিশয় স্বাভাবিক এবং কার্য্যতঃ হইয়াছেও তাহাই। যেই সব বেদবেদ্য পরমতত্ত্ব হইতে জগতের সকল জ্ঞানের আবির্ভাব, এক মাত্র সেই পরম তত্ত্বের সহিত মানবের মনকে লগ্ন করিয়া দেওয়াই তাঁহার মানব-সেবার সাধনা। তিনি কিশোর ও বালকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার-কার্য্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে কোনও নূতন ধর্ম্মমত বা নূতন ধর্ম্মপথের নির্দ্দেশ দান করিবার প্রয়াস পান না। ভারতের যাহা আদি সনাতন সত্য, যাহাকে অবলম্বন করিয়াই ঋষির ভারত জড়-উপাসক ভারতের উপরে নিজ প্রভাব বিস্তার করিল, যাহার মহিমায় এক এক করিয়া কত কত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ ইহারই অঙ্গীভূত হইয়া আর্য্যপথ বলিয়া স্বীকৃত হইল, সেই আদি সনাতন পথই তিনি বাছিয়া লইয়াছেন, প্রচলিত কোনও মতের সহিত

বিরোধে না মাতিয়া, প্রচলিত কোনও মতকে গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ে মানিয়া না লইয়া সকলকে সকলের নিজ নিজ পথে ও মতে লাগিয়া থাকিবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া তিনি সকল মত ও পথের মিলনের উপায় আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ নিম্নোদ্ধৃত অখণ্ড স্তোত্র হইতেই প্রতিভাত হইবে।

১। ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেমসুখাবহম্,
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ব্বস্বং পরামানন্দ-বর্দ্ধকম্,
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দ-বিগ্রহম্,
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্,
ন্যান্যঃ প্রিয়তরো যস্মাৎ নাভূন্ন বা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্।। ১।।

২। ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন, ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্তু তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কামপূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামূত্র চৈতন্যম্ আত্মসংস্থিতম্;
প্রাণদং প্রেমদং পূণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্।। ২।।

৩। ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকম ;
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্,
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা-বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তি-ব্যাকুল-চেতসঃ,
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্তা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্।। ৩।।

শ্রীশ্রীবাবামণি পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ যেই সকল অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, তাহারা নিত্য পাঠের এক ধর্ম্মগ্রন্থ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহাই এই গ্রন্থের এক মাত্র বিশেষত্ব নহে। প্রথম সংস্করণ দুই হাজার করিয়া ছাপা হইয়াছিল, তাহার সকলই অল্প সময়ে নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার অংশবিশেষের অনুলিখন করিয়া করিয়া নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠানের উৎসবাদিতে পঠিত হইতেও আমরা দেখিয়াছি। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার বারো বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আশ্রমকর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে পাঠ করিয়া শুনাইয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় সে সকল পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ নানা দৌরাত্ম্যে নষ্ট হইয়াছে।

সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। এই বিলম্বের কারণ অযাচক আশ্রমের অভিক্ষাব্রত। “অযাচক আশ্রম” ভিক্ষা করেন না, যাচ্ঞা করেন না, চাঁদা সংগ্রহ করেন না। একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী আশ্রম-সেবকেরা, নিজেদের আদর্শদাতা গুরুদেবের জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যতটুকু জীবসেবা সম্ভব, অভিক্ষার মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ পথ বড়ই বন্ধুর, এই ব্রত বড়ই কঠোর,—তাই এই পথে বিচরণ-কারীরা দ্রুত-ধাবনের নৈপুণ্য-প্রদর্শনে সমর্থ হন না। ইতি—বিজয়া দশমী, ১৩৬১

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

নিবেদিকা
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অখণ্ড সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

—শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ—

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

উপহার

....

....

....
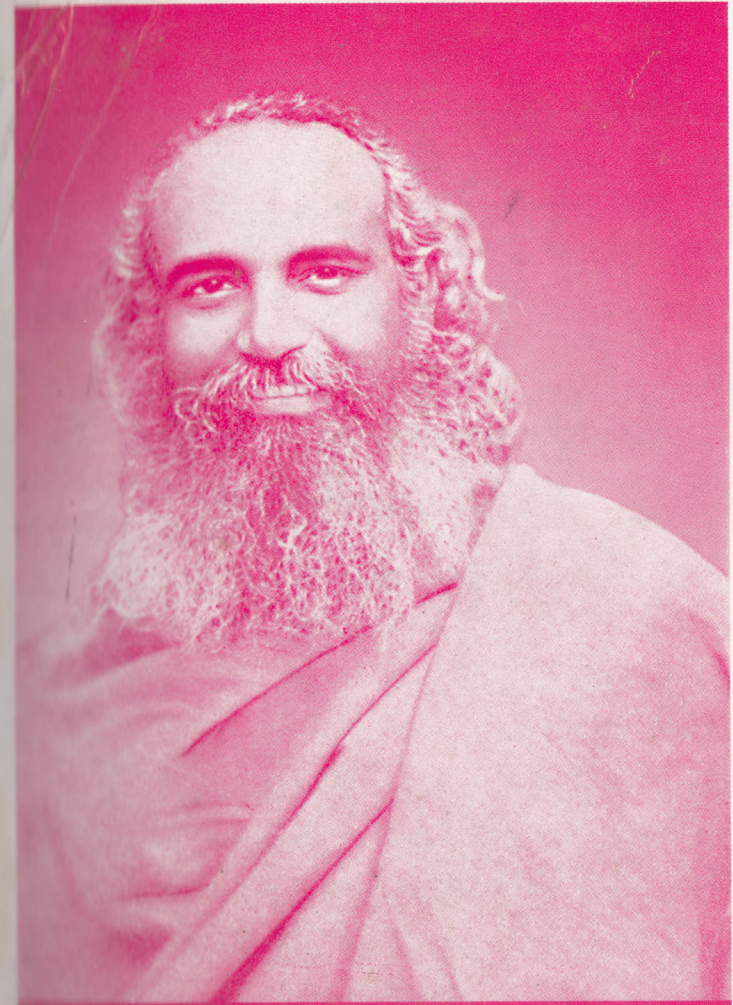
অখন্ডমন্ডলেশ্বর
শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

প্রথম খণ্ড

—ঃ (*) ঃ—

কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কয়েক দিবস যাবৎ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের একটি ছাত্র নববর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীবাবামণির একটি বাণী সংগ্রহের জন্য আসিয়াছেন।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার নিজের কোনও বাণী নেই। অতীত এবং বর্ত্তমানের শত সহস্র মহাপুরুষের কাছে

আমার অশেষ ঋণ। আমি তাঁদের প্রতিধ্বনি মাত্র। দেবার মত নিজস্ব কোনও বাণী আমার নেই।

যুবক বলিলেন,—আপনার লেখা ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের যে সামান্য পরিচয় আছে, তাতে আমরা স্পষ্ট অনুভব করেছি, যে, আপনি নিশ্চতই কারো প্রতিধ্বনি নন।

কয়েকজন বিশাল ও বিশিষ্ট চিন্তা-নায়কের নাম করিয়া এবং তাঁহাদের লেখার সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির কয়েকটি লেখার তুলনা করিয়া তৎপরে যুবকটি বলিলেন,—বিনয় ক'রে আপনি নিজেকে যাই বলুন, সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, আপনার ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ মৌলিক, আপনার চিন্তা ধার-করা ভাবুকতা নয়, আপনার পরিকল্পনা অপর কোনও নামজাদা ব্যক্তির সুকৌশল অনুকৃতি নয়,—ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে আপনি সম্পূর্ণ পৃথক, সম্পূর্ণরূপে বৈশিষ্ট্যশালী এবং স্বকীয় ব্যক্তিত্বের মহিমায় সুমহান্।

অনুধ্বনি

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাহ'লে আমি অনুধ্বনি। অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তিরা যাঁরা যা বলেছেন, করেছেন বা ভেবেছেন, আমি তাঁদের অনুকরণ করবো বলেই অনুরূপ বলি না, করি না বা ভাবি না। কিন্তু তাঁরা যে যা বলেছেন, যে যা করেছেন, যে যা ভেবেছেন তার প্রভাবকে আমি অস্বীকার করি না। ওস্তাদ তাঁর সুরবীনে মেঘমল্লার বাজাচ্ছেন, সাক্‌রেদ তার সঙ্গে সঙ্গে

ওস্তাদের স্বরগ্রামের আরোহণ অবরোহণের সাথে সাথে নিজের বীণার সুর ভাঁজছেন। একে বলে অনুকরণ। কিন্তু দিকে দিকে কত বীণায় যে তার পরান আছে, সেই সুরসাধা বীণার তারে এসে মেঘমল্লারের মূর্চ্ছনা যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে। তাতে, যে বীণা যেমন ভাবে বাঁধা, তেমন ভাবে ঝঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে। এর নাম অনুধ্বনি। অনুধ্বনির কোনও মূল ধ্বনির অনুকরণ করে না, কিন্তু যেখানে যে সুর-লহরীর উত্থান-পতন হচ্ছে, সেখানেই নিজের মনের মত ক'রে ঝঙ্কার আস্বাদন করে। আমাকে যদি কারো প্রতিধ্বনি বলতে না চাও, তাহ'লে ব'লো অনুধ্বনি। প্রতিধ্বনির নিজস্বতা নাই, ধ্বনির সে অবিকল প্রতিরূপ, "His Master's voice"। অনুধ্বনির পরবশ্যতা নাই, যেখানে যে ধ্বনি যেমনি বাজুক, সে তার নিজ ধাতের অনুযায়ী সুরটুকুর ঝঙ্কার মাত্র নিজেতে তোলে এবং হাম্বীর বাজাতে বাজাতে ধ্বনি যখন একবার কড়ি-মধ্যমে আসে আর একবার ধৈবতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে, অনুধ্বনি হয়ত সেই সময়ে নিজের ভিতরে শুধু কড়ি মধ্যমের আর ধৈবতের মাঝখান থেকে সাড়া আহরণ করছে এবং তারই ঝঙ্কার তুলে তার ভিতরে সূক্ষ্ম শ্রুতিগুলির কাজ কচ্ছে। ধ্বনিতে যা আছে, প্রতিধ্বনিতে তাই আছে, বরং অনুকরণের অক্ষমতা হেতু কিছু কমও আছে। ধ্বনিতে যা আছে, অনুধ্বনিতে তার অল্পই আছে, কিন্তু যেখানে যে অল্পটুকু আছে, তার ভিতরেও নিজস্বতার পরিপুষ্টি ও পরিবিকাশ এত যে, ধ্বনির যে সেটা গৌণ

প্রভাবে সৃষ্ট, একথা বিচার করেও বোঝা কঠিন। এই জন্যই বলছি, আমাকে প্রতিধ্বনি বলতে না চাও, অনুধ্বনি বল।

যুবক বলিলেন,—কিছুদিন আগে আমি অমুক মঠে তাঁদের এক মহাপুরুষের তিরোধান-উৎসব উপলক্ষ্যে সৎসঙ্গ কর্‌তে গিয়েছিলাম। দেশের বর্ত্তমান চিন্তানায়কদের প্রসঙ্গ উঠল। যাঁর নামই ওঠে, বিচারে সাব্যস্ত হ'য়ে যায় যে, এখনও তাঁর চিন্তা দেশ ও জাতির উপর তেমন কিছু মঙ্গল-প্রভাব বিস্তার করেনি। কেউ হয়ত খুবই ভাল লেখেন কিম্বা খুবই চমৎকার বলেন কিন্তু তাঁদের কথা মানুষের মর্ম্মকে ভেদ করে না। এই সময়ে আমি আপনার লেখা "কর্ম্মের পথে" পুস্তিকা খানা পকেট থেকে বের ক'রে একটার পর একটা অনুচ্ছেদ আগাগোড়া পড়ে গেলাম। সকলেই এক নিঃশ্বাসে শ্রবণ করলেন এবং পড়া শেষ হবার পরে নিঃস্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। আমি বল্‌লাম,—এই একজন চিন্তানায়কের আবির্ভাব লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়, যাঁর বাণী মর্ম্মকে ভেদ করে, শুধু চামড়া ছুয়েই যাঁর হস্তনিক্ষিপ্ত বাণ ভূতলশায়ী হয় না। অমনি একজন সাধু উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন,—ওটা আর একটা নূতন জিনিষ কি হ'ল হে? প্রত্যেকটা কথা যে আমাদের মঠের প্রতিষ্ঠাতার নকল হে, সম্পূর্ণ নকল। একটা প্রতিধ্বনিকে তুমি মৌলিক জিনিষ ব'লে চালাতে চাও?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সাধুজী ঠিকই বলেছেন। যিনি যত সুন্দর সুন্দর কথাই বলুন, তাঁর আগে কেউ না কেউ সে কথা নিশ্চয়ই দুটী চারটী কখনো বলেছেন। কিন্তু কে যে

কার প্রতিধ্বনি, আর কে যে কার প্রতিধ্বনি নয়, সেইটি নিয়েই মুস্কিল হে। কিছুদিন আগে কাশী থেকে একজন মহাবাগ্মী স্বামীজী কলকাতায় এসে ধর্ম্মবক্তৃতা দিচ্ছিলেন। খুব ভালো বক্তৃতা। একজন ব'লে বসলেন,—ইনি বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি। অমনি আর একজন ব'লে বস্‌লেন,—বিবেকানন্দ ত' রাজা রামমোহনের প্রতিধ্বনি। খুব কলহ বেঁধে গেল। দুই পক্ষের ধারালো ধারালো যুক্তি। আমরা অসহায় শ্রোতা, যিনি যা বলেন, তাই শুনে যাচ্ছি। এক পক্ষ বল্‌ছেন,—বিবেকানন্দই ভারতে প্রথম দেখালেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মকে প্রচার করা যায়, প্রচার করা উচিত এবং প্রচারের দায়িত্ব সন্ন্যাসীদেরই স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন; বিবেকানন্দই বল্‌লেন, ভারতের মৃত্তিকা স্বর্গের স্বর্ণরেণু, ভারতের ধর্ম্ম নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আর আজ কাশী হ'তে আগত এই স্বামীজী কলকাতা এসে সেই কথাগুলিই ব'লে বেড়াচ্ছেন। অপর পক্ষ বল্‌লেন,—ভারতবাসী যে বিবেকানন্দকে স্বর্গের দেবতা ব'লে পূজা করে, তার কারণ তাঁর বেদান্ত নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠও নয়, তিনি যে নারীর উন্নতির জন্য অন্তরে আবেগ অনুভব করেছেন, স্ত্রীজাতিকে 'Manufacturing Machine' এ পরিণত ক'রে রাখার প্রতিবাদ করেছেন, ছুৎমার্গের তীব্র নিন্দা করেছেন, জাতিভেদের অবিচারে জর্জ্জরিত সমাজে অত্যাচারিত নিপীড়িত জনসমাজের স্বাধীন সহজ বৃত্তির জন্য ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছেন, তাঁর এই মহামানব-মূর্ত্তিই তাঁকে দেশপূজ্য করেছে; কিন্তু রাজা

রামমোহনের লেখা খুঁজে দেখ, এর প্রত্যেকটি কথা বিবেকানন্দের আগেই রামমোহন রায় ব'লে গেছেন। এভাবে কে যে কার প্রতিধ্বনি, তাই নিয়ে তুমুল তর্ক চল্‌ল কিন্তু কোনো মীমাংসায় কেউ পৌঁছুতে পারলেন না বা আপোষও কেহ কর্ল্লেন না। আমরা নিরীহ শ্রোতার দল আস্তে আস্তে মল্লভূমি ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান কর্ল্লাম।

পূর্ব্বগ-গণের নিকট আপাদমস্তক ঋণ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখহে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা এই যে, আমি পূর্ব্বগ-গণের কাছে আপাদমস্তক ঋণী। কেশাগ্র থেকে পদনখাগ্র পর্য্যন্ত আমার শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রতঙ্গের প্রত্যেকটা অণুপরমাণু একটা না একটা মহাভাব বহন ক'রে বেড়াচ্ছে এবং সেই মহাভাবগুলি সব আমি অপরের কাছ থেকে পেয়েছি। ক, খ, আমি নিজে শিখিনি, আর কেউ এসে শিখিয়ে গেছেন। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তার বিচার শৈশবাবধি অন্যলোকে আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। একজন যদি বলেছেন, মিথ্যা কথা পাপ, অপরজন এসে বলেছেন, পরনিন্দা পাপ, তৃতীয় এক ব্যক্তি বলেছেন, পরধনে দৃষ্টি দেওয়া পাপ, চতুর্থ এক ব্যক্তি বলেছেন, পরানিষ্ট চিন্তা করা পাপ। এক এক জনের এক একটী কথা এক এক রকমে আমার কর্ম্ম, বাক্য, চিন্তা এবং জীবনকে গঠন করেছে। এখন বল,—আমি এঁদের কারই বা প্রতিধ্বনি বটি,

আর কারই বা প্রতিধ্বনি নই? আপাদমস্তক যার ঋণ, সে কার কাছে ঋণ স্বীকার কর্ব্বে, আর কার কাছে তা কর্ব্বে না? একটা মোটরকারের টায়ার যদি হয় ইংল্যাণ্ডে তৈরী, টিউব যদি হয় ফ্রান্সে তৈরী, স্প্রিং যদি হয় জার্ম্মাণীতে তৈরী, সিলিণ্ডারগুলি যদি হয় পোল্যাণ্ডে তৈরী, পেট্রলট্যাঙ্ক যদি হয় রাশিয়ায় তৈরী, বডি যদি হয় তুরস্কে তৈরী, হুড যদি হয় জাপানে তৈরী, তা'হ'লে, সবগুলি একত্র ফিট করার পরে তার গায়ে কি লেবেল দেওয়া চল্‌বে Made in Italy, ("ইটালীতে প্রস্তুত")? যাঁদের বই পড়ি নাই, তাঁদের কাছেও আমি ঋণী। কারণ, তাঁদের বই যাঁরা পড়েছেন, এমন লোকদের কাছে সৎকথা আমি শুনেছি। যাঁদের কথা শুনি নাই, তাঁদের কাছেও আমি ঋণী, কারণ তাঁদের কথা যাঁরা শুনেছেন, এমন লোকদের কাছে সৎকথা আমি শুনেছি; রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা দিন-মজুরের সঙ্গে যদি এক মিনিট কথা কও, তাতেও তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে তার কাছ থেকে কিছু ঋণ সংগ্রহ কর। একটা লোকের মুখপানে যদি নিঃশব্দে দু-মিনিট তাকাও, তাতেও তুমি নিজের অজ্ঞাতসারে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ কর। তোমার নিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, জগৎ তোমাকে দশ দিক্ থেকে অবিরাম শুধু ঋণ দান ক'রে যাচ্ছে। একটী মিনিট বেশী বাঁচো ত' একটী মিনিটের জন্য তোমার ঋণের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। জগতের যত বস্তু, যত প্রাণী, সব এক একটা লোন-অফিস। যে দিকেই চল, যে দিকে বস, কিছু কিছু ঋণ নিতেই হবে। যতবার

নিঃশ্বাস টানছ, ততবার ঋণ গ্রহণ কচ্ছ। সুতরাং যত মহৎ তোমার আগে গিয়েছেন বা এসেছেন, সকলেরই তুমি প্রতিধ্বনি। এ কথায় রুষ্টিরও কিছু নেই, তুষ্টিরও কিছু নেই।

জগতের সেবার মধ্য দিয়া ঋণ-পরিশোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আমরা যে কত ঋণী আছি, সে কথা স্মরণ রাখি না বলেই ত' জগৎকে কে কত দান করেছি, তার গৌরব ক'রে বেড়াই। জগৎ আমাকে নিজের ভাণ্ডার থেকে সম্পদ প্রদান ক'রে কোটিপতি করেছে, আমি তাকে বিনিময়ে অশ্রদ্ধার দু'একটী কাণা-কড়ি দিয়েই মনে কচ্ছি যে, আমার মত দাতা আর কে আছে? নববর্ষের বাণী সংগ্রহ করতে এসেছ ত'? তবে শোন। নিখিল জগতের কাছে তুমি আকণ্ঠ খণে মগ্ন। জগতের সেবার ভিতর দিয়ে, এই ঋণ তোমাকে পরিশোধ কত্তে হবে। অকপট নিরহঙ্কার মনে, সরল নিরভিমান প্রাণে জগৎকে তোমার সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য বুদ্ধি-প্রতিভা দিয়ে পরিচর্য্যা কর্ত্তে হবে। জগৎকে সেবা দিয়ে জগতের কোনো উপকার যে তুমি কচ্ছ না, তোমার নিজেরই যে উপকার কচ্ছ, নিজেকেই যে ঋণমুক্ত কর্ব্বার প্রয়াস পাচ্ছ, এই কথা স্মরণে রেখে জগৎকে সেবা দিতে হবে। আমি ঋণী আছি, এ কথা স্মরণে রাখলে, জগৎকে সেবা দিয়ে তার জন্য আর অহঙ্কার আসে না, কিম্বা এই সেবার বিনিময়ে জগতের কাছ থেকে আমার প্রাপ্য কিছু আছে, একথাও মনে জাগে না।

'তোর কি মনে থাকে না?
জগৎ মাঝে সবার কাছে
আছে রে কত দেনা?
প্রতি বিন্দু রক্ত রে তোর,
দিলেও ঋণের নাহিক ওর,
লক্ষ জনম দিলেও ঢেলে
এ দেনা শোধ হবে না।
জন্ম জন্ম আসতে হবে
এই অনিত্য মিথ্যা ভবে,
বিশ্বজনার সেবার তরে,
হয়ে যে আছিস্ কেনা?'

কলিকাতা

২রা বৈশাখ, ১৩৩৪

ত্রিপুরা বিদ্যাকুট-নিবাসী জনৈক ভক্ত-যুবক শ্রীভূপেশ চন্দ্র বর্ম্মণ শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আগমন করিয়াছেন।

অসাম্প্রদায়িকতা

তিনি বলিলেন,—আপনার সহিত প্রথম দর্শনের কথাগুলি আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই যে আপনি বল্লেন,—'সকল সম্প্রদায় আমার কিন্তু আমি কোনো নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নই'।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এত কথাও তোর মনে আছে?

তিনি বলিলেন,—আছে বৈ কি! আরো কত কথা মনে আছে। তৎপরে তিনি শ্রীশ্রীবাবামণি সম্বন্ধে এক স্মৃতি-কথা দেখাইলেন।

স্মৃতি-কথা

তিনি পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন,—

"প্রবাসে যখন আমি পড়িতে যাই, তখন জন্মভূমির ছাত্র-সমাজের যে মূর্ত্তিটা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিছুদিন পরে যখন পারিবারিক কারণে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলাম, উহা যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, যাহারা নিজেদের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিত না, এমন অনেক ছাত্রের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নূতন উৎসাহ যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বারা শরীর গঠনে মনোযোগী হইয়াছে, কেহ কেহ সদ্গ্রন্থের পঠন ও পাঠনে উদ্যোগী হইয়াছে, কেহ সংযম, সদাচার ও পবিত্রতার ভাব অপরাপরের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং অধিকাংশই নিয়মিত ভাবে ভগবদুপাসনা করিতেছে। আরও লক্ষ্যে পড়িল যে, অভিভাবক-সমাজের ভ্রূকুটী সত্ত্বেও ছাত্র-সমাজের এই উন্নতির-স্পৃহা দমিত হইতেছে না।

"আমি বিস্মিত হইলাম। ব্যাপারটা আমার নিকট আশ্চর্য্যবৎ বোধ হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগের স্কুলের ছাত্র, যাহারা না পায় শিক্ষকদের মুখ হইতে জীবন-গঠনোপযোগী সৎকথা শুনিতে, না পায় তাহাদের জীবনের কোনও দৃষ্টান্ত

হইতে মূল্যবান্ ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে, তাহারা যে হঠাৎ নূতন প্রণালীর জীবন যাপন করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইহা আমার নিকটে একটা কৌতুককর রহস্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দুই একটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারখানা কি? কিন্তু তাঁহারা প্রথম প্রথম যেন একটু চাপিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে জানিতে পারিলাম, বিদ্যাকূট হইতে মাইল দুই দূরে বাঘাউড়া গ্রামে কিছুদিন যাবৎ একজন সাধু আসিয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ নাকি ছাত্র-সমাজে এই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

"সাধুদের সম্বন্ধে আজি কালিকার লোকের ধারণা খুব ভাল নহে। আমি গঞ্জিকাসক্ত, অদৃষ্টবাদী, পরানুগ্রহজীবী সাধুনামধারী বহু ব্যক্তির জীবন-সম্পর্কেই বহু অপ্রীতিকর কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। সুতরাং 'সাধু' আসিয়াছেন শুনিয়াই বড় একটা হৃষ্ট হইলাম না। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলাম যে, স্কুল ছুটীর পরে প্রায় প্রত্যহই বিদ্যাকূট হইতে বহু যুবক তাঁহাকে দেখিতে যায় এবং একবার যে যায়, দ্বিতীয়বার যাইবার প্রলোভন সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না, একবার যে সাধুর মুখের একটী কথা শুনিয়া আসে, সে-ই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তখন মনটাকে যেন আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না। সাধুজী নাকি একজন মস্তবড় গায়ক, ছেলেদের নাকি তিনি বড়ই ভালবাসেন, তিনি নাকি বড়ই মধুরভাষী। ফলে, আমার সাধু-দর্শনের জন্য এক প্রচণ্ড আগ্রহ জাগিল। বলা বাহুল্য, এ আগ্রহ ধর্ম্মলাভের জন্য নয়, কৌতূহলই এই ঔৎসুক্যের একমাত্র উৎস।

"সুতরাং একদিন বাঘাউড়া রওনা হইলাম। বন্ধুদের মুখেই শুনিয়াছিলাম, সাধুজী অতিশয় পরিশ্রমী, এক মিনিট সময়ও বৃথা ক্ষেপণ করেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বাস্তবিক দেখিলামও তাই। সম্মুখে একটী ছোট ডেস্ক,—তিনি রাশীকৃত পত্র লেখায় ব্যস্ত। পরে জানিলাম, নানা স্থান হইতে ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার ও জীবনগঠন সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সমীপে যে সকল পত্র আসিয়া থাকে, ইহা তাহারই উত্তর।

"সাধুজীর চেহারা উজ্জ্বল, পরিধানে গৈরিক, মাথায় লম্বা চুল। আমার চ'খে বড় সুন্দর লাগিল। সঙ্গীদের মধ্যে একজন ইতিপূর্ব্বে সাধুজীর নিকটে আরও যাতায়াত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিলে আমরা সকলে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলাম। সাধুজীর পাদ-স্পর্শ-মাত্র আমার মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হইল।

"ক্রমে কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া তিনি একে একে আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক এক জনের নাম জিজ্ঞাসা করেন, আর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে কিয়ৎকাল তাকাইয়া থাকেন। তাঁর চক্ষু দিয়া সেই সময় যেন একটা জ্যোতির প্রবাহ ছুটিয়া আসিতে থাকে। কেহ কেহ যেন ঐ দৃষ্টিমাত্রই কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় শক্তির স্পর্শ অনুভব করিতে থাকে। এক এক জনের নাম জিজ্ঞাসা করেন, আর একটুখানি তাকাইয়াই তার নামের একটা ব্যাখ্যা শুনান।

"একজন বলিল,— তার নাম নগেশ।

"তিনি বলিলেন,—ন গচ্ছতি ইতি নগঃ। যে চলে না। বিঘ্ন-বিপত্তি, দুঃখ-দৈন্য কিছুতেই যিনি বিচলিত হন না, তাকেই বলি নগ বা পর্ব্বত। 'নগ'দের মধ্যে, 'ধীর' ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই নগেশ। ইন্দ্রিয়-সংযম কর্লে মানুষ নগেশ হ'তে পারে।

"একজন বলিল, তার নাম দেবেন্দ্র। সাধুজী বলিলেন,—দিব্যন্তে বৈ দেবাঃ, জ্ঞানের আলোকে যাঁরা দীপ্তিমান্ হন, তাঁদের বলি দেবতা। তাঁদেরও যে রাজা, তাকে বলি দেবেন্দ্র। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমীরই যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। অসংযমীর হয় না। খাঁটি যদি দেবেন্দ্র হ'তে হয়, সংযমকে লাভ কত্তে হবে।

"একজন বলিল,—তার নাম হরিপ্রসাদ।

"সাধুজী বলিলেন,—যিনি পাপ হরণ করেন, তিনিই হরি। সেই হরির যে প্রসন্নতা সম্পাদন কত্তে পারে, তার নাম হরিপ্রসাদ। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হন পবিত্রতায়, সংযমে, ব্রহ্মচর্য্যে।

"আমি বলিলাম,—আমার নাম ভূপেশ।

"সাধুজী বলিলেন,—ভূপ+ইশ=ভূপেশ। অর্থাৎ রাজার রাজা। বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষই ভূপেশ, যদি সে ইন্দ্রিয়জয়ী হয়।

"তৎপরে তিনি আমাদের নিকট লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন-কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি শুনাইতে লাগিলেন, শুধু আশ্বাসের বাণী। দুর্নীতির দুঃখময় পথে

পদার্পণ করিয়া যে মরণোম্মুখ হইয়াছে, সেও যে বাঁচিবে, সেও যে মানুষ হইবে, তিনি বাজাইতে লাগিলেন শুধু সেই আশার বীণা। তিনি বলিলেন,—'লেগে যাও প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে, দেখো জীবন গঠিত হবেই হবে। অদৃষ্টে নির্ভর ক'রোনা, অতীত কথা ভেবে হতাশ হ'য়োনা, নিজের বাহু-বলকে বিশ্বাস কর, ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কর, অদৃষ্টের বিধানকে পুরুষকার দিয়ে বদ্‌লে নাও, মৃত্যুকে অমৃতে রূপান্তরিত কর।'—কথাগুলি আমার কাছে অমৃতের মতই লাগিতে লাগিল।

"অবশেষে আমাদের মধ্যেই একজন প্রশ্ন করিলেন,—আপনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?

"সাধুজী উত্তর করিলেন,—'জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের, কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব,—সবাই আমার, আমি সবার। হিন্দু, মুস্‌লিম, খ্রীষ্টান, সবাই আমার, আমি সবার।'

"ইহার পর তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। বুঝিলাম, সাধুজী 'সম্প্রদায়' নামক কোনও গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহেন, বিশ্বমানব তাঁহার সেবার সামগ্রী, সকলেরই জন্য তিনি নিজের কল্যাণ-বুদ্ধি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার জীবন-সাধনায় সম্প্রদায়বুদ্ধির স্থান অতি নীচে। আমি কিন্তু মুগ্ধ হইলাম। মনে হইল এই মানুষটির প্রত্যেকটী কথা যেন আগুনের মত উগ্র, বজ্রের মত ঘোর-নিনাদী। আমি আমার জীবনের সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে যেন নিমেষের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়তে দেখিলাম।

"ইহার পরে আরও একদিন সাধুদর্শনে গেলাম। তিনি বলিলেন,—'তোর চেহারার ভিতরে ভাব আছে, তুই কবি হবি।' তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, কোনও রকমে অক্ষর গণিয়া দুই চারি পংক্তি কবিতা রচনা করিতে পারিতেছি। সঙ্গীরা একজন বলিলেন,—'ভূপেশ কবিতা লিখিতে পারে।' সাধুজী বলিলেন,—'বটে! ভাল কথা। কিন্তু কথার কবি চাই না, কাজের কবি চাই। সমগ্র জীবন ভ'রে এমন সব কাজ ক'রে যেতে হবে যেন সবগুলি মিলে একটা অপূর্ব্ব মহাকাব্যের রূপ পায় এবং সে কাব্য যেন জাতি, দল বা সম্প্রদায়-বিশেষেরই আদরের না হয়, পরন্তু সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের প্রাণের জিনিষ হয়।'

"১৩৩১ এর ১৬ই আষাঢ় সাধুজী আমাকে সাধন দিলেন। বলিলেন,—'পন্থাহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকা বড় বিপদ। কল্যাণের নিরাপদ এই পথটী নিয়ে এগিয়ে যাও, উৎকৃষ্টতর পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত এটা ছাড়বে না।' *

* (ক) শ্রীযুক্ত ম—কে ডাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'বল্ দেখি, আমার চেয়ে বড় লোকের সঙ্গে যদি তোর কখনো সাক্ষাৎকার হয়, তখন কি কর্‌বি?' ম—বলিলেন,—'এই কথাটা আমিও ভেবেছি, কিন্তু কিছু ঠিক কত্তে পারি নি।' শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আমার চাইতে বড় কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে নিঃসঙ্কোচে, তাঁর অনুসরণ কর্‌বি, নির্ভয়ে অমাকে ছেঁড়া নেক্‌ড়ার মত অনাবশ্যক আবর্জ্জনা মনে ক'র বর্জ্জন কর্‌বি। তবে একটী কথা আছে। শুধু মহাপুরুষটী বড় হ'লেই চলবে না, তোমার প্রতি তাঁর দানটীও বড় হওয়া চাই। সোনার মোহর না পেয়ে রূপোর টাকাতে অনাদর করবে না।' (২৭শে, পৌষ, ১৩২৯, বাঘাউড়া)।

সাধন সম্বন্ধে তিনি আরও বলিলেন,—

"আমরা সুখেই থাকি আর দুঃখেই থাকি, ভগবান্ সবই দেখতে পান। তিনি আলোকে আঁধারে আমাদের সদা-সতর্ক প্রহরী। তিনি যখন সকলই দেখেন, সকলই জানেন, তখন,—হে ঈশ্বর আমাকে ধন দাও, দৌলত দাও এসব ব'লে প্রার্থনা কর্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই! যখন আমরা পাবার উপযুক্ত হব, তখন ভগবানের দান সহস্র ধারায় আপ্‌নি নেমে আসবে। কাজেই উপাসনা কত্তে যথাসাধ্য কামনা-রহিত হ'য়েই ক'রো। সাধনের বলেই পরমেশ্বরের ধনভাণ্ডার থেকে যথাভিরুচি সৌভাগ্য তুমি কেড়ে আন্‌তে পার্‌বে, আর প্রেমের ঠাকুর তাতে নিষেধও কর্ব্বেন না।"

স্মৃতি-কথা এই পর্য্যন্তই লেখা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি শুনিয়া বলিলেন,—লিখেছ বেশ, কিন্তু বাছা, কলমের জোর কামানের চাইতে বেশী। কামানের গুলি খেয়ে যে মর্‌বে না, কলমের খোঁচায় তারও দফা ঠাণ্ডা হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত ন—শ্রীশ্রীবাবামণিকে পত্র লিখিয়াছেন,—'তোমার পায়ে যেন আমার মতি থাকে, এই আশীর্ব্বাদ চাই। পত্র পড়িয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'যাঁর পায়ে মতি থাক্‌লে সকল সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, তাঁর পায়ে তোর মতি হোক্, আর এর জন্য আবশ্যক হ'লে আমার মাথায় তুই পদার্পণ কর্। তৎপরে পত্রোত্তরে লিখিলেন,—'সত্যের সেবাই গুরুর সেবা, সত্যের যে দ্রোহী, সে গুরুর দ্রোহী। যে সাধন পাইয়াছ, যদি তাহা তোমাকে পরম-সত্যে না পৌঁছায়, তবে আমাকে শুদ্ধ ইহা পরিত্যাজ্য, এবং উৎকৃষ্টতর সাধন উপযুক্ত স্থান হইতে গ্রাহ্য।' (মাঘ ১৩৩২, ময়মনসিংহ)।

চামারের বৃত্তি—সেবকের সেবা

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইলে ভক্ত বিদায় লইলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় দুইটী বালককে লইয়া আগমন করিলেন। ইহারা শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্যস্তভাবে নিজেদের পায়ের জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত কাণ্ড কত্তে হবে না, জুতো পায়ে দিয়েই তোরা প্রণাম কর্, হাঙ্গামায় যাস্‌নে।

কিন্তু ভক্তেরা শুনিলেন না। ঘরের দরজায় সারি সারি জুতার পানে তাকাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সকৌতুকে বলিলেন,—দেখ্, রাস্তা দিয়ে যত লোক যাবে, তারা কি মনে কর্ব্বে জানিস্? তারা ভাব্‌বে, এই ঘরে বুঝি চামার বাস করে, সে ব'সে ব'সে দিনরাত জুতোই সেলাই করে; অনেক জুতো কিনা!

শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাস্‌বার কথা নয় বাবা, চামার হ'তে পারাটাও একটা কম কথা নয়। দেখ্ জুতার জন্ম পরের চরণকে ক্ষত ও আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য। প্রতি পদক্ষেপে সে নিজে ক্ষয়িত হয় কিন্তু অপরের পদযুগলকে নিরাপদ রাখে। সুতরাং পাদুকা প্রকৃত প্রস্তাবে অতি উত্তম শ্রেণীর সেবক। চামার সেই পাদুকাকে সেলাই করে, সেই পাদুকার সেবা-

ক্ষমতাকে সে অটুট রাখবার জন্য শ্রম করে। সুতরাং সে সেবকেরও সেবক। যে পরের সেবা করে, তাকে সেবা করা কম ভ্যাগের কথা নয়। মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা বিপুলা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সেবা করেন, সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা যে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের সেবা ক'রে তাঁদের সেবা-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে নিখিল জগতেরই সেবা হয়।

বুদ্ধিমান্ কে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে লইয়া হেদুয়াতে (কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার) বেড়াইতে গেলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্ দেখি, সকলের চাইতে বুদ্ধিমান্ কে?

সকলে উত্তর দিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে নানা কথা পাড়িলেন। কথার পর কথা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল, স্রোত যেন আর থামিতে চাহে না। শ্রীশ্রীবাবামণি এবং অপরাপরেরা নীরবে শুনিতে লাগিলেন। যখন বুঝা গেল যে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আর ভদ্রলোকের কথার ফোয়ারা শেষ হইবে না, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি আগন্তুকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পার্কের অন্য এক অংশে একটু নিরিবিলি জায়গা দেখিয়া বসিলেন। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। অল্পকাল পরে আরও কয়েকজন ভদ্রলোকও আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কেমন রে, উত্তর পেলি ত', কে বুদ্ধিমান? সব চাইতে যে কম কথা বলে আর নিঃশব্দে নিজের কাজ ক'রে যায় সে-ই বুদ্ধিমান্।

সুরেন্দ্র।—চুপ ক'রে থাক্‌লেই কি বুদ্ধিমান্ হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সেই সে চতুর।' চুপ ক'রে থাক্‌লেই হ'ল না, চুপ্ ক'রে থেকে ভগবানের স্মরণ কত্তে হবে, আসল কাজের দিকে খেয়াল রাখ্‌তে হবে।

যথার্থ কৃষ্ণ-ভজন

আগন্তুকদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—কালীকে ভজলে কি কোন দোষ হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন হবে? যেই কালী, সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মানে তোমার ইষ্ট। নিজ ইষ্টকে যে ভজনা করে, সেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ ভজ্‌তে হ'লেই নন্দ-নন্দনকে ভজ্‌তে হবে, তা' নয়। কারো কৃষ্ণ নন্দঘোষের ছেলে, কারো কৃষ্ণ বা মেরীর ছেলে যীশু, কারো কৃষ্ণ কালী, কারো কৃষ্ণ দুর্গা, কারো কৃষ্ণ শিব। যার যার ইষ্টই তার তার কৃষ্ণ।

আগন্তুক।—কৃষ্ণ কি তা' হ'লে অনেকগুলি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, কৃষ্ণ একজনই আছেন। তাঁর রূপের শেষ নাই, গুণের শেষ নাই, মহিমার শেষ নাই, নামেরও শেষ নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোকে নিজ নিজ রুচি বুঝে, তাঁর অপার অনন্ত রূপের এক একটা ধ'রে তাঁর পূজা করে, এক একটা

নাম ধ'রে তাঁকে ডাকে। কৃষ্ণ মানে যিনি নিয়ত আমাকে আকর্ষণ করেন, সর্ব্বাবস্থাতে আমাকে তাঁর দিকে টানেন, ভালবাসা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে আমাকে বুকে আক্‌ড়ে নিতে চান। কৃষ্ণ মানে যিনি আমার ঊষর হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ করেন, তাতে প্রেমভক্তির বীজ বপন করেন, মরুভূমিকে শ্যামল শোভায় সহাস্য করেন। কৃষ্ণ একটা পেটেণ্ট-করা দেবতা নন। যার যার ইষ্টই তার তার কৃষ্ণ।

আগন্তুক।—অমুক মঠের সাধুরা কালীর নিন্দা করেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওটা করেন ভ্রান্তিতে। প্রকৃত কৃষ্ণ-ভজা কারো নিন্দা করেন না, কারণ ভজনশীল মন উদার, পরমতে সহিষ্ণু হয়, বিরুদ্ধ-বাদীর প্রতিও প্রেমশীল হয়। তাঁর হৃদয় থাকে যেন ভালবাসার খনি। যারা নিজ উপাস্যকে বড় করার জন্যে অপরের উপাস্যের নিন্দা করে, জান্‌বে তারা কৃষ্ণ-ভজা নয়, তারা দলভজা। দল-ভজারা আত্ম-বিস্মৃত মূঢ়, লক্ষ্যে তাদের দৃষ্টি থাকে না, উপলক্ষ্য নিয়ে লড়াই ক'রেই তারা সময় কাটায়, আর সম্প্রদায় বিস্তারের অনাবশ্যক উৎসাহে তারা সাধনভজনে উপেক্ষা করে, তাই সর্ব্বধর্ম্মে সাম্যবুদ্ধি তাদের আসে না।

যুবক-মন ও স্বাধীনতা

পার্ক হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন কতিপয় যুবক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কে হে তোমরা? যুবক কি?

একজন যুবক বলিল,—যুবক নই, তবে কি বৃদ্ধ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে খবর তোমরাই জান। বয়সে যুবক হ'লেই কিন্তু যুবক বল্‌ব না, মনটা তরুণ হওয়া চাই, তরুণের মত উন্নতিস্পর্দ্ধী, তরুণের মত বিঘ্নলাঞ্ছন, তরুণের মত স্বাধীনতা-লিপ্সু।

শ্রীশ্রীবাবামণি আর বলিলেন,—কিন্তু উন্নতি-স্পর্দ্ধার প্রকৃত লক্ষণ কি জানো? সত্যিকার উন্নতি-লিপ্সু অপরের উন্নতিতে ঈর্ষ্যানুভব করে না। বিঘ্ন-লাঞ্ছনের লক্ষণ জানো? সত্যিকার বিঘ্ন-বিজয়ী বৃথা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, বৃথা বিঘ্নে ঝাপ দিয়ে গিয়ে পড়ে না; স্বাধীনতা-লিপ্সার লক্ষণ জানো? প্রকৃত স্বাধীনতা-লিপ্সু অপরের স্বাধীনতায় হাত দেয় না। তুমিই উন্নত হবে, জগতে অর কেউ উন্নত হতে পার্ব্বে না, এ জেদ্ অন্যায়। যেহেতু তুমি নির্ভয়, সেই হেতু তুমি বৃথা বিপদ সৃষ্টি কর্ব্বে—এ বুদ্ধির নাম গোঁয়ার্ত্তুমি। তোমার মত-প্রচারে, তোমার পথ-বিচরণে তুমি স্বাধীনতা চাও ব'লেই যে অন্যের মত-প্রচারে তুমি বাধা দেবে, অন্যের পথে তুমি কণ্টক নিক্ষেপ কর্ব্বে,—সেটা অনাচার।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না কর্ল্লে, অন্যের মত-প্রচারে জোর ক'রে বাধা না দিলে, অনেক সময় নিজেদের ভাল মতটাকে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার কারণ, তোমাদের সত্য-নিষ্ঠার অভাব। সত্যের উপর যে ভিত্তিমান্ তাকে নিজ মত প্রচার কত্তে বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে লড়াই দিতে হ'তে পারে, কিন্তু সত্যই জয়ী হবে, মিথ্যা নয়। অপরের স্বাধীনতাকে যে শ্রদ্ধা করে না, তার স্বাধীনতা-লিপ্সার মূল্য একটা কাণা কড়ি মাত্র।

রাত্রি আটটা বাজিলে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন।

কলিকাতা
৩রা বৈশাখ, ১৩৩৪

অদ্য সমগ্র দিবারাত্র শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রতী রহিয়াছেন। কেহ কোন প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া উত্তর দেন।

প্রাতে দুই চারিজন ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণদর্শন করিতে আসিলেন। কিন্তু প্রাতে তিনি কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করিলেন না।

ছেলে চুরি

দ্বি-প্রহরের পর হইতেই জিজ্ঞাসু ভক্তদের সমধিক সমাগম হইতে লাগিল। একজন ভক্ত সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার অফ্ পুলিশ। তিনি একজন কনেষ্টবল সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পদধূলি লইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি শ্লেটে লিখিলেন,—কিরে, ধরাচূড়া প'রে কি গ্রেফ্‌তার কত্তে এসেছিস্ নাকি।

হাসিয়া সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টার বলিলেন,—আপনাকে ত'

গ্রেফ্‌তার ক'রে আন্দামান পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। যে ভাবে আপনি লোকের ছেলে চুরি কত্তে আরম্ভ করেছেন।

এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্লেটে লিখিলেন,—চোরের কিছু দোষ নেই বাপ্-ধন। আপনা আপনি ছেলেরা সব ঝোল্‌নার মধ্যে ঢুকে পড়ে, আট্‌কে রাখতে পারি না।

সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টার কতকগুলি ফলমূল আনিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেগুলি ভক্তদের মধ্যে নিজ হাতে বিতরণ করিয়া দিলেন।

ভ্রূ-মধ্যে গুরুদর্শন

একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, ভ্রূ-মধ্যে গুরুদর্শন ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—যিনি অন্ধকার দূর করেন, সংশয় দূর করেন, তিনিই গুরু। ভ্রূমধ্যে যাঁকে দেখলে সর্ব্ব-সংশয় দূরে যায়, তাঁকে দর্শনেরই নাম গুরুদর্শন। এই গুরু যে কেমন, তা' বর্ণনাতীত। কেউ কখনও বলতে পারে নি। কিন্তু যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল সংশয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

ভ্রূ-মধ্যে গুরুদর্শনের উপায়

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, ভ্রূমধ্যে গুরুদর্শনের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—মনটাকে দিনরাত ভ্রূমধ্যে ফেলে রেখে দাও। অন্যদিকে মন যেতে চাইলেও মনকে টেনে এনে ভ্রূ-মধ্যে বসাবে আর অবিরাম ইষ্টমান জপ কর্ত্তে থাক্‌বে। ইষ্টনামের উজ্জ্বল মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে ভ্রূ-মধ্যে দর্শন কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। ক্রমশঃ দেখতে পাবে, যা' তুমি কল্পনা কচ্ছ না, এমন অনির্ব্বচনীয় রূপেরও প্রকাশ আপনি হচ্ছে। ভ্রূ-মধ্যে মনে মনে নাম-ব্রহ্মকে অঙ্কন কর এবং শক্ত ক'রে তাকে ধ'রে রাখ। নাম-ব্রহ্মের রূপ যত ছুটে পালাতে চাইবে, তত তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখ। ভ্রূ-মধ্য থেকে নামের বিগ্রহ যত মুছে যেতে চাইবে, বারংবার কল্পনার তুলিকায় তত তাকে অঙ্কন কর। জিদ্ ছেড়ো না, মনের বল হারিয়ো না, হতোৎসাহ হয়ো না। সবাই শক্তের ভক্ত। তোমার মনও শক্ত অভ্যাসের হাতে পড়্‌লে আপনি বশীকৃত হবে। তখন ভ্রূ-মধ্যে দেদীপ্যমান ব্রহ্ম-জ্যোতির বিকাশ ঘট্‌বে, সদগুরু প্রকাশমান হবেন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের পার্থক্য ঘুচে যাবে, জ্ঞান-কল্পতরুর অমৃতময় সবগুলি ফল তোমার নিকট করামলকবৎ হবে।

হৃদয়ে ধ্যান ও ভ্রূ-মধ্যে ধ্যানের পার্থক্য

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—হৃদয়ে ইষ্টচিন্তা করলে দোষ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—দোষ কিছুই নেই। শরীরের প্রত্যেকটী অংশ পবিত্র, যদি ইষ্টচিন্তার সহায়ক হয়। জননেন্দ্রিয়কে লোকে অতি অপবিত্র স্থান মনে করে। এইরূপ অপবিত্র ব'লে

মনে করার কারণ এই যে, এই অঙ্গটীকে অধিকাংশ মানব নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে এই অঙ্গটীকে ঈশ্বরচিন্তার সহায়তার জন্য ব্যবহার কর্ল্লে, সেই মুহূর্ত্তে এই অঙ্গটী পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হ'ল। তখন এই অঙ্গে মন স্থির ক'রে ভগবৎ-সাধন কর্ল্লে, তীর্থে ব'সে সাধন করার ফল হবে। এই হিসাবে বিচার কর্ল্লে, হৃদয়ে ব'সে ধ্যান করাও যা, ভ্রূ-মধ্যে ব'সে ধ্যান করাও তা'। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। সুখ-দুঃখাদি ভাবের অনুভূতি হয় হৃদয়ে। জ্ঞানের স্থিরতা হচ্ছে ভ্রূ-মধ্যে, এইটুকু যোগীদের প্রত্যক্ষ-করা সত্য। যাকে ভালবাসি, তাকে বুকে রাখতে ইচ্ছা করে, ভ্রূ-মধ্যে নয়। যাকে জানতে চাই, তার তত্ত্ব ভ্রূ-মধ্যে ফুটে ওঠে, হৃদয়ে নয়। এজন্য ভক্তদের ভিতরে হৃদয়ে ইষ্টচিন্তার সমাদর কিছু বেশী আর জ্ঞানীদের মধ্যে সমাদর বেশী ভ্রূ-মধ্যের। কিন্তু ভালবাসার এমন একটা অবস্থা আছে, এমন একটা উৎকর্ষ আছে, যখন ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল, অথচ তাতে তরঙ্গ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। সেই সময়ে মন হৃদয় ছেড়ে আপনি ভ্রূ-মধ্যে চ'লে যায়। অগাধ সমুদ্রের সুগভীর জলরাশির মত অপরিমেয় সে ভালবাসা। ইষ্টের প্রতি সেই ভালবাসা যখন ধাবিত হয়, তখন মনের স্থান ভ্রূ-মধ্যে। হৃদয়কে বলতে পার বি-এ ক্লাশ, আর ভ্রূ-মধ্যকে এম-এ ক্লাশ।

গুহ্যমূল, জননেন্দ্রিয় ও নাভিতে ধ্যান

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—উপস্থে ধ্যানকে কি বলব ম্যাট্রিকুলেশান্ ক্লাশ?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—না; বলতে পার মাইনার ক্লাশ। মূলাধারে ধ্যানকে বলতে পার প্রথম মান,—আর নাভিমূলে ধ্যানকে—ম্যাট্রিকুলেশান। মন যার নিতান্ত তমঃপ্রবৃত্ত, তার জন্যে সহজ ধ্যানের স্থান গুহ্যমূল বা মূলাধার। এরই মধ্যে একটু বল বাড়ল ত' যাও লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে। মনের যখন ঐকান্তিকী তমঃপ্রবৃত্তি কমেছে, রজঃপ্রভাব বিকাশ এসেছে, তখন যাও মণিপুরে নাভিপদ্মে। যখন মন রজঃসাত্ত্বিক,—তামসিকতার গন্ধমাত্র নাই, যাও তখন হৃদয়ে অনাহত-পদ্মে। যখন সাত্ত্বিক,—তখন মনের স্থান ভ্রূ-মধ্যে আজ্ঞাচক্রে। ষট্-চক্রভেদীরা এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়েই শক্তি-চেতনার নানা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

ভ্রূ-সেবী যৌগিক পন্থা

শ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—কিন্তু আমাদের পথ স্বতন্ত্র। স্থানে স্থানে মনকে বসিয়ে তার পরে ভ্রূ-মধ্যে টেনে আনবার পদ্ধতি আমাদের নয়। মন সাত্ত্বিক হোক্, রাজসিক হোক্, তামসিক হোক্,—ভ্রূ-মধ্যেই তাকে বসাব। এর ফলে আপনি আস্তে আস্তে মনের তামসিকতা পরিপাকপ্রাপ্ত হ'য়ে রজোগুণের রজতমূর্ত্তি ধারণ করবে এবং এই রজোগুণ আবার নিজের

উত্তাপে পরিপাকপ্রাপ্ত হ'তে হ'তে ক্রমশঃ স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্ব্বে, মন লোহা থেকে সোণা হবে। যেমন উদরস্থ পিত্তরস নিজ উত্তাপে শোণিত হয়, আবার নিজ উত্তাপে শোণিত ক্রমশঃ শুক্রে পরিণত হয়।

সাধন-পথের শত্রু—আলস্য

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি, সাধন-পথের শত্রু কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—সাধনের প্রথমাবস্থায় শত্রু আলস্য, পরিণতাবস্থায়—অহঙ্কার। এক দেশে এক জোলা ছিল, প্রত্যেক রাত্রেই সে স্বপ্নে দেখ্ত, কে একজন এসে যেন বল্‌ছে যে, তার বাড়ীর উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যে যে একটা নিমগাছ আছে, তার গোড়ায় এক ঘটি জল দেওয়া মাত্রই নিমগাছ আমগাছে পরিণত হ'য়ে যাবে। রোজই ঘুম থেকে উঠে জোলা ভাবে, ঠিক্ই ত! অকেজো নিমগাছটা, যা দিয়ে একটা পয়সাও আয় হচ্ছে না, তাকে আমগাছে পরিণত করা ত' উচিতই। এই ব'লেই রোজই সে এক ঘটি জল নিয়ে নিমগাছের কাছে যায়। কিন্তু যেয়ে দেখে যে, চতুর্দ্দিকে অনেক জঙ্গল,—তার কিছু কিছু না কাট্‌লে আর পথ পাওয়া যাবে না। কিন্তু কাটারী আন্‌তে হ'লে আবার বাড়ী ফিরে যেতে হয়। অতএব সে সেদিনকার মত নিরস্ত হ'য়ে, নিমগাছেরই চতুর্দ্দিকে নানা স্থানে জল পরিত্যাগ ক'রে, যে জলটা এনেছিল নিমগাছের গোড়ায়

দেবার জন্য, সেই জলটা দিয়ে শৌচ ক'রে ঘরে ফির্‌ল। এই ভাবে রোজই কাটারী খানা সঙ্গে নিয়ে যাবার আলস্যে তার আর নিমগাছের গোড়ায় জল দেওয়া হ'য়ে উঠ্‌ল না বরং মলত্যাগের ফলে নিমগাছের কাছে যাবার পথ দিনের পর দিন দুর্গম হ'য়ে উঠতে লাগল। সাধন পথেও আলস্য এই রকমই শত্রু। প্রতিদিন শাস্ত্রমুখে, নয় সাধুমুখে, নয় গুরু-মুখে শুন্‌তে পাচ্ছ যে, সাধন কর্ল্লে এই নিমের মত তিক্ত বিস্বাদ জীবনটা অমৃত্যের মত মধুময় হবে, পূর্ব্বজন্মের শুভকর্ম্ম-ফলে সে কথায় বিশ্বাসও হচ্ছে, কিন্তু আলস্যবশে সাধন কচ্ছ না। এর ফল এই যে, যতই দিন যাচ্ছে, সাধন করার পথ ততই দুরধিগম্য, ততই দুস্তরণীয় হচ্ছে।

সাধন-পথের শত্রু—অহঙ্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—সাধন-পথের আর এক শত্রু অহঙ্কার,—আমি মস্ত বড় একটা সাধক, মস্ত বড় একটা তপস্বী, একটা জলজ্যান্ত মহর্ষি,—এই অভিমান। বৌদ্ধগ্রন্থ "জাতকে" এর চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত আছে। এক গৈরিকধারী সাধু গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখে এক বৃহৎকায় মেষ মাথা নীচু ক'রে সিং বাঁকিয়ে পয়তারা কর্ল্লে। দে'খে সাধু ভাব্‌লেন, বাঃ চমৎকার ত' এই মেড়াটা! সে জানে কিনা, আমি একজন মহাপুরুষ, তাই দেখ, কেমন সম্ভ্রম-সহকারে আমাকে প্রণাম কচ্ছে! মহৎ লোকের সম্মান সর্ব্বত্র। এই রকম

ভাবতে ভাব্‌তে সাধু যেমনি এক পা অগ্রসর হয়েছেন, অমনি দেখতে না দেখ্‌তে বিশালবপু মেষ সজোরে এসে তাঁকে দিল এক বিরাশী সিক্কার ঢুঁ। আর সাধু তখনি চিৎপাত। আমি খুব একজন হ'য়ে গেছি, এই দেখ দশজনে আমাকে সম্মান কচ্ছে, খবরের কাগজে আমার নাম বেরুচ্ছে, অমার প্রতিমূর্ত্তি ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছে, সাধু-সজ্জনদের মণ্ডলীতে আমার বড় পায়া—এই জাতীয় অভিমান যে কত সাধক-পুরুষকে খুব অগ্রসর অবস্থা থেকেও টেনে নীচে নামিয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। অতএব সাধু, সাবধান।

আলস্য ও অহঙ্কার দমনের উপায়

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—এই দুই শত্রু দমনের উপায় কি বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—আলস্য দমনের উপায়, উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দিনের পর দিন প্রবল করা, এই জীবনেই চরম উৎকর্ষকে আয়ত্ত কত্তে হবে, এই জন্মেই পরম সত্যকে লাভ কত্তে হবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা, এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা। আর অহঙ্কারকে দমন করার উপায় হচ্ছে অগ্রগমনের পথে নীচের দিকে না তাকিয়ে অভ্রভেদী ধবল পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চশীর্ষ বড় বড় মহাপুরুষদের প্রতি তাকানো। সামান্য লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌লেই নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে হয়, অহঙ্কার আসে, দর্পদম্ভ আসে। বড় বড় মহাপুরুষদের অনবদ্য জীবনের উপরে দৃষ্টি থাকলে প্রতিনিয়ত

নিজের দোষ ত্রুটীগুলি চখে পড়ে, আত্মসংশোধনের চেষ্টা অপ্রতিহত থাকে এবং সাধনের নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়।

কলিকাতা

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৪

অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনভঙ্গ করিলেন। এই সময়ে নোয়াখালী জেলার একটি যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন স্থির করা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কি প্রয়োজনে মন স্থির কত্তে চাও।

যুবক।—জীবনের উন্নতির জন্য, চরিত্রের উন্নতির জন্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' হ'লে নাম জপই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

নাম-জপ

যুবক।—কি নাম জপ করা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে নামে তোমার রুচি যায়। নির্দ্দিষ্ট-করা একটী নাম চাই, এখন সে নাম যে নামই হোক। দশটা নাম জপ কত্তে গেলে হবে না, একটাকে নিয়ে থাকতে হবে। "একজনারে জানলে আপন বিশ্বভূবন আপন তোর, একজনাতে যুক্ত হ'লে সকল ভাঙ্গায় বাঁধে জোড়"। মনকে রাখ্‌তে হবে একদিকে, তাই নামও হবে একটী।

যুবক।—নাম জপের কোনও নিয়ম আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— সাধারণ নিয়ম এই যে, আসন ক'রে ব'সে

মেরুদণ্ডটী সরল রাখ্‌তে হবে। আর প্রতিদিন একই সময়ে জপে বসতে হবে। নামটী মনে মনে উচ্চারণ কর্ব্বে, আর প্রত্যেকবার উচ্চারণের সময়ে ভগবানকে তোমার সন্নিকটে উপস্থিত ব'লে, তোমার মধ্যে অধিষ্ঠিত ব'লে অনুভব কত্তে চেষ্টা পাবে। তাঁকে ডাক্‌বে মর্ম্মভেদী ডাকে, আকুল প্রাণে, ব্যাকুল অন্তরে। এই ভাবে প্রত্যহ অভ্যাস কর্ল্লে শেষে সূক্ষ্ম নিয়মে যেতে পারা যায়। তখন অহর্নিশ নাম জপতে হয়, সময় অসময় থাকে না।

যুবক।—কোন্ আসনে ব'সে জপ করা ভাল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সুখাসনে, অর্থাৎ যে আসনে দীর্ঘকাল ব'সেও কষ্ট হয় না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী খেয়াল রাখ্‌তে হবে মেরুদণ্ডটীর দিকে। মেরুদণ্ড সরল রাখা চাই-ই চাই, নইলে কিন্তু গোড়ায় গলদ।

যুবক।—জপের সময় কোনও রূপের ধ্যান কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না কর্ল্লেও ক্ষতি নেই। ভ্রূ-মধ্যে মন স্থির ক'রে একান্ত মনে নাম জপ কত্তে থাক্‌বে। রূপের প্রকাশ আপনি হবে।

যুবক।—যদি কোনও রূপের ধ্যান করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতেও ক্ষতি নেই। নিজ নিজ রুচি বুঝে এসব বিষয়ে বিভিন্ন জনের ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের।

রূপধ্যান ও পূর্ব্বসংস্কার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি রূপধ্যান সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ বলিতে

লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার যেমন রূপাভিনিবেশ প্রয়োজন, নামের সাধন কত্তে কত্তেই তার তা' আপনি এসে যায়, এর জন্য কোনও কৃত্রিম চেষ্টার আবশ্যকতা পড়ে না। রূপের রুচি সময়মত নিজে থেকেই ধরা পড়ে। রূপের রুচি তোমার ভিতরে আপনা হ'তে হ'য়েই আছে, নামের সাধন কত্তে কত্তে তোমার রুচিকে তুমি চিন্‌তে পারবে। কালীর ধ্যান কর্ব্বে, কি কৃষ্ণের ধ্যান কর্ব্বে, সেই বিচারে সময়ের অপচয় নিরর্থক। যে নামে কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকলের স্মরণ চল্‌তে পারে, এমন একটী অসাম্প্রদায়িক নাম একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন কত্তে থাক, ক্রমে নিজের ভিতরে হয়ত একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের প্রতি আকর্ষণ অনুভব কর্ব্বে। তখন সেই রূপটীকে ধ্যান কত্তে কত্তে নাম জপ্‌তে থাক্‌বে। এর পরে আবার কিছুদিন পরে হয়ত নূতন একটী রূপের পানে প্রাণের গভীরতম টান এল। বহুত আচ্ছা, তখন সেই রূপেরই ধ্যান চলুক। এভাবে বহুবার রূপের পরিবর্ত্তনও ঘট্‌তে পারে; কিন্তু ক্রমে, এমন এক রূপের প্রতি তোমার আকর্ষণ আস্‌বে, যে রূপটীর আর ব্যাখ্যা করা চলে না ব'লে সবাই নাম দিয়েছে অরূপ। এসব তোমার আপনিই হবে।

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—এইভাবে বিভিন্ন প্রকারে রূপের রুচি পরিবর্ত্তিত হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এর ভিতর পূর্ব্ব সংস্কারের হাত রয়েছে। মনে কর পূর্ব্ব জন্মে তুমি বৈষ্ণব ছিলে, উপাসনাকালে

বিষ্ণুর ধ্যান কত্তে। সেই বৈষ্ণবীয় সংস্কার আজও সূক্ষ্মভাবে তোমাকে জড়িয়ে রেখেছে, কিন্তু এত সূক্ষ্মভাবে যে, তুমি তা' কল্পনাও কত্তে পাচ্ছ না। আবার জন্মেছ এসে মনে কর শাক্তের ঘরে, তোমার পিতামাতা সাধন করেছেন কালীমূর্ত্তিকে অবলম্বন ক'রে। এর ফলে তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে কালীমূর্ত্তির একটা সূক্ষ্ম ছাপ রয়ে গেছে, কেননা পিতামাতার ত' শুধু অস্থি আর মাংসই পাও নি, তোমার মস্তিষ্কটার ভিতরে তাঁদেরও মস্তিষ্কটা রয়েছে। কিন্তু কালীমূর্ত্তির ছাপ তোমার মস্তিষ্কে এত সূক্ষ্ম ভাবে রয়েছে যে, তার কথা তুমি জানতে পাচ্ছ না। এর পরে মনে কর তোমার মা-বাপ্ গেলেন ম'রে, অনাথ শিশু দেখে তোমাকে দয়ালু এক রোমান ক্যাথলিক "ফাদার" নিয়ে যত্ন ক'রে লালন পালন কর্ল্লেন, লেখাপড়া শিখালেন, যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন, মাতা মেরীর মধুময়ী মূর্ত্তি তোমার চখের সাম্‌নে ধর্‌লেন। এবার তোমার মনের মধ্যে এই মূর্ত্তিরও ছাপ পড়ল। এখন মোটের উপর তোমার উপরে প্রভাব এল কয়টী রূপের? প্রভাব এল তিনটীর। একটী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-রূপে, দ্বিতীয়টী পৈতৃক সংস্কাররূপে, তৃতীয়টী আগন্তুক বা স্বোপার্জ্জিত সংস্কার-রূপে তোমার মনের মধ্যে রূপপিপাসার ইন্ধন ও প্রবৃত্তি-রূপে রইল। রূপ-সংস্রবহীন ভাবে নামের সাধনে রয়েছ, প্রথমে রুচি যাবে তোমার মাতা মেরীর রূপের দিকে। আরো সাধন কর, অজ্ঞাতসারে মন যাবে কালীমাতার দিকে। আরো সাধন কর, ফুটে উঠ্‌বে বিষ্ণুমূর্ত্তি, আরো সাধন কর, দেখ্‌বে সকল রূপের

সমষ্টি, সকল রূপের সেরা, উজ্জ্বল অরূপ। প্রথমে জাগে আগন্তুক সংস্কার, যা তুমি সঙ্গের গুণে প্রতিবেশ-প্রভাবে পেয়েছ। তারপরে জাগে পৈতৃক সংস্কার, যা পেয়েছ পিতামাতার রজো-বীর্য্যের সাথে। তার পরে জাগে পূর্ব্বজন্মের সেই সংস্কার, যা পরিসমাপ্তি পায় নি। সর্ব্বশেষ জাগে—পরম রূপ বা অরূপ। পরমরূপ মানে এর পরে অর রূপ নাই, রূপের এখানে সীমা। অরূপ মানে রূপের ভাষায় আর এরূপের ব্যাখ্যা হয় না।

রূপের পন্থা ও নামের পন্থা

যুবক আরও প্রশ্ন করিলেন। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলি-লেন,—রূপের ভিতরেও নাম আছে, নামের ভিতরেও রূপ আছে। একটি রূপকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে যদি তার মধ্যে চিত্তের সমগ্র অভিনিবেশকে নিমজ্জিত কর, তাহ'লে একদা এক শুভক্ষণে সেই রূপের ভিতর থেকে একটি নামের স্বতঃপ্রকাশ ঘট্‌বে। আবার একটি নামকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে যদি তার মধ্যে চিত্তের সমগ্র অভিনিবেশকে ডুবিয়ে দাও, তাহ'লে একদা এক শুভক্ষণে সেই নামের ভিতর থেকে একটি রূপের স্বতঃ-প্রকাশ ঘট্‌বে। সুতরাং নামকে নিয়েই ডোব, আর রূপকে নিয়েই ডোব, ডুবতে যদি পার, তবে একটার ভিতর দিয়েই অপরটাকে পাবে। কিন্তু রূপে অভিনিবেশের চাইতে নামে অভিনিবেশ সহজতর। সমুদ্রতীরে ব'সে তরঙ্গ-মালাতে অভিনিবেশ দেওয়ার চাইতে, কোটি কোটি তরঙ্গের আলোড়নে উৎপন্ন

গর্জ্জনের মধ্যে অভিনিবেশ প্রদান সহজতর। এজন্যই যোগীদের সমাজে রূপের সাধনের চেয়ে নামের সাধন বেশী আদৃত হয়েছে। রূপধ্যান-বর্জ্জিত নামজপ কত্তে কত্তে তাঁরা নামের ভিতরেই রূপের বিকাশ দেখেন। সেই রূপ কল্পিত কোন রূপ নয়, প্রত্যক্ষ রূপ, এমন রূপ, যা কোনও চিত্রকরের অঙ্কনের সাধ্য নাই। রূপকে অবলম্বন না ক'রে নামকেই অবলম্বন কর। রূপে অভিনেবেশ না দিয়ে নামেই অভিনিবেশ দাও। তার ফলে সাধনের উন্নতির সাথে সাথে বাকী পথ যেভাবে খোলা উচিত, ঠিক সেই ভাবেই খুলে যাবে।

সস্ত্রীক সাধন ও আত্মার মিলন

বৈকাল বেলা একজন স্কুলের শিক্ষক আসিলেন। একসময়ে ইনি ভয়ঙ্কর একজন তার্কিক ছিলেন, সম্প্রতি কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, গৃহীদের জন্য সাধন-ভজনের কোনও সহজ পন্থা আছে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে বৈ কি।

শিক্ষক।—কি, বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্বামী ও পত্নী উভয়ের পক্ষে একযোগে ভগবানকে ডাকাই সহজ পন্থা। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, একা একা সাধন কত্তে অস্পৃহা এলে তাঁরা গুরুভাই সমধর্ম্মী জুটিয়ে নিয়ে এক যোগে সাধন-ভজন ক'রে খুব সহজে সফলতা লাভ করেন। গৃহীদের পক্ষেও সেই পথটী অবলম্বন

সমষ্টি, সকল রূপের সেরা, উজ্জ্বল অরূপ। প্রথমে জাগে আগন্তুক সংস্কার, যা তুমি সঙ্গের গুণে প্রতিবেশ-প্রভাবে পেয়েছ। তারপরে জাগে পৈতৃক সংস্কার, যা পেয়েছ পিতামাতার রজো-বীর্য্যের সাথে। তার পরে জাগে পূর্ব্বজন্মের সেই সংস্কার, যা পরিসমাপ্তি পায় নি। সর্ব্বশেষ জাগে—পরম রূপ বা অরূপ। পরমরূপ মানে এর পরে অর রূপ নাই, রূপের এখানে সীমা। অরূপ মানে রূপের ভাষায় আর এরূপের ব্যাখ্যা হয় না।

রূপের পন্থা ও নামের পন্থা

যুবক আরও প্রশ্ন করিলেন। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রূপের ভিতরেও নাম আছে, নামের ভিতরেও রূপ আছে। একটি রূপকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে যদি তার মধ্যে চিত্তের সমগ্র অভিনিবেশকে নিমজ্জিত কর, তাহ'লে একদা এক শুভক্ষণে সেই রূপের ভিতর থেকে একটি নামের স্বতঃপ্রকাশ ঘট্‌বে। আবার একটি নামকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিয়ে যদি তার মধ্যে চিত্তের সমগ্র অভিনিবেশকে ডুবিয়ে দাও, তাহ'লে একদা এক শুভক্ষণে সেই নামের ভিতর থেকে একটি রূপের স্বতঃ-প্রকাশ ঘট্‌বে। সুতরাং নামকে নিয়েই ডোব, আর রূপকে নিয়েই ডোব, ডুবতে যদি পার, তবে একটার ভিতর দিয়েই অপরটাকে পাবে। কিন্তু রূপে অভিনিবেশের চাইতে নামে অভিনিবেশ সহজতর। সমুদ্রতীরে ব'সে তরঙ্গ-মালাতে অভিনিবেশ দেওয়ার চাইতে, কোটি কোটি তরঙ্গের আলোড়নে উৎপন্ন

গর্জ্জনের মধ্যে অভিনিবেশ প্রদান সহজতর। এজন্যই যোগীদের সমাজে রূপের সাধনের চেয়ে নামের সাধন বেশী আদৃত হয়েছে। রূপধ্যান-বর্জ্জিত নামজপ কত্তে কত্তে তাঁরা নামের ভিতরেই রূপের বিকাশ দেখেন। সেই রূপ কল্পিত কোন রূপ নয়, প্রত্যক্ষ রূপ, এমন রূপ, যা কোনও চিত্রকরের অঙ্কনের সাধ্য নাই। রূপকে অবলম্বন না ক'রে নামকেই অবলম্বন কর। রূপে অভিনেবেশ না দিয়ে নামেই অভিনিবেশ দাও। তার ফলে সাধনের উন্নতির সাথে সাথে বাকী পথ যেভাবে খোলা উচিত, ঠিক সেই ভাবেই খুলে যাবে।

সস্ত্রীক সাধন ও আত্মার মিলন

বৈকাল বেলা একজন স্কুলের শিক্ষক আসিলেন। একসময়ে ইনি ভয়ঙ্কর একজন তার্কিক ছিলেন, সম্প্রতি কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, গৃহীদের জন্য সাধন-ভজনের কোনও সহজ পন্থা আছে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে বৈ কি।

শিক্ষক।—কি, বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্বামী ও পত্নী উভয়ের পক্ষে একযোগে ভগবানকে ডাকাই সহজ পন্থা। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, একা একা সাধন কত্তে অস্পৃহা এলে তাঁরা গুরুভাই সমধর্ম্মী জুটিয়ে নিয়ে এক যোগে সাধন-ভজন ক'রে খুব সহজে সফলতা লাভ করেন। গৃহীদের পক্ষেও সেই পথটী অবলম্বন

কত্তে হবে। একই নিয়মে একই পদ্ধতিতে উপরন্তু একই আসনে ব'সে যদি সাধন-ভজন কত্তে থাকেন, তা' হ'লে খুব শীঘ্র এগিয়ে যেতে পারেন। তবে একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সাধন-ভজনের সময়ে পরস্পরের দেহস্পর্শ না হয়।

শিক্ষক।—আমরা ত' বাবামণি দীক্ষিত নই, এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দীক্ষিত না হ'লেও সাধন চলতে পারে। তবে, নিষ্ঠা রাখবেন, যেন রোজ রোজ মত-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পথ-পরিবর্ত্তন না ঘটে। আজ হরি, কাল বিস্মিল্লা, পরশু কালী, তরশু দুর্গা,—এই রকম বিভ্রাট না হয়। সব নামই একই নাম, কিন্তু নিষ্ঠা রাখ্তে হবে নির্দ্দিষ্ট একটীতে এবং স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই ঐ একটী নাম ধ'রেই সাধন কর্ব্বেন।

শিক্ষক।—আমার ওঁকারে রুচি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে ত' খুব ভাল কথা। রুচি বুঝেই চল্বেন।

শিক্ষক।—প্রাণায়ামাদি কর্ব ত'?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, যাঁরা নিজে নিজে সাধন-পথ বের ক'রে নিয়ে চল্তে চান, প্রাণায়াম কত্তে গেলে তাঁদের অনেক সময় ভীষণ ক্ষতি হ'তে পারে। নাম-সাধনের দিকেই ষোল আনা মনটা দিয়ে দিন্। এর ফলে প্রাণায়ামের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই হ'তে থাক্বে। যখন গুরু পাবেন, প্রাণায়াম কর্ব্বেন তখন।

শিক্ষক।—নাম জপের সময় মন রাখ্ব কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মন রাখ্বেন ভ্রূ-মধ্যে, কাণ রাখ্বেন নামের ধ্বনিতে, বুদ্ধি রাখ্বেন নামের অর্থে।

শিক্ষক।—আচ্ছা, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই একসঙ্গে ব'সে জপ তপ করায় লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—লাভ অনন্ত। সাধন কত্তে কত্তেই বুঝ্তে পার্ব্বেন। ক্রমশঃ সাধনের বলেই উচ্চতর ক্রমগুলিও নিজের চেষ্টাতেই দেখতে পাবেন। দুটী মন যখন যোজন পথ দূরে থেকেও একটী তত্ত্বেরই ধ্যান কত্তে থাকে, তখন তাদের অজ্ঞাতসারেই উভয় মনের মধ্যে একটা প্রীতির আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। কিন্তু স্থানের দূরত্ব যখন না থাকে, তখন এই প্রীতি ও মনোমিলন অত্যন্ত গভীর হয় এবং সহজে সুজাত হয়। এই ভাবে সাধন কত্তে কত্তে আত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ ক'মে যায় অর্থাৎ কামুকতার মূলোচ্ছেদ হয়। দেহের প্রতি দেহের যে লালসা, সেটা আত্মার লাললা দ্বারা বিনষ্ট হয়। আত্মায় আত্মায় মিলন হ'লে দেহের মিলনটার জন্য বুভুক্ষা থাকে না।

শিক্ষক।—দুজন মুখামুখি বস্লেই কি আত্মায় আত্মায় মিলন হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শুধু ব'সে থাকলেই হবে কেন? নাম জপ কত্তে হয়। নাম জপের প্রণালী যত স্থূল হবে, আত্মার মিলন তত স্থূল হবে। প্রাণালী যত সূক্ষ্ম হবে, মিলন তত সূক্ষ্ম হবে।

শিক্ষক।—আর একদিন আপনি বলেছিলেন, একজন আর এক জনের ভ্রূ-মধ্যে তাকিয়ে নাম জপ কর্ল্লে আত্মায়

আত্মায় মিলন হয়। তা' কিরূপে হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যুক্তি দিয়ে কি অনুভূতির ব্যাপার বুঝান যায়? কাজ করে দেখুন, সবই বুঝতে পার্ব্বেন। ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি আত্মায় আত্মায় মিলন হয় বটে, কিন্তু সেটা দৈহিক মিলনের চেয়ে সূক্ষ্ম হ'লেও আত্মিক দিকে খুব সূক্ষ্ম মিলন নয়। ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে সাধন কত্তে কত্তে সাধন-শক্তির বলে পরস্পরের পরস্পরের বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ লাভ কত্তে পারে, তাতে উভয়ের সমবুদ্ধিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে, আত্মিক মিলনের পথ প্রশস্ত হয়।

শিক্ষক।—একজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত অপরের শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলনের কথা যা' বলেছিলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতে হৃদয়ের মিলন হয়, ফলে দুটী জীব অভিন্ন হৃদয় হয়, দুইজনের অনুভবের ক্ষমতা সমত্ব লাভ করে। কিন্তু আত্মিক মিলনের চরম অবস্থা আরও সূক্ষ্ম,—এত সূক্ষ্ম যে, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করার উপায় নেই। সাধন করুন, ক্রমে সবই বুঝতে পার্ব্বেন। একলাখ কথার চাইতে এক রতি কাজের দাম বেশী। কারণ, কাজ ক'রে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করা যায়, আর কথা নিয়ে থাক্‌তে গেলে অনুমানের পর অনুমান আশ্রয় ক'রে শুধু অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়তে হয়।

কিশোরের কামার্ত্ততা ও তৎপ্রতীকার

শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজি, আপনার ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের

প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমি অনেকের মুখে শুনেছি। আপনি যখন যেখানে যান, সেখানে নাকি যুবকের দল এসে হাট বসায়, আর তাদের অভিভাবকেরা আপনাকে ঐন্দ্রজালিক ব'লে গাল দেয়। আচ্ছা, এর কারণটা কি? সত্যই কি আপনি ইন্দ্রজাল-বিদ্যা জানেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—জানি বৈ কি! না জান্‌লে কি আর খামাখা লোকে গাল দেয়? তবে ব্যাপারখানা কি জানেন, এ ইন্দ্রজাল কামরূপ-কামাখ্যার আমদানী নয়, এর সৃষ্টি হচ্ছে সহানুভূতি-প্রবণ মনে। যার দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে, তাঁর কাছে সে ভিড় করে, তাকে ছেড়ে দূরে থাক্‌তে সে চায় না।

বন্ধু।—আমিও যুবকদের মধ্যে পবিত্রতা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু কিছু কাজ ক'রে আস্‌ছি। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের কিছুতেই সমাধান কত্তে পাচ্ছি না। নিতান্ত ছোট ছেলেদের ভিতরেও যে অসম্ভব রকমের কাম-চর্চ্চা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এর প্রতিষেধ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর প্রকৃত প্রতিষেধ হচ্ছে বাপ-মায়ের সাধন-জীবন। অসাধক বাপ-মায়ের সন্তানেরা কাম থেকে জন্মাচ্ছে, কাম-সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তাই আট-ন' বছর বয়স না পার হ'তেই তারা পাকা কামুক। সাধক বাপ-মায়ের সন্তান অত সহজে কামের ক্রীড়নক হ'য়ে পড়ে না ; যৌবনের বিকাশ পর্য্যন্ত তারা অপেক্ষা কত্তে অনেক সময়ই সুযোগ পায়। তাই, ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের সব চাইতে গোড়ার কাজ হ'ল গৃহীর

জীবনে সাধন-ভজনের প্রতিষ্ঠা। স্বামী আর স্ত্রী যদি সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে এক হন, তা' হ'লে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি অধিক হবে।

বন্ধু।—কিন্তু এ ত' সহজ কথা নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বড় কাজ কোনটাই সহজ নয়। সহজ হচ্ছে হুজুগে করা। কাজের কাজে মেহনত লাগে, সহিষ্ণুতা লাগে।

বন্ধু।—আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উপস্থিত কর্ত্তব্য হচ্ছে কামাতুর ছেলে-পিলেদের মধ্যে পবিত্রতার বাণী প্রচার করা, নিজেরা পবিত্র জীবন যাপন ক'রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা, তাদের মধ্যে সৎসাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ক'রে তোলার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সৎকার্য্যের প্রতি, জীবসেবার প্রতি জাতীয় সাধনের প্রতি তাদের প্রবৃত্তির সৃষ্টি করা। আলস্য, কামুকতার পরম বান্ধব। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই সেই উপায় দেখ্‌তে হবে, যাতে এরা সমগ্র দিনের একটি মুহূর্ত্ত সময়ও বিনা কাজে থাকতে না পায়। এজন্য মাঝে মাঝে একটু আধটু হুজুগ সৃষ্টি করাও দরকার হ'তে পারে। কিন্তু ছেলেগুলি যাতে হুজুগে না হ'য়ে যায়, তার জন্য এদের মধ্যে সাধন-ভজন-পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে।

বন্ধু।—সাধন-ভজনে হুজুগের কি কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হুজুগকে দমন কর্ব্বে। সাধন-পরায়ণ ব্যক্তি-কে অল্প হ'লেও হুজুগে বীতরাগ হ'তেই হবে। কারণ, সাধন মানুষকে

স্থিরবুদ্ধি করে, শুদ্ধবুদ্ধি করে। অস্থিরবুদ্ধি লোকই হুজুগে মাতে এবং হুজুগ থেমে গেলে পুনরায় বিরুদ্ধ পথে চলে। কিন্তু কেউ যদি সাধন-ভজন-পরায়ণ হয়, তা' হ'লে হুজুগ থেমে গেলেও উল্টা খোঁচ দেয় না, এক পথেই চল্‌তে পারে।

কলিকাতা

৫ই বৈশাখ, ১৩৩৪

প্রাতঃকালেই শ্রীশ্রীবাবামণি পাদপদ্ম-দর্শনার্থে দুই তিনজন মহিলা আসিয়াছেন। প্রণামান্তে মহিলাগণ শ্রীশ্রীবাবামণির পদপ্রান্তে ভূমিতেই উপবেশন করিলেন।

নারীর মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ও কি কথা? নীচুতে বস্‌বে কেন? উঠে বস মায়েরা। তোমরা কি সামান্য জিনিষ? তোমাদের দেহের এক একটা অঙ্গে একজন ক'রে মহাদেবী বাস করেন, যাঁরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মস্বরূপিণী সৃষ্টি-প্রলয়-বিধায়িনী। মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞে গতপ্রাণা সতীর শরীর স্কন্ধে ক'রে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্ছিলেন, তখন সতীর এক এক দেহাংশ এক এক জায়গায় পড়েছিল। যেখানে যে অংশ পড়ল, অমনি সেখানে সেই অংশকে আশ্রয় ক'রে একটা সিদ্ধপীঠ হ'য়ে গেল, সেই দেহাংশ মধ্যে জগদ্‌যোনী পরমেশ্বরী অধিষ্ঠিতা হলেন। পায়ের নখাগ্র থেকে কেশ-প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানকে আশ্রয় ক'রেই কোটিকোটি ভক্তের জন্য এক একটা পূজা-স্থান নির্ম্মিত হ'য়ে গেল। এর

মানে কি কিছু বুঝ্‌তে পার মায়েরা? এর মানে হচ্ছে এই যে, তোমরা সামান্যা নও। তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গ পবিত্র, পা থেকে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর পবিত্র, তোমাদের হাতে, পায়ে, চোখে, মুখে, বুকে, পিঠে, উদরে, জঙ্ঘায়, সব স্থানে পরমেশ্বরী জগন্মাতা বিরাজ করেন। তোমরা জগন্মাতার প্রতিনিধি-স্থানিয়া।

জনৈকা মহিলা প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু বাবামণি, সেকথা বুঝ্‌তে পারি কৈ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বুঝ্‌তে না পার, চেষ্টা কর। ভাব্‌তে থাক, তুমিই দক্ষকন্যা সতী, জগৎপতি মহাদেব তোমার স্বামী, স্বামি-নিন্দা তোমার পক্ষে অসহ্য। কল্পনা কত্তে থাক আদি দেব মহাদেবের নিন্দা শুনে তুমিই যেন যোগ-বলে দেহ পরিত্যাগ করেছ, তোমারই দেহ যেন বিষ্ণুচক্রে বিখণ্ডিত হ'য়ে পৃথিবীর এক এক প্রান্তে পড়ছে আর, তা' থেকে এক একটা তীর্থভূমি জন্মাচ্ছে! ধ্যান কত্তে থাক,—তোমার এক এক অঙ্গ আল্‌গা হ'য়ে পড়ে যাচ্ছে, আর জগন্মাতা মহাকালী, এক একটা রূপ পরিগ্রহ ক'রে সেই অঙ্গে অধিষ্ঠিতা হচ্ছেন। এইভাবে কল্পনা কত্তে কত্তে একদিন দেখ্‌বে তুমি সত্যি সত্যিই সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী পরমানন্দময়ী মহামায়া।

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মা

মহিলাদের সহিত একটি ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষীয়া কুমারী

মেয়েও অসিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ কোনও স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে অথবা বেথুন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। শ্রীশ্রী-বাবামণির দৃষ্টি মেয়েটীর মুখপানে পড়িতেই বাবামণি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি, তোর আবার কি প্রশ্ন?

কুমারী মেয়েটী একটু লজ্জিতা হইয়া মাথা নত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত', প্রশ্ন থাকে ত' জিজ্ঞাসা কর্।

তখন কুমারী মেয়েটী প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, নিজের দেহাংশগুলি, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথিবীর এক এক প্রান্তে পড়ছে এরূপ চিন্তায় লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—লাভ? অফুরন্ত। তোর ঐ দেহটার প্রতি ত' তোর খুব মমতা? এই দেহটাকে আশ্রয় ক'রে আছে ব'লে, অন্যান্য জিনিষের উপরও তোর মমতা। তোর চ'খে আছে ব'লেই তোর ঐ চশমা-জোড়ার উপরে তোর মমতা। তোর সে মমতা আমার চশমা জোড়ার উপরে নেই। তোর হাতে আছে ব'লেই তোর চুড়ীজোড়ার উপরে তোর মমতা। ঐ যে পথ দিয়ে আরো কত মায়েরা যাচ্ছেন তাঁদের হাতের চুড়ীর উপর তোর মমতা নেই। কিন্তু আমার মুখটার উপরে আমারই নাকটা না থেকে যদি তোরই নাকটা জোড়া থাক্‌ত' তাহ'লে আমার চশমার উপরেও তোর মায়া হ'ত। পথের মায়েদের শরীর-মধ্যে তাঁদেরই হাতগুলি না থেকে যদি তোরই হাত দুটো জোড়া থাক্‌ত, তাহ'লে তাঁদের চুড়ীর উপরেও

তোর মমতা হ'ত। তোর শরীরের একটা অংশ অন্যত্র গিয়ে পড়্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তোর মমতাটাও যেত। এই মমতাটা তোকে বিশ্বব্যাপিনী কত্ত। তোরা ত' মমতাময়ী, এই জন্যই ত' তোদের মা ব'লে ডাকি। বিশ্বব্যাপিনী যাঁর মমতা, তাঁকে বলি বিশ্ব-মাতা। হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কাণ এই সব সীমাবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তুই একটুখানি জায়গায় যতক্ষণ আটক হ'য়ে থাক্‌বি, ততক্ষণ তুই আমার অতি ছোট্ট মা, অতি ক্ষুদ্র মা। আর, তোর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ যখন নিজ নিজ অনুভূতির শক্তি নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হ'য়ে পড়বে, তোর চক্ষু কেবল নিকটের জিনিষই দেখ্‌বে না, দূরবর্ত্তী কোটি কোটি সন্তানের দুঃখ খুঁজে বেড়াবে, তোর কর্ণ অতি নিকটের কথাই শুনবে না, লক্ষ যোজন দূরের সন্তানমণ্ডলীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনবে, তোর স্নেহস্পর্শ শুধু একটী সন্তানকে কোলে নিয়েই ফুরিয়ে যাবে না, নিখিল ভুবনের প্রত্যেকটী মাতৃঅঙ্কলোভী সন্তানের জন্য প্রসারিত হবে, তখন হবি তুই খাঁটি মা, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মা, রাজরাজেশ্বরী মা।

মাতৃজাতির উন্নতিতে পুরুষজাতির উন্নতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সেই মা যে তোদের হ'তে হবে রে বেটি। যতক্ষণ তোরা ছোট থাকবি, ততক্ষণ আমরাও যে ছোট থাকতে বাধ্য হব। তোরা যখন বড় হবি, তখন আমরা বড় হব, আমাদের বংশধরেরা বড় হবে, আমাদের

শিষ্যপ্রশিষ্যেরা বড় হবে। সিংহবাহিনীরই সন্তান সিংহবাহন হয়, শৃগাল-বাহিনীর সন্তান কেশরিমর্দ্দন হয় না।

প্রণামাদি করিয়া মহিলারা প্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি স্নানাহার সমাপন করিয়া ভবানীপুরে একটি ওলাউঠা-রোগীর শুশ্রূষা করিতে চলিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময়ে ভবানীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই স্তূপীকৃত পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা ও মাতৃবুদ্ধি

ব্রহ্মপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবই মনের সকল চঞ্চলতা প্রশমনের শ্রেষ্ঠ। নারীজাতির স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া তোমরা পুরুষ-পুঙ্গবেরা নিজ নিজ সংযম রক্ষা করিবে, এই প্রস্তাব বীরেরও নহে, বুদ্ধিমানেরও নহে। এতদুভয়ের নামোল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, এই জগতে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অনেক বীর-পুরুষ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। নারীকে মায়ের মত দেখিবে, মায়ের মত তার সঙ্গে কথা কহিবে, মায়ের মত তাহার সহিত ব্যবহার করিবে, মায়ের মত তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। এই চেষ্টা ও এই সাধনাই তোমার প্রয়োজন,—নারীদের রাজপথ হইতে জোর করিয়া গৃহে প্রবেশ করানও নহে কিম্বা যে দেশে নারী নাই, এমন দেশে প্রস্থানও নহে।

"যদি এমন দেশ থাকিত, যে দেশে নারী নাই, সেই দেশে গেলেও তোমার উদ্ধার নাই যতক্ষণ মন হইতে নারীর সংস্কার তোমার ধুইয়া মুছিয়া দূর না হইয়া যাইতেছে। নারীকে মায়ের আসনে বসাও, কঠোর প্রযত্নে এক দিকে হৃদয়-আসনকে কর পবিত্র, অপর দিকে মাতৃবুদ্ধিকে কর প্রসারিত,—প্রলোভনের তাণ্ডব-নর্ত্তন দুই চারিদিন খামাখা খেলিয়া আপনি থামিয়া যাইবে।"

আধ্যাত্মিকতাই ভারতের উদ্ধারের পথ

মুর্শিবাদ জেলা-নিবাসী জনৈক যুবকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার মতে ভারতের উদ্ধারের উপায় খুঁজিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড ওলট পালট্ করিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই। ভারতের উদ্ধারের পথ ভারতের শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহেই প্রদর্শিত হইয়াছে। খোলা চক্ষু লইয়া শাস্ত্র পড়, স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ভারতের উদ্ধারের পথ। বোমা নহে, পিস্তল নহে, ভিক্ষার ঝুলিও নহে, ছল নহে, চাতুরী নহে, মিথ্যার আশ্রয়ও নহে।"

অসত্য দমনের অস্ত্র

বরিশাল জেলা-নিবাসী জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীরাবামণি লিখিলেন,—

"অসত্যকে দমন করিবার শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র সত্য। অসত্যের দ্বারা অসত্য-দমন-চেষ্টা সত্যফল প্রসব করে না। সত্যবাক্, সত্যকাম ও সত্যকর্ম্মা হও, অসত্য ইহারই শক্তিতে পরাজিত হইবে। মিথ্যার সাথে আপোষ করা আর সত্যের জয়-সম্ভাবনাকে বিপন্ন করা এক কথাই জানিও।"

ভারতকে জাগাইবার পথ

শ্রীহট্ট-জেলান্তর্গত মৌলবীবাজার-নিবাসী জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাদের অতীত কি ছিল, কত বড় গরীয়ান্ ছিল, কত বড় মহান্ ছিল, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। এই জন্যই বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দৈন্যের পীড়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের বিশালত্বে বিশ্বাস করিতে দিতেছে না। সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতের অতীত মহিমার গাথা গাহিয়া বেড়াও। আমরা যে অসভ্য বর্ব্বর ছিলাম না, আমরা যে নিজেদের সভ্যতার মধ্যে সমগ্র জগতের উদ্ধারের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজও যে সে মহান্ অতীতের ভগ্নাবশেষটুকু নিখিল জগতের শান্তি, প্রীতি, মৈত্রী ও ঐক্যের সুপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ,—এই বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া যাও। ইহাই ভারতকে আত্মচেতনায় ফিরাইয়া আনিবার শ্রেষ্ঠ সদুপায়, ইহাই ভারতের দৃষ্টি অনন্ত-বিস্তারী সুদূর ভবিষ্যতের পানে নিবদ্ধ করাইবার সুকৌশল। ভারত এভাবেই জাগিবে।"

জাগ্রত ভারত

এই পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"জাগ্রত ভারত বলিতে আমি পরপীড়ক ভারত বুঝি না, শোনিত-পিপাসু অসুরধর্ম্মী বলদর্পিত ভারত বুঝি না। তখনই বুঝিব ভারত জাগিয়াছে, যখন ভারতের জ্ঞানের বলের কাছে জগতের সকল অজ্ঞান স্তম্ভিত হইয়াছে, ভারতের প্রেমের বলের পদপ্রান্তে জগতের সকল অপ্রেম আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আত্মোৎসর্গ জাতিকে জাগাইবার পথ, কিন্তু মৃত্যু-মাত্রকেই আত্মোৎসর্গ বলিয়া উৎসর্গ শব্দটার অবমাননা করা যায় না।"

কলিকাতা

৬ই বৈশাখ, ১৩৩৪

উপাসনার সময় ও নিয়ম

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবদুপাসনা প্রত্যহ কর্ব্বে এবং দিনে রাত্রিতে নিয়মিত চারবার কর্ব্বেই। প্রাতে, দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং শয়ন-কালে এই চার বার উপাসনায় বস্‌বে। মেরুদণ্ড সরল ক'রে স্থিরাসনে ব'সে উপাসনা কর্ব্বে। হাজার কাজ থাকুক, নিজের আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য যে সকলের আগে, একথা মনে রাখবে। প্রাতে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় পৃথক্ আসনে পবিত্র স্থানে ব'সে ধৌতবস্ত্র-পরিহিত অবস্থায় করবে। রাত্রিতে শয়নকালে যে উপাসনা কর্ব্বে, তাতে পৃথক্

আসনের প্রয়োজন নেই, বিছানায় ব'সে শয়ন-কালীন বস্ত্র প'রেই উপাসনা কর্ব্বে এবং যতক্ষণ নিদ্রায় শরীর অবশ হ'য়ে শয্যাশ্রয় না নেয়, ততক্ষণ নামের সেবা চালাবে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বা রুগ্ন থাক্‌লে তখন বিছানায় শুয়ে শুয়েই নাম কত্তে থাক্‌বে, ঘুমের মধ্যে কখনো জেগে উঠ্‌লে তখন পাঁচ রকম বাজে চিন্তায় কালক্ষেপ না ক'রে অবিরাম নামের সেবা কত্তে কত্তেই পুনরায় নিদ্রাগত হবে, অবশ্য যদি নিদ্রিত হবার মত উপযুক্ত পরিমাণ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। শেষ রাত্রে একবার জেগে উঠে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়া সাধারণতঃ ভাল নয়। শেষ রাত্রে বিছানায় ব'সে জপ বা কীর্ত্তন কত্তে শয্যার পবিত্রতা বা পরিহিত বস্ত্রের শুদ্ধতা প্রভৃতি বিচারের প্রয়োজন নেই।

কতক্ষণ উপাসনা করণীয়

পুনরায় অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পেট না ভরলে যেমন মূর্খ ব্যক্তিও ভাতের থালা ফেলে পাত ছেড়ে উঠে না, তোমরাও তেমন অন্তরের পরিপূর্ণ শান্তি, তৃপ্তি এবং স্নিগ্ধতা না আসা পর্য্যন্ত উপাসনা করা ছাড়বে না। শান্তিতে তৃপ্তিতে স্নিগ্ধতায় চিত্ত মন প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লে তখন উপাসনা ছাড়বে, তার আগে নয়।

উপাসনার নিয়ম রক্ষা

প্রশ্ন, হইল,—কিন্তু আমাদের কারো থাকে অফিস, কারো

থাকে স্কুল, চাক্‌রী-নক্‌রীতে ধর্ম্মের সাধনাকে ও উপাসনাকে যেন চেপে ধ'রে রাখে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারই জন্য মাধ্যাহ্নিক উপাসনা-টীর মাত্র নিয়ম রক্ষা কর্ব্বে। নিয়ম-ভঙ্গ কিছুতেই কর্ব্বে না। যার অফিস বা স্কুল সকালে, সে সকালের উপাসনা সম্পর্কে এই ভাবে নিয়ম রক্ষা কর্ব্বে, অথবা শেষ রাত্রিতেই শয্যা ত্যাগ ক'রে উপাসনায় বস্‌বে। চাকুরীর বা পড়ার দোহাই দিয়ে যদি উপাসনার নিয়মটী ভঙ্গ কর, তা' হ'লে ক্রমশঃ তোমার নিষ্ঠার মূলটী শিথিল হ'য়ে যাবে। স্কুল বা অফিসের দিনে যদি নিয়মটীকে দৃঢ় ভাবে রক্ষা না কর, তাহ'লে দেখ্‌বে ছুটির দিন শত চেষ্টা ক'রেও মনকে উপাসনাতে বসাতে পাচ্ছ না। অতএব কাজের দিনেও জোর ক'রে সময় ক'রে উপাসনার নিয়মটী রক্ষা কর্ব্বেই কর্ব্বে। দীর্ঘ সময় ব'সে উপাসনা কত্তে না পার, অল্প সময় ব'সেও নিয়ম রক্ষা কর। পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রধান-অপ্রধান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে এই বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ হ'তে বাধ্য কর।

পথে ঘাটে উপাসনা

প্রশ্ন হইল,—পথে ঘাটে চল্‌তে, রেলে, ষ্টীমারে, মটরে দুরপথ পর্য্যটন কত্তে কত্তে যদি উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় এসে যায় এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন, স্নান বা পৃথক্ আসন গ্রহণের সুবিধা না থাকে, তবে কি করণীয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সকল ক্ষেত্রেও শারীরিক শৌচাশৌচজ্ঞানকে প্রধান না ক'রে সময়ের নিষ্ঠাকে প্রধান কত্তে হবে। মনে মনে কল্পনা কর্ব্বে আদিগুরুর পাদ-বিধৌত গঙ্গা-বারিরাশি তোমার মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে এবং তোমার বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্ববিধ অশুদ্ধতা অশুচিতা অপরিচ্ছন্নতা দূর ক'রে দিচ্ছে। তারপরে যথাবিধান উপাসনা ক'রে যেতে থাক্‌বে।

রজস্বলা অবস্থায় উপাসনা

প্রশ্ন হইল,—স্ত্রীলোকেরা রজস্বলা অবস্থাতেও কি উপাসনা কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা "কত্তে পারে কি না" নয়। কথাটা হচ্ছে কর্ত্তে হবেই। রজস্বলা হ'লে স্ত্রীলোকেরা কি আহার বন্ধ রাখে? উপাসনা হচ্ছে আত্মার আহার ; রোগ বা অন্য বিপর্য্যয় শরীরের উপর দিয়ে যখনি চলুক না কেন, উপাসনা বন্ধ থাক্‌বে না। তবে নিত্যপূজার বিগ্রহটীকে রজস্বলা অবস্থায় তিন দিন স্ত্রীলোকেরা স্পর্শ কর্ব্বে না।

চিরশয্যাশায়ী রুগ্নের উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—চিরশয্যাশায়ী রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে পৃথক্ আসনে ব'সে উপাসনা অসম্ভব হ'লে বিছানাতে তুলসী প্রভৃতির স্পৃষ্ট জলের, সমুদ্র-বারির বা গঙ্গা-যমুনা-নর্ম্মদা প্রভৃতি পবিত্র নদীর জলের ছিটা দিয়ে সেখানে ব'সেই উপাসনা

বিধেয়। যেখানে তুলসী বৃক্ষ নাই, সেখানে বিল্বপত্র-স্পৃষ্ট জলের ছিটাকে পাবনী-বিশিষ্ট জ্ঞান কর্ব্বে। যেখানে গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ-নদী নাই, সেখানে নিকটবর্ত্তী বৃহত্তম স্রোতস্বতীর জলকে তৎস্থলাভিষিক্ত কর্ব্বে। যেখানে তাহাও নাই, সেখানে ভগবন্নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক পাখা বা হস্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন কর্ব্বে এবং সেই বায়ুর স্পর্শে দেহ, বস্ত্র, শয্যা আদি শুদ্ধ হ'ল ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে। যার বসার ক্ষমতা নেই, সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিছানায় শুয়েও উপাসনা কত্তে পার।

পবিত্রতা-বিধায়ক বস্তুসমূহ

প্রশ্ন হইল,—তুলসীপাতার স্পৃষ্ট-জলকে বা গঙ্গাজলকে পবিত্রতা বিধায়ক মনে করব কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনন্ত যুগ-যুগান্ত থেকে সাধক, ভক্ত, মহাপুরুষেরা গঙ্গাজল, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, দুর্ব্বা ও পূজার নির্ম্মাল্যকে পাবনী-শক্তি বিশিষ্ট ব'লে জ্ঞান ক'রে এসেছেন। তাই, তোমারও তা' ক'রো। সমবেত অখণ্ডোপাসনার নির্ম্মাল্যকে তোমরা জগতের সকল পাবক বস্তুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রো।

সমবেত উপাসনা ও ব্যক্তিগত উপাসনা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত উপাসনাতে যোগ দেওয়াকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পুণ্য বলে জ্ঞান কর্ব্বে। সমবেত

উপাসনার প্রসাদ-গ্রহণকে জীবনের পরম লাভ ব'লে গণনা কর্ব্বে। সমবেত উপাসনার নির্ম্মাল্য-সংগ্রহকে সকল অকুশলের নিবারক ব'লে জান্‌বে। সমবেত উপাসনার সহায়তা করাকে মহৎ-ব্রত ব'লে মনে রাখ্‌বে। যেদিন যে বেলা সমবেত উপাসনাতে যোগ দেবে, সেদিন সে বেলা ব্যক্তিগত উপাসনা করার প্রয়োজন হবে না।

গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা বনাম সমবেত উপাসনা

প্রশ্ন হইল,—কাহারও গৃহে যদি অখণ্ড-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁর নিত্যপূজার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি নিকটে কোথাও সমবেত উপাসনা হয়, তা' হ'লে সে কি কর্ব্বে? নিত্য-পূজায় অবহেলা কর্ব্বে, না সমবেত উপাসনায় অবহেলা কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তম প্রশ্ন। পারতপক্ষে দুইটীর একটীকেও অবহেলা কর্ব্বে না। গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে সংক্ষেপে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সে সদলে সবলে সপরিবারে সবান্ধবে গিয়ে সমবেত উপাসনায় যোগ দেবে। সমবেত উপাসনার দিনে এই অনুষ্ঠানটীই তোমার প্রধান জিনিষ। এর জন্য গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-পূজায় ত্রুটী হ'লেও সেই ত্রুটী ত্রুটী নয়। তোমার গৃহে মাত্র ব্যক্তিগত ভক্তিতে যিনি পূজিত হচ্ছেন, সমবেত উপাসনায় সকলের সম্মিলিত ভক্তিতে তিনিই পূজিত হচ্ছেন। সেই একেরই

পূজা তোমার, আমার, সকলের লক্ষ্য। আমার গৃহে বা তোমার গৃহে হ'ল না ব'লে খুঁটি ধরতে যাওয়া কিন্তু হ'য়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত অহমিকার পূজা। তোমরা অহমিকার পূজা কেউ ক'রো না।

কলিকাতা

৭ই বৈশাখ, ১৩৩৪

জনৈক শিষ্য কয়েকদিন যাবৎ ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া ভবানীপুরে আছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ওখানে রোজই যাইতেছেন এবং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ থাকিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি রোগীশুশ্রূষায় নিরত আছেন, এই সময়ে রোগীর কতিপয় আত্মীয় উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। কথায় কথায় আলাপ আরম্ভ হইল।

বাঙ্গালী বনাম হিন্দুস্থানী সাধু

হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগত আত্মীয়টী বলিলেন,—দেখে এলাম, পশ্চিমা সাধুরা বাঙ্গালী সাধুদের চেয়ে অনেক উন্নত।

রোগীর অন্যতম আত্মীয় শশধরও রোগীর শুশ্রূষা উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—সে কথা বলা যায় না। বাঙ্গালী সাধুদের মধ্যেও এমন এক একটা বিশেষত্ব আছে, যা' পশ্চিমা সাধুদের মধ্যে নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একথায়ও সত্য আছে। বাংলা

দেশটা সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে অনেক প্রকারেই আলাদা। বাংলার মাটী আর বংলার আবহাওয়া পশ্চিম-ভারত থেকে কোমল ও সরস। তাই বাংলায় ভাবের জন্ম হয় আগে, হৃদয়টা কোমল হয় বেশী। কিন্তু পশ্চিমের মহাত্মারা শক্ত মাটি আর কড়া জলের গুণে বাঙ্গালীর চেয়ে বেশী অধ্যবসায়ী ও সহিষ্ণু হন।

হরিদ্বার-প্রত্যাগত আত্মীয়টী বলিলেন,—হিন্দুস্থানী সাধুদের মধ্যে সাধক লোকের সংখ্যা খুব বেশী।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার কয়েকটি মস্ত কারণ রয়েছে। পশ্চিমে সাধুদের সেবার ভার সমাজ স্বেচ্ছায় নেয়। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেই তাঁরা নিশ্চিন্তে সাধন-ভজন কত্তে পারেন। বাঙ্গালী গৃহীরা পশ্চিমা গৃহীদের মত সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি মুক্ত-হস্ত নন। তাই, বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে ক্ষুধার্ত্ত উদর নিয়ে রোগীর শুশ্রূষা কত্তে হয়, রুগ্ন দেহ নিয়ে রিলিফ কাজ কর্ত্তে হয়। তাঁরা হৃদয়ের টানে সমাজের সেবায় ছুটে যান, দেহকে বাধ্য হ'য়ে নিপন্ন করেন। বাঙ্গালী সাধু হৃদয়জীবী, তাই তাঁদের মধ্যে সমাজ-সেবকের সংখ্যা বেশী, মোক্ষপরায়ণের সংখ্যা কম। দৃষ্টান্তের জন্য বেশীদূর যেতে হবে না, এক স্বামী বিবেকানন্দকেই দেখ না কেন?

অল্প বয়সে গুরুসঙ্গের সুফল

একটু থামিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় বলিলেন,—পশ্চিমা সাধুদের অধিকাংশই সাত আট বৎসর বয়সেই গুরুর সঙ্গ পান।

তাঁদের বাপ-মা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ ছেলেদিগকে সদ্‌গুরুর হাতে তুলে দেন। আর বাঙ্গালী বাপ-মায়ের অবস্থা কি? দিয়ে দেওয়া দূরে থাক্, কোনো ছেলে সদুপদেশ পাবার জন্য সাধু-সঙ্গ খুঁজ্‌লে তাকে রাঙ্গা-টুক্‌টুকে একটী বউ এনে হাতে পায়ে শিকল বাঁধবার আয়োজন হয়। বাঙ্গালী বাপ-মায়ের আতঙ্কের অবধি নেই, গেরুয়া কাপড় দেখ্‌লেই বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে,—ভাবে, আমার ছেলেটাকেই বুঝি চুরি ক'রে নিয়ে যেতে এসেছে? বাল্যাবধি কুসঙ্গে প'ড়ে ছেলেরা গোল্লায় যাক্, গুপ্ত অসংযমে সে জাহান্নামে ডুবুক্, মদ খেয়ে মাত্‌লামী করুক, বেশ্যাবাড়ী যাক্, তাও স্বীকার, কিন্তু ছেলে যেন সাধু না হয়। পশ্চিমা সাধুরা গুরু-সঙ্গে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পুরোপুরী পালন ক'রে তার পরে সন্ন্যাস নেন; বাঙ্গালীর ছেলের সে কপাল-জোর নেই, তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের কোনও সুযোগ না পেয়ে শুধু প্রাণের টানে সন্ন্যাসী হন।

রাত্রি আটটার পর শ্রীশ্রীবাবামণি রোগীর বাসা হইতে ফিরিলেন। সঙ্গে শশধরও আসিলেন। শশধরকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আদি-গঙ্গার তীরে বসিলেন। অদূরে কয়েকজন ভগবদ্ভক্ত মৃদু-মধুর কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ও শশধর অন্ধকারের আড়ালে বসিয়া নিঃশব্দে হরিনাম শুনিতে লাগিলেন। উঠিবার সময়ে শশধর বলিলেন,—সাধু-সঙ্গের ইহাই গুণ, হরিনামের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীরা গৃহীদের সন্তান

পথে সাধুদের প্রতি গৃহীদের মনোভাবের প্রসঙ্গ উঠিল। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকালকার লোকেরা সাধুদের উপরে কেমন চটা, তা' দেখ্‌তে পাচ্ছ ত'? কিন্তু কোন বুদ্ধিমানই একবার তলিয়ে দেখ্‌ছেন না যে, তাঁদের ঔরসে জ'ন্মে যাঁরা সাধু হবেন, তাঁরা আর কতদূর এগুবেন? গৃহীরা সব সাধুদের নিন্দে ক'রে বেড়াচ্ছেন কিন্তু লজ্জাবোধ করেন না যে, এসব নিন্দিত লোকেরা তাঁদেরই ঘরে জন্মেছিল। গৃহীরা যদি জন্ম দেন ছাগল আর কুক্কুরের, তাহ'লে সাধুরা কি হবেন ঐরাবত আর সিংহ?

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—সন্ন্যাসের ভিতরে যে ব্যভিচার ঢুকেছে, তার সংশোধন হয় কটাক্ষে, যদি সন্ন্যাসীর জন্ম-দাতারা আত্ম-সংশোধন করেন। জনকের ভিতরে পাপ রয়েছে, সন্তান তার প্রভাব কিছু না পেয়েই ত' পারে না। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে চাই গার্হস্থ্যের সংশোধন। সন্ন্যাসকে উৎখাত ক'রে সন্ন্যাসীদের মধ্য হ'তে ব্যভিচার দূর করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। গৃহীদের ভিতরে সংযম সাধনার প্রতিষ্ঠা কত্তে চেষ্টা কল্লেই সে চেষ্টা সুফলপ্রদ হবে।

সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য নয়, উৎসর্গই আদর্শ

শশধরকে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য কখনো কারো আদর্শ হ'তে পারে না,

উৎসর্গই হবে মানুষের আদর্শ। যে উৎসর্গ কর্‌লে আমার পূর্ণ তৃপ্তি হবে, সকল তৃষ্ণা মিটে যাবে, সেটাই হবে আমার আদর্শ। যে ভাবে উৎসর্গ করলে চরম চরিতার্থতা মিল্‌বে, তাই হ'ল পন্থা। গৃহীর জীবনও উৎসর্গের, সন্ন্যাসীর জীবনও উৎসর্গের। তবে উৎসর্গের প্রকার-ভেদ আছে। যিনি যেরূপ উৎসর্গের যোগ্য, তিনি সেরূপ ভাবেই কর্‌বেন। যিনি যেটির অযোগ্য, তিনি সেটি কত্তে গেলে বিপদে পড়্‌বেন।

সন্ন্যাসীর লাম্পট্যে সমাজের সর্ব্বনাশ

শশধর।—গৃহী হওয়া বড় শক্ত কথা।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়, বিয়ে কর্‌লেই গৃহী হওয়া যায় নাকি? গৃহীর জীবনে দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে। দার-পরিগ্রহ কর্‌লেই হ'ল না, সংযম রাখা চাই; সন্তান জন্মালেই হ'ল না, তাদের জীবনগুলিকে উন্নতিমুখী ক'রে ফুটিয়ে তোলা চাই; উপার্জ্জন কর্ল্লেই হ'ল না, দশজনকে প্রতিপালন করা চাই; সংসারের কর্ত্তা হ'লেই হ'ল না, নিজেকে ভগবানের দাস জানা চাই। কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়াও বড় সোজা কথা নয়। গৃহীর চেয়ে অন্য বিষয়ে দায়িত্ব তার কম, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের দায়িত্ব তার শতগুণ বেশী। কারণ, সন্ন্যাসী যদি লম্পট হয়, তবে তার প্রলোভন কোথায় নাই? আর, বিড়াল যদি তপস্বী হয় তবে কয়জন তার কবল থেকে আত্মরক্ষা কত্তে পারে? ঘরে ঘরে সে প্রবেশ করে, সংসারের পর সংসারকে সে তার লালসার অনল

দিয়ে দগ্ধ করে, পাপের ধূমে ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করে। সরলা কুল-বধূর সে সর্ব্বনাশ করে, বয়ঃস্থা কুমারীর সে পবিত্রতা নাশ করে, যুবতী বিধবাকে সে ধর্ম্মের ছলে অধর্ম্মের পথে টেনে নেয়, অপরিণতবুদ্ধি বালক ও কিশোরের মধ্যে সে আদরের ছলনায় মৃত্যুর বিষ ছড়ায়। ইট, কাঠ, পাথর বাদ যায় না, তার শনির দৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। কারণ, বৈধ ভোগের পথ যার খোলা আছে, সহজে সে অবৈধ পথে পদার্পণ করে না, কিন্তু বৈধ ভোগের অধিকার যার নাই, তার চিত্ত চঞ্চল হ'লে সে অবৈধ পথেই চলে; একটা অবৈধ পথে যে চল্‌তে পেরেছে, শত শত অবৈধ পথে আর তার পা আট্‌কায় না। একটা স্ত্রীলোককে যে নষ্ট করেছে, শত শত স্ত্রীলোককে নষ্ট করার বিষময় বীজাণু সে তার গায়ের বাতাসের সাথে বহন ক'রে বেড়ায়।

সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি

শশধর।—গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিষয়ে সেদিন ত্রিপুরায় ল-বাবুর সাথে কথা হয়েছিল। তিনি বলিলেন,—সন্ন্যাসীরা নিকৃষ্ট, গৃহীরাই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ নিয়ে ঝগড়া কত্তে যাওয়া বোকামী। Each is great in its own place (যাঁর যাঁর জায়গায় তিনি শ্রেষ্ঠ)। যিনি যে পথের যোগ্য, তিনি সে পথ ধরুন এবং সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের মধ্য দিয়া কৃতকৃতার্থ হোন্‌। সবার

জন্য সকল পথ নয় ; কারণ, সকলের রুচি, প্রকৃতি ও যোগ্যতা এক নয়, কিন্তু যার জন্য যে পথ, তিনি তা' অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় অনুসরণ করুন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে,—যার যার কর্ত্তব্য সে ক'রে যাচ্ছে কি না। দল-পুষ্টির কথা নয়, কথা হচ্ছে যার যার নিজ নিজ মতন বলপুষ্টি হচ্চে কিনা। নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, কথা হচ্ছে নিজের আশ্রমের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে কি না। কদাচারী গৃহীর যে গার্হস্থ্য, তাকে কি সন্ন্যাসের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে? কদাচারী সন্ন্যাসীর যে সন্ন্যাস, তাকে কি গার্হস্থ্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলা চল্‌বে?

সার্থক গার্হস্থ্য

তৎপরে আদর্শ গার্হস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের চরম সার্থকতা ভগবানকে পাওয়াতে। ভগবান্ আর মানুষের ভিতরে যদি কেউ ভাবালসার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে আর ভগবানের স্পর্শ অনুভবে আসে না। তবে সেই মধ্যবর্ত্তী বস্তুটীকে যদি ভগবান্ ব'লেই বুঝা যায়, তবে আর গোল নেই। গৃহী হ'তে হ'লে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে আর স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে ভগবদ্-বিগ্রহ ব'লে জানা চাই। নইলে, গৃহী হ'তে পার কিন্তু জীবনের সার্থকতা হ'ল না, ভগবানের অঙ্গের পরশ মিল্‌ল না। যে পুরুষের মন লালসাতুর হ'য়ে স্ত্রীর মধ্যে প'ড়ে আছে, আর যে স্ত্রীর মন ভোগলোলুপ হ'য়ে স্বামীর মধ্যে প'ড়ে আছে, তারা ভগবানকে পাবে কি ক'রে? ভগবানকে

পেতে হ'লে, তাঁর পায়ে মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রে দিতে হবে, তাঁকে ভালবাস্‌তে হবে, প্রাণের সকল অনুরাগ উজাড় ক'রে দিয়ে তাঁতেই ঢাল্‌তে হবে। কিন্তু একজনকে যে ভালবেসেছে, সে আর একজনকে ষোল আনা ভালবাস্‌তে পারে কি? একটা মন দিয়ে দুজনের প্রতি পূর্ণ অনুরাগশীল হওয়া যায় কি? তাই স্বামী ও ভগবানে অভেদ বুদ্ধি চাই স্ত্রীর, আর স্ত্রী ও ভগবানে অভেদবুদ্ধি চাই স্বামীর। স্বামীর সঙ্গকে স্ত্রী ভগবানের সঙ্গের সাথে অভেদ ব'লে বুঝতে চেষ্টা কর্ব্বে, আর স্ত্রীর সঙ্গকেও স্বামী ঐ ভাবে বুঝতে প্রয়াস পাবে। এর এক ফল—সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকর্ম্মে ভগবৎস্মরণ। দ্বিতীয় ফল এই হবে যে, স্বামীর ও স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণের মধ্যে ক্রমশঃ শুদ্ধতা, সাত্ত্বিকতা ও ভোগ-ভাব-হীনতা আস্‌তে থাক্‌বে। এই রকম ভাবে গার্হস্থ্য যে পালন কত্তে পারে, সেই হচ্ছে সার্থক গৃহী।

কলিকাতা

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪

ওরা সবাই করছে মানা

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর নিকটে নূতন একটা উদ্যান-বাটিকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর ও বিভূতিকে লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে বসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন,—

ওরা সবাই করছে মানা
তাই ব'লে তুই থেমে যাবি?*
ওদের মায়া-কান্না শু'নে
মোহের পায়ে প্রাণ বিকাবি?

এই পথেতে চল্‌তে গেলে
বাধা দিবেই দলে দলে—
তাই ব'লে তুই লক্ষ্য ভুলে
হিতে বিপরীত ঘটাবি!

যুক্তি শুনে নানান্-ধারা
হবি কিরে স্ব-পথ-হারা,
থাক্‌তে আসল হাতের কাছে
নকল নিয়ে কি লাভ্ পাবি?
তুই যে বিশ্বমায়ের ছেলে,
জগৎ-জোড়া তোর সাধনা,
ছোট বড় স্বজাত বিজাত
সবাই যে তোর আপন জনা;
তোর উপরে বিশ্বময়ীর
জন্ম-যুগের কাতর দাবী।

কালাংড়া, একতালা

ভগবানের নাম ও সৎসঙ্গ

শশধর।—কিন্তু স্বামীজী, মনের যে জোর রাখ্‌তে পারি না। চিত্ত যে দুর্ব্বল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হোক্ গে চিত্ত দুর্ব্বল। তুমি তাতে ঘাব্‌ড়াবে কেন? মনের খেয়লে মন থাক্, তুমি নিজের কাজ বাগিয়ে নাও। মন যদি ছোটলোকের মত ছোট জায়গায় থাক্‌তে চায়, থাকুক—কিন্তু তুমি নিজেকে লক্ষ্যের পথে চালাতে থাক।

শশধর।—কিন্তু মন চঞ্চল হ'লে যে লক্ষ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতেও ভয়ের লেশমাত্র নেই। ভগবানের নামে অসাধ্য সাধন হয়। মন স্থিরই থাকুক্ আর অস্থিরই হোক্, তুমি সকল অবস্থাতেই ভগবানের নাম নিয়ে লেগে থাক। অস্থির চিত্ত তোমাকে অকল্যাণের দিকে আকর্ষণ কত্তে চায়, করুক; তুমি নামটী ভুলো না। "হর্‌দম্ লাগা রহো রে ভাই বনত্ বনত্ বন্ যাঈ।"

শশধর।—নামেই যে রুচি হয় না স্বামীজী।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—রুচি কি অম্‌নি হয় বাবা? প্রহ্লাদের মত নিষ্কাম প্রেম সবারই হ'তে যাবে? ধ্রুবের পথেই চল। কামনা নিয়েই ডাক না, তবু ডাক। রুচি তখন আস্‌বে। রুচিরও যে সাধন কত্তে হয়। ডাকের পর ডাকই হ'ল রুচির সাধন।

শশধর।—স্বামীজী, সৎসঙ্গ বড় দরকারী।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে কথা আবার বল্‌তে। কিন্তু সৎসঙ্গ টাই সব নয়। সৎসঙ্গ সাধন-ভজনে উৎসাহ দেয় ব'লেই দরকারী। সাধন-ভজনে যাই উৎসাহ এল, অম্‌নি মানব-সঙ্গ ত্যাগ কর্ব্বে এবং ভগবানের নামের সঙ্গ আরম্ভ করবে। আবার নাম-সেবা কত্তে কত্তে যখন নামে একান্ত অরুচি এসে যাবে, তখন যাবে সে সব সৎপুরুষের সঙ্গ কর্ত্তে, যাদের সঙ্গের গুণে ইষ্টপূজায় মন যায়, ইষ্টনামে আকর্ষণ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার সহজতম উপায়

একটু রাত্রি হইলে শশধর প্রস্থান করিলেন। বিভূতি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কঠিন ত' নিশ্চয়ই, আবার সোজাও বেজায়।

বিভূতি।—সোজা কি রকম?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ কত্তে পার্‌লেই সোজা। ভগবান্‌কে যে নিজের যতখানি দিয়েছে, তার ব্রহ্মচর্য্য ততখানি রক্ষিত হবেই। সবই তাঁকে দাও, সবই তোমার থাক্‌বে।

বিভূতি।—কি ক'রে আত্মসমর্পণ কর্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেহে, মনে, প্রাণে। তোমার দেহ তাঁর কাজের ভাবনায় রাখ, তোমার প্রাণ তাঁকে দাও। প্রাণ কথা নিয়ে গোল বাধবে কি? প্রাণের অনেক মানে। প্রাণ বলতে

শ্বাস-প্রশ্বাসকেও বুঝায়। শ্বাস-প্রশ্বাসই তাঁকে দাও, প্রত্যেকটী শ্বাসে, প্রত্যেকটী প্রশ্বাসে তাঁরই নাম জপ কর। এইভাবে ভগবানের কাজের ভিতর দিয়েই তুমি নিজেকে পূর্ণভাবে পাবে।

ভগবানের কাজ

বিভূতি প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানের কাজ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে কাজের লক্ষ্য ভগবানের প্রীতি, তা-ই ভগবানের কাজ। এখন তুমি ফুল-বেলপাতা পেড়ে পূজাই কর, আর কামানই দাগাও, কি তলোয়ারই চালাও। আত্মপ্রীতি বা স্বার্থপুষ্টির লক্ষ্য নিয়ে যদি তুমি মহৎ কাজও কর, তবু তা' ভগবানের কাজ নয়। আর, ভগবানের প্রীতি লক্ষ্য রেখে, একাজে ভগবান্ প্রকৃতই প্রীত হবেন, এ বিশ্বাসে ভরপুর হ'য়ে তুমি যদি নগণ্য ছোট কাজও কর, তবু তা' ভগবানের কাজ। ষোড়শোপচারে দেবী দশভূজার পূজা কর্ল্লেও অনেক সময়ে ভগবানের পূজা হয় না। আবার কষ্টলব্ধ ক্ষুদকুঁড়া সিদ্ধ ক'রে একটি অন্নহীনকে এক বেলা খাওয়ালেও ভগবানের কাজ হয়। বড় বড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় থেকে এনে সহস্র মণ ঘৃতাহুতি ঢেলেও অনেক সময়ে ভগবানের কাজ হয় না, আবার রুগ্ন, দুর্ব্বল, খঞ্জ মেথরের ছেলের মাথা থেকে বিষ্ঠার হাঁড়ি নামিয়ে নিজ স্কন্ধে তাকে বহন কল্লেই ভগবানের কাজ হয়। ভগবানের কাজ মানে ভগবানের উদ্দেশ্যে কৃত কাজ। কাজটা বড় হোক্ কি ছোট হোক্, তাতে কিছুই আসে

যায় না। কাজটার উদ্দেশ্য থাকা চাই ভগবৎ-প্রীতি। কাজটার উদ্দেশ্য যে ভগবৎ-প্রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়, স্বার্থতুষ্টি নয়, মানবৃদ্ধি নয়, প্রতিষ্ঠা-লোভ নয়, সেই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ থাকা চাই। তবে গিয়ে হ'ল ভগবানের কাজ।

ভগবানের কাজ চিনিবার উপায়

বিভূতি।—অনেক সময়েই ত' আমরা অনেক কাজ করি, ভগবানের কাজ ব'লে প্রচারও করি,—সেগুলি কি সবই ভগবানের কাজ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' কি ক'রে হবে? প্রচারে বা অপ্রচারে কিছু যায় আসে না বাবা। যায় আসে, অন্তরের প্রকৃত অভিপ্রায়ে। তোমার মনোগত অভিসন্ধি যদি থাকে অন্য কিছু, তাহ'লে সহস্র প্রচারেও সেটা ভগবানের কাজ হবে না কিন্তু এমন অনেক সময় আসে, যখন মানুষ নিজের মনোগত অভিপ্রায়কে স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পারে না, অথচ কাজ ক'রে যায়। কিন্তু সে কাজ ভগবানেরই কাজ কিনা, তাও চিন্‌বার উপায় আছে। যে কাজ কর্লে ক্রমশঃ মন ইহমুখ, স্থূলপরায়ণ হ'তে থাক্‌বে জান্‌বে, তা' ভগবানের কাজ নয়, আর যে কাজ কর্লে মন আপনি ভগবানের দিকে অগ্রসর হ'তে থাক্‌বে, সূক্ষ্ম হবে, জানবে তা' ভগবানেরই কাজ। যে কাজ কর্লে ক্রমশঃ পরার্থ-পরতা বাড়ে, জীবে দয়া বাড়ে, হিংসা-দ্বেষ কমে, অভিমান-অহঙ্কার কমে, সে কাজ ভগবানের কাজ। যে কাজ কর্লে সাহস

বাড়ে, ধৈর্য্য বাড়ে, স্থিরতা বাড়ে, সহিষ্ণুতা বাড়ে, আর, পরনিন্দার ইচ্ছা, পর-পীড়নের প্রবণতা, চপলতা, অসহিষ্ণুতা কমে, সে কাজ ভগবানের কাজ। কাজের উদ্দেশ্য প্রদর্শিত থাকুক আর না থাকুক, সর্ব্বজীবে সমদর্শন যে কাজের ফল, তাই জানবে ভগবানের কাজ।

কলিকাতা

৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪

স্বপ্নে দীক্ষা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত ভবানীপুরেই ওলাউঠা রোগীর শুশ্রূষায় রহিয়াছেন। রাত্রি আটটায় স্বকীয় বিশ্রাম-স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি সাধনশীল যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বৈকাল বেলা হইতেই প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন।

একজন একখানা কাগজের টুকরায় নিজ মনোগত কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাহা তাঁহার হাতে দিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—পত্র লেখক বিগত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, যেন শ্রীশ্রীবাবামণি গিয়া তাঁকে দীক্ষা দিয়াছেন, তাই, তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির কৃপা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার শ্রীচরণ-সমীপে সমাগত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দীক্ষা ত' বেটা স্বপ্নেই হ'য়ে গেল, আবার কৃপা কি চাস?

একজন বলিল,—স্বপ্নে দীক্ষা পেলে নাকি গুরুকর্ত্তৃক পুনরায় তা' সংশোধিত ক'রে নিতে হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়, কিন্তু যেখানে স্বপ্নের উপদেশগুলি সুস্পষ্ট স্মরণে আছে এবং গুরুর সূক্ষ্ম শক্তিতেই পূর্ণ বিশ্বাস রয়ে গেছে, সেখানে পুনরায় লৌকিক সংস্কার না নিলেও চলে। আর, যেখানে স্বপ্নপ্রাপ্ত দীক্ষার স্মৃতি এলোমেলো, উপদেশ অস্পষ্ট, প্রভাব আড়ষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, এবং তাতে আস্থা অদৃঢ়, সেখানে লৌকিক পুনঃসংস্কার একান্তই প্রয়োজন।

স্বপ্নে দীক্ষা-লাভের প্রকার-ভেদ

আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা, স্বপ্নে দীক্ষা পাওয়া ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা অনেক রকম। স্বপ্ন বস্তুটা আগে বুঝে নাও, তা' হ'লেই সব বুঝবে। নিদ্রার অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ও মানস জ্ঞান নিবিড় তমসায় অভিভূত হ'য়ে থাকে, সামান্য পরিমাণে অস্ফুট একটা জড় অনুভূতি মাত্র থাকে। কিন্তু স্বপ্নের অবস্থায় মানস ভাব সকল প্রস্ফুটিত হ'তে থাকে, যদিও বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধই থেকে যায়। এই যে মানস ভাব, এটা তোমার নিজের মনেরও হতে পারে, কিন্তু অন্য শক্তিশালী মনের প্রেরণাও হ'তে পারে। তোমার হয়ত অন্তরের ভিতরে প্রকৃতই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, কোনো মহাত্মার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার কিন্তু মনের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে আরও এতগুলি কামনা-বাসনা

গিজ্‌গিজ্ কচ্ছে যে, দীক্ষালাভের এই আকাঙ্ক্ষা সকলকে ঠেলেঠুলে মাথা জাগিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সমগ্র দিন যে সব কামনা-বাসনা তোমার উপরে যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করেছে এবং যাদের অনুরোধ, আদেশ ও আব্দার যথেষ্ট পরিমাণে পালন কত্তে চেষ্টা করেছ, স্বপ্নকালে প্রায়ই তারা বড় একটা অধীর হয় না, যারা অনাদৃত উপেক্ষিত ছিল, এই সময়ে তারাই আত্মপ্রকাশ করে এবং তোমাকে মুগ্ধ করার জন্য কল্পনার ভুবনমোহন বেশ পরিধান করে। অনেক স্থলে স্বপ্নে দীক্ষালাভ ব্যাপারটা এই রকম, তুমি যে দীক্ষালাভের কামনা মনে মনে কচ্ছ, তারই দ্যোতক মাত্র। এ সব স্থলে প্রায়ই দীক্ষার কথাটা মনে থাকে, কিন্তু দীক্ষার আসল কিছুই স্পষ্ট মনে থাকে না। আবার এমনও হয় যে, তোমার একজন বন্ধু তোমাকে কারো কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্যে হয়ত পীড়াপীড়ি কখনো করেছিলেন, তারই প্রভাবটা সঙ্গোপনে মনের মধ্যে রয়ে গেছে, ফলে স্বপ্নে দেখলে, তুমি যেন কারো কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছ। এসব স্থলে মন্ত্র বা সাধনপ্রণালীর কথা প্রায়ই মনে থাকে না। এমনও হয় যে, তোমার এক বা একাধিক বন্ধু মুখ ফুটে কিছু বলছেন না, কিন্তু মনে মনে তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা কচ্ছেন যে, তুমি তাঁদের গুরুদেবের শরণাপন্ন হও। তার ফলে, তুমি যখন নিদ্রিত হ'লে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাহ্যজ্ঞান ও তোমার মানস জ্ঞান উভয়ই তমোঽভিভূত হ'য়ে এল, তখন আস্তে আস্তে তাঁদের মানস ভাবই মনোহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে

তোমার সুপ্ত মনের মধ্যে এসে উদিত হ'ল এবং বহু খোশ-মেজাজি অতিথিকে যেসব গৃহস্থ দু'চার মিনিট যেতেই একান্তই নিজের বাড়ীর মানুষ ব'লে মনে করে, তুমিও তেম্‌নি বহিরাগত এই মানস ভাবগুলিকে তোমার নিজের মনের ভাব ব'লে মনে কত্তে আরম্ভ কর্ল্লে। এভাবেও অনেকে স্বপ্নে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। এসব দীক্ষা পাওয়ার পরেই পুনরায় লৌকিক দীক্ষা-সংস্কার গ্রহণ করা আবশ্যক।

যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষা ব্যাপারটা এসব থেকে একেবারে আলাদা। যার চেহারা দেখ নাই, এমন কি ছবিখানা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই, এমন ব্যক্তিও এসে যখন দীক্ষা দিয়ে যান,তখন বুঝ্‌তে হবে, এই দীক্ষার মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কারের কারিকুরি কিছুই নাই। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষায় হয় গুরু দূরদূরান্তর থেকে শিষ্যের কাছে সূক্ষ্ম দেহে আসেন, নতুবা শিষ্য তার মনোময় সূক্ষ্ম তনুতে গুরু সন্নিধানে গমন করে এবং একজনের শক্তি অপরের মধ্যে অবতরণ করে। এসব স্থলে পুনরায় লৌকিক দীক্ষার সংস্কার গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। তবু যদি কেউ তা' গ্রহণ করে, তবে জানবে, অধিকন্তু ন দোষায়।

প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু কোন্‌টা যে যথার্থ স্বপ্নদীক্ষা, আর কোন্‌টা নয়, তা' বুঝ্‌বার কি কোনও উপায় নাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই আছে। তামা পিতল পরীক্ষার উপায় না জানা থাক্‌লে ক্ষতি নেই, কিন্তু সোণা চিন্‌বার উপায় জানা থাকা যে খুবই দরকার রে! যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার জাগরণের পরেও স্বপ্নকে স্বপ্ন ব'লে বিশ্বাস কত্তে প্রবৃত্তি হয় না এবং গুরুদত্ত উপদেশের একটী কথাও বিস্মৃত হয় না। গুরু-কৃপারই এমন একটা আশ্চর্য্য প্রভাব যে, স্বপ্নাভিভূত মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য জাগরণ, একটা অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি উন্মেষিত হ'য়ে যায়। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার পরমুহূর্ত্ত থেকে শিষ্য নব-জীবনের অমৃত রসায়ন আস্বাদন কত্তে থাকেন, অতীতের পাপ-তাপ মলিনতা যেন নিমেষে দূর হ'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়, নিমেষের মধ্যে নিজের উপরে, নিজের ভবিষ্যতের উপরে যেন একটা সুগভীর আস্থা জন্মে যায়। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার লক্ষণ এই যে, এই দীক্ষালাভের পরে আর তন্দ্রাঘোর থাকে না, অথচ কোন্ সময়ে যে তন্দ্রা কেটে গেল, তাও অনুভব করা যায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি যখন এই সব কথা বলিতেছেন, তখন দীক্ষা-প্রার্থী যুবকটী কাঁদিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া নিয়া নিভৃত এক কক্ষে বসিয়া সাধন প্রদান করিলেন।

স্বপ্নে মূর্ত্তি-দর্শনে কর্ত্তব্য

নবদীক্ষিত যুবকটী প্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি সমবেত

যুবকদের নিকটে স্বপ্ন সম্বন্ধেই নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন অনেক সময় হয়, যখন স্বপ্নে কোনও দীক্ষা বা পূজার্চ্চনাদির আদেশ পাওয়া যায় না, কিন্তু মনোরম মূর্ত্তি-সমূহ দৃষ্ট হয়। এসব স্থলে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি যদি পবিত্রতার ভাবোদ্দীপক হয়, তাহ'লে নিদ্রাবসানেও সেই মূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্বে। যেমন, ইষ্টমূর্ত্তি, দেবমূর্ত্তি, গুরুমূর্ত্তি, মহাপুরুষমূর্ত্তি বা মাতৃমূর্ত্তি। শুধু তাই নয়, যদি দীক্ষাপ্রাপ্ত বা নির্দ্দিষ্ট সাধনমার্গাবলম্বী না হ'য়ে থাক, তাহ'লে স্বপ্নদৃষ্ট পুণ্যভাবোদ্দীপক মূর্ত্তিকেই তোমার একমাত্র আরাধ্য-মূর্ত্তি জ্ঞানে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তাতে চিত্তার্পণ কর্ব্বে। এতে ক্রমশঃ চিত্তের স্থৈর্য্য ও আধ্যাত্মিক সাধনে মনের কুশলতা বাড়্বে। যদি কয়েক দিন পরে পরে নূতন নূতন মূর্ত্তি দর্শন হতে থাকে, তাহ'লে নূতন মূর্ত্তিটী দর্শনের পরে ভাবতে থাক্বে যে, পূর্ব্বের মূর্ত্তিটী যাঁর, এই নবাগত মূর্ত্তিটীও তাঁরই, বাইরে রূপের ভেদ দৃষ্ট হ'লেও অন্তরের সত্তা এক,—এবং তার পরে নবাগত মূর্ত্তিরই ধ্যান করবে। যদি পূর্ব্বদৃষ্ট কোনও মূর্ত্তির মনোহারিত্ব তোমার চিত্তকে এমন মুগ্ধ ক'রে থাকে যে, তাকে কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্ছ না, তাহ'লে মনে মনে কল্পনা কত্তে থাক্বে যেন উভয়মূর্ত্তি এসে একত্র মিলিত হ'য়ে যাচ্ছেন এবং একজনের হস্ত-পদ-মুখাদির সাথে আর এক জনের হস্তপদমুখাদি সম্পূর্ণরূপে মিলে এক হ'য়ে যাচ্ছে।

স্বপ্নে অপবিত্র ভাবের উদ্দীপক মূর্ত্তি দর্শনে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু যদি স্বপ্নে এমন কোনও মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, যা' মনোরম, কিন্তু অপবিত্র ভাবের উদ্দীপক, তা'হ'লে তার চিন্তা বর্জ্জন কর্ব্বে। মনকে জোর ক'রে সেই মূর্ত্তির স্মৃতি থেকে টেনে আন্‌বে। ভুলে যাবে যে, এমন কোনও মূর্ত্তি তোমার কখনও দৃষ্ট হয়েছে। এভাবে চেষ্টা কত্তে কত্তে আপনি সেই অপবিত্র স্মৃতি দূর হ'য়ে যাবে। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও যদি তাকে ভুলতে না পার, দিনেরপর দিন যদি সেই মূর্ত্তি বারবার মনের মধ্যে উদিত হ'য়ে তোমাকে বিচলিত কত্তে চায়, তাহ'লে অন্য উপায় অবলম্বন কত্তে হবে। সেটি হচ্ছে, নিজে ইচ্ছা ক'রে ঐ মূর্ত্তিকেই চিন্তা করা এবং এমন ভাবে চিন্তা করা যেন স্পষ্টরূপে তার শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনা-নেত্রে দৃষ্ট হয়। তারপরে ঐ মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গে মন স্থির ক'রে ঐ অঙ্গটী যে ধ্বংসশীল, ঐ অঙ্গটীর শক্তি যে সীমাবদ্ধ, ঐ অঙ্গটীর শেষ পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ,—কেবল এই বিষয়ে ভাব্‌তে থাক্‌বে। ঐ যে কুরঙ্গ-নয়ন, মৃত্যুর পরে এ'কে কাকে ঠোক্‌রাবে; ঐ যে চিকুর গুচ্ছ, মৃত্যুর পর তা' শ্মশানের ধূলায় লুণ্ঠিত হবে; ঐ যে সুকুমার অঙ্গ, জীবনাবসানে তা' শৃগাল-শকুনিতে টেনে টেনে ছিঁড়ে খাবে। এ ভাবে ঐ দৃশ্যের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হবে এবং

তখন দেখবে, ঐ মূর্ত্তিটিকে সামান্য চেষ্টায় ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এতেও যদি না কুলায়, তবে তখন ধর্‌বে পাশুপতাস্ত্র। গুরুমূর্ত্তি বা মাতৃমূর্ত্তি চিন্তা ক'রে সেই মূর্ত্তিকে এনে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়ে দেবে। একের চ'খে অপরের চ'খ একের মুখে অপরের মুখ, একের হস্তে অপরের হস্ত, একের চরণে অপরের চরণ মিলিয়ে যেন একটা বিগ্রহে পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে, এরূপ কল্পনা কর্ব্বে। এভাবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখবে, ঐ মূর্ত্তির মনোরমত্ব এক কণাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়নি, অথচ তার ভিতর থেকে অপবিত্র ভাবটা একেবারেই দূরীভূত হ'য়ে গেছে।

অজপা-সাধনের উৎপত্তি

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আগন্তুক যুবকগণ নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করিলেন। সুসঙ্গ-দুর্গাপুর হইতে লিখিত জনৈক জিজ্ঞাসুর এক পত্রের উত্তর লিখিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রাম লইলেন। পত্রে লিখিলেন ঃ—

"জীবনে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিয়ত যে ধ্বনি হইতেছে, তাহা মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের বিঘ্ন। মন একটু সূক্ষ্মানুভূতিশীল হইলেই শ্বাস-স্পন্দনকে যেন বজ্রনির্ঘোষের মত শুনা যায়। ইহা মনকে পরমাত্মার দিক হইতে বারংবার টানিয়া আনিতে চাহে। ইহার এই বিঘ্নসঙ্কুলতাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া শত্রুর কাছ হইতেও মিত্রতা আদায় করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই দিব্যদর্শীরা নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্লাশের সব চেয়ে দুষ্ট

ছেলেটাকেই যেমন ক্লাশের "মনিটার" করা হয় এবং ইহার ফলে একদিকে যেমন তার চঞ্চলতা প্রশমিত হয়, অপর দিকে তেমন অপরাপর বহু দুষ্টের দুষ্টতা প্রতিরুদ্ধ হয়, ঠিক সেইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ করিতে অভ্যাস করিলে, যে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ত-চঞ্চলতা মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদনের বিঘ্ন, সেই শ্বাস-প্রশ্বাস আপনা আপনি স্থির হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের সহস্র প্রকারের দুর্দ্দমনীয় চঞ্চলতাকে ধীরতা এবং সহস্র প্রকারের দুরপনেয় আবিলতাকে নির্ম্মলতা প্রদান করে।

"যোগশাস্ত্র দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব ও শ্বাস-প্রশ্বাসকে 'বিক্ষেপসহভূ' বলিয়াছেন। 'বিক্ষেপসহভু' কথাটার মানে বিক্ষেপের সহিত যাহা জন্মে, চঞ্চল মনে যাহা আসে। অর্থাৎ যোগশাস্ত্র বলিতেছেন, মনের চঞ্চল অবস্থায়ই দুঃখ আসে. ক্ষোভ আসে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের চঞ্চলত্ব আসে। যখন মন স্থির, প্রশান্ত, সমাহিত, তখন দুঃখও আসে না, ইচ্ছার ব্যাঘাত-জনিত মনঃক্ষোভও আসে না, শারীরিক অস্থিরতা বা একাসনে বসিয়া থাকার অক্ষমতাও আসে না এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততাও থাকে না, আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়, স্থির হয়, এমন কি মনের সম্পূর্ণ সমাহিত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও গতিই থাকে না, দেহকে কোনও প্রকারে বিপন্ন না করিয়া, কোনও প্রকার রোগের কারণ না হইয়া আপনা আপনি প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। যোগীরা আবার ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দুঃখ আসিলে, দৌর্ম্মনস্য আসিলে,

শারীরিক কম্পনাদি হইলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিলে, তাহা দ্বারাও মন চঞ্চল হয়, অধীর হয়, বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং এইগুলিকে শুধু বিক্ষেপ-সহভু না বলিয়া বিক্ষেপ-জনকও বলিতে হইবে। তন্মধ্যে দুঃখ আবার সর্ব্বক্ষণ থাকে না, কখনো কখনো দুঃখ দূর হয়। দৌর্ম্মনস্যও সর্ব্বক্ষণ থাকে না, অভিপ্রেত বস্তুর প্রাপ্তির দ্বারা মনের ক্ষোভ অনেক সময় নিবারিত হয়। শারীরিক চঞ্চলতাও সর্ব্বক্ষণ থাকে না, সমান্য চেষ্টা দ্বারা সাধক দীর্ঘকাল স্থিরভাবে একাসনে বসিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করে না, যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ সে সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।

অথচ, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্বাস-প্রশ্বাস যোগবিঘ্ন, একাগ্রতার বাধা, সমাধির শত্রু। এই অবস্থায় কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অপরিহার্য্য শত্রু সম্বন্ধে যে কৌশল অবলম্বন করেন, আমাদের তত্ত্বাম্বুধিপারগ পূজনীয় যোগাচার্য্যেরা সেই কৌশলই অবলম্বন করিলেন। পরমশত্রু শ্বাস-প্রশ্বাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন,—ভাই হে, তোমরা আমাদের পরমবন্ধু, একান্ত হিতকারী সুহৃৎ, তোমরাই আমাদের প্রাণ। এস, আমাদের প্রেমের অর্ঘ্য লও, আমাদের পূজা লও, আমাদের প্রণতি লও, নতকন্ধরে আমরা তোমাদের বন্দনা করিব, তোমাদের পায়ে দেহ-মন, জীবন-যৌবন সঁপিয়া দিব, তোমাদের সেবায় নিজেদিগকে বিকাইয়া দিব, নিয়ত চ'খের কোণে তোমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিব, তোমাদিগকে ছাড়া জগতে

আর কাহাকেও ভালবাসিব না, আর কাহাকেও বাহুপাশে বাঁধিব না, তোমাদের নূপুর-শিঞ্জিত সতত কর্ণে শুনিব, তোমাদের চারুচরণের নৃত্যবিলাসে নিরবধি নয়ন-যুগল লাগাইয়া রাখিব।

"শ্বাস-প্রশ্বাস ত' এই কথা শুনিয়া গোষ্ঠবিহারী কানাই বলাইয়ের মত আসিয়া যোগাচার্য্যেদের সমক্ষে হাসিয়া দাঁড়াইলেন এবং এত নির্ভর, এত ভাব, এত ভক্তি ও এত বড় আত্মসমর্পণের প্রভাবে খুশী হইয়া বলিলেন,—হে ভক্তবৃন্দ,—তোমরা যখন আমাদিগকে এতই ভালবাসিয়াছ, তখন আমরা তোমাদিগকে একটী অব্যর্থ-ফলপ্রদ বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা তোমাদের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা কর।

"যোগাচার্য্যেরা মনে মনে হাসিয়া এবং বাহিরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য-রক্ষা করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তোমাদের নিকটে অজরত্ব চাহি না, অমরত্ব চাহি না, ইন্দ্রত্ব চাহি না, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য চাহি না, মান চাহি না, যশ চাহি না, কুলোজ্জ্বলকারী সহস্র পুত্র চাহি না, গৌরববর্দ্ধনকারী সহস্র শিষ্য চাহি না, প্রেমময়ী ভার্য্যা চাহি না, পার্থিব জগতের কোনও লোভনীয় বস্তু চাহি না,—চাহি শুধু অতি ক্ষুদ্র একটি অনুরোধ রক্ষা,—আমাদের জন্য অতি সামান্য একটি কর্ম্মসম্পাদন,—যদি অভয় প্রদান কর, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বলি।

"শ্বাস-প্রশ্বাস অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে ভক্তবৃন্দ, তোমাদের নিষ্কামতায় বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। আমরা দানকল্পতরু, কোনও প্রার্থীকেই ফিরাইয়া

দেই না,—তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত কর। সত্যই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় এবং সত্যই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছে। নিশ্চিত জানিও, হে ঋষিবৃন্দ, আমরা আমাদের সত্য রক্ষা করিব।

"এতক্ষণে ঋষিরা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং মনের ভাব আর গোপন না রাখিয়া বলিলেন,—হে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী পরমগুরো, তোমাদের নিকটে আমাদের এই প্রার্থনা যে, যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল আমাদের ইষ্টনামের বোঝাটা কৃপাপূর্ব্বক তোমরা তোমাদের নিজেদের স্কন্ধে বহন করিয়া আমাদের ভারলাঘব ও শ্রমলাঘব করিবে।

"শ্বাস-প্রশ্বাস ত' অবাক্। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—এ ত' ব্যাপার মন্দ নয়! আসিলাম বরদান করিয়া ঋষিদের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করিতে, আর তারা কিনা চাহে আমাদিগকে বোঝা বহিবার কুলী করিতে। যাক্, সত্য রক্ষা করিতেই হইবে, এ জন্য ভারই বহিতে হউক বা যাই করিতে হউক, অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে শ্বাস-প্রশ্বাস বলিলেন,—'তথাস্তু'।

"তোমার, আমার এবং অপরাপর বহু বহু সাধকের সাধন-জীবন লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকেই দেখিতে পাইবে যে, সেই আদিম অনিচ্ছাটা এখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের রহিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘাড়ের বোঝা মাটিতে ফেলিয়া পলাইতে চাহে।

"শ্বাস-প্রশ্বাসের ঘাড়ে এই যে ইষ্টনামের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া, ইহারই নাম অজপা-সাধন। তোমার আর কষ্ট করিয়া

মালা জপিতে হইল না, কর জপিতে হইল না, যাহা করিবার শ্বাস-প্রশ্বাসই করিল, এই জন্যই ইহার নাম অজপা-সাধন। যে সাধনায় নিজে জপ করিতে হয় না, আপনা আপনি অফুরন্ত প্রবাহে নামজপ চলিতে থাকে, তাহাই অজপা-সাধন।"

হাওড়া

১০ই বৈশাখ, ১৩৩৪

দরিদ্রের সৎকার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি হাওড়া আসিয়াছেন। জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা দরিদ্র ব'লে কোনো সৎকার্য্যেই যোগ দিতে পারি না। আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার অর্থ নেই, বিত্ত নেই, সম্পদ নেই, তারও ত' প্রাণ ব'লে একটা জিনিষ আছে! এমন কি যার স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য নেই, সেও নিজের মনটা দিয়ে সৎকার্য্যের প্রতি আন্তরিক সহযোগ কত্তে পারে। তুমি হয়ত দারিদ্র্যবশতঃ বা স্বাস্থ্য-হেতু কোনও নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্যে কোনও আর্থিক দান বা শারীরিক শ্রম দিতে পার না, কিন্তু যদি তুমি মনের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারাও সেই কার্য্যের সমর্থন কর, তাহ'লে সেই কার্য্যের প্রকৃত উদ্যোগীদের যথেষ্ট সহায়তা করা হবে।

নিয়মিত ত্যাগের অভ্যাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যে ব্যক্তি কোনো প্রকারে পেটে-

ভাতে খেয়ে আছে, সে সপ্তাহে যদি একবেলা ক'রে উপবাস ক'রে দুই তিন আনা পয়সাও বাঁচাতে পারে, তাহ'লে মাসিক সে পুণ্য-কার্য্যে ও জনহিততে আট আনা বা বারো আনা দিতে পারে। প্রত্যেহ রান্নার চাল মাপবার পরে মাত্র এক মুষ্ঠি ক'রে তণ্ডুল যদি আলাদা ক'রে ধ'রে রেখে দাও, তাহ'লে একমাস পরে তা' চার জন লোকের একবেলার ক্ষুন্নি-বৃত্তির সাহায্য কত্তে পারে। হাট-বাজার কত্তে গিয়ে যে ভাংলা পয়সা ফেরৎ আসে, সপ্তাহে মাত্র একটা দিন, ধর জন্মবার কিম্বা দীক্ষার বার কিম্বা গুরুবার বৃহস্পতিতে যদি তার পরিণামের দিকে না তাকিয়ে কোনো দিন এক পয়সা বা কোনো দিন পনের আনা পুণ্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় কর, তাহ'লে দু বছর পরে দেখ্‌বে, এই ভাণ্ডার একটী বৃহৎ জনসেবায় সগৌরবে অংশ নিতে সমর্থ হচ্ছে। নিয়মিত ত্যাগের অভ্যাসের দ্বারা অল্পে অল্পে এ ভাবে বড় কাজ করা সম্ভব হবে।

সর্ব্বস্বের উপরে দাবী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো কোনো মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পাই, দীক্ষা দিবার কালেই শিষ্যদের উপরে নির্দ্দেশ দিয়ে দেন যে, আয়ের দশমাংশ পুণ্যকার্য্যের জন্য গুরুদেবের আশ্রমে প্রেরণ কত্তে হবে। সমগ্র সম্প্রদায়ের হিতের জন্য যেখানে অর্থের প্রয়োজন, সেখানে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাদের নিকট হ'তে নিয়মিত কর-গ্রহণের ন্যায় গুরুদেরও শিষ্যদের নিকট থেকে নিয়মিত অর্থ

গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়। শিখ-গুরুগণকে এরূপভাবে অর্থ-গ্রহণ কত্তে হয়েছে এবং গুরুরা গৃহী হওয়া সত্ত্বেও, অনেক গুরুরা দস্তুরমত জাকজমকপূর্ণ দরবার রক্ষা করা সত্ত্বেও সেই অর্থ শিখ-সমাজের সম্প্রসারণ, সংগঠন ও সশস্ত্রীকরণে ব্যয় করেছেন। কিন্তু তোমাদের উপরে আমার দাবী বা অধিকার তোমাদের আয়ের চতুর্থাংশ বা দশমাংশই নয়, তোমাদের সর্ব্বস্বের উপরে আমার দাবী এবং অধিকার। যে দরিদ্র, তারও সর্ব্বস্ব, যে ধনবান্, তারও সর্ব্বস্ব। আমার চিন্তা, আমার ভাব, আমার আদর্শ, আমার কর্ম্ম-ধারা-রূপে প্রবাহিত হবে আমার যে প্রিয় ভাবী সন্তানের ভিতর দিয়ে, তোমাদের সর্ব্বস্বের উপরে তাদেরও পূর্ণ দাবী, তাদেরও পূর্ণ অধিকার। আমি তোমাদের অল্প কিছু দান নিয়েই সন্তুষ্ট হব না, তারই জন্য আমি অযাচক। কিন্তু তোমাদের সর্ব্বস্বের উপরে আমার দাবী বা অধিকার আমি বুঝলেও তোমরা নিজেরা যদি তা' না বুঝ, তবে ত' দাবী বা এ অধিকার একটা মুখের কথা মাত্র থেকে যায়। তারই জন্য তোমাদের চিত্তকে শুদ্ধ এবং প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সৎ কার্য্যে অল্প অল্প ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস প্রত্যহ বা সপ্তাহে এক দিন অবশ্যই করণীয়।

কলিকাতা

১১ই বৈশাখ, ১৩৩৪

ভ্রূ-মধ্যে প্রণব-ধ্যান

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

ভ্রূ-মধ্যে অবিরাম ওঙ্কার-ধ্যান কর। বাহিরে অঙ্কিত রজত-শুভ্র ওঙ্কারের প্রতি দীর্ঘকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সেই ওঙ্কারকেই ভ্রূমধ্যে ধ্যান কত্তে চেষ্টা কর। আরও শত শত মূর্ত্তি বা রূপ তোমার চখের কোণে এসে উঁকি ঝুঁকি মার্তে চেষ্টা কত্তে পারে, কিন্তু তাদের প্রতি অনাসক্ত হও এবং বারংবার চেষ্টা ক'রে একমাত্র প্রণব-মন্ত্রকেই ধ্যান কর। প্রণব-মন্ত্রের সঙ্গে যে রূপ একেবারে অভিন্ন হ'য়ে এসে তোমার অনুভূতিতে সাড়া দেবেন না, সেই রূপের সাথে তোমার আশ্রয় বা প্রশ্রয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভ্রূমধ্যে মন স্থির করার উপায়

প্রশ্ন।—কিন্তু মনকে ভ্রূমধ্যে একনিষ্ঠ করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মানসিক উপায় হচ্ছে, মনটা দেহের ভিতরে যে অঙ্গে কিম্বা দেহের বাহিরে যেখানেই যাক্ না কেন, টেনে এনে তাকে ভ্রূমধ্য-সেবী করার নিয়ত অভ্যাস। শারীরিক উপায় হচ্ছে সরল মেরুদণ্ডে ব'সে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ কত্তে কত্তে অশ্বিনী বা যোনি-মুদ্রা দ্বারা * শরীরের নিম্নাংশ-গত সকল শক্তি ও চেতনাকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হচ্ছে ব'লে অনুভব করার চেষ্টা করা। এটা শারীরিক উপায় হ'লেও এর মধ্যে ধ্যানশীলতার প্রয়োজনটাও বড় কম নয়। ধ্যানের বলে, কল্পনার বলে, আরোপিত অনুভবের বলে

* "সংযম-সাধনা" চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নিম্নগামিনী শক্তি ও চেতনাকে ঊর্দ্ধগামিনী ব'লে উপলব্ধি কত্তে হবে। বস্তু-প্রভাব জাত উপায় হচ্ছে, উপাসনায় ব'সে সর্ব্বপ্রথমেই ভ্রূমধ্যে একটি শ্বেতচন্দনের বা কর্পূরমিশ্রিত চন্দনের এবং একান্ত অভাবপক্ষে শীতল জলের একটী বিন্দু নিজ অনামিকার সাহায্যে দিয়ে তৎপরে ভ্রূমধ্যে নিত্যমঙ্গল পরমেশ্বরের নিত্যাবস্থান ধ্যান করা।

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৩৪

সেবার সহজ অধিকার

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে তথাকথিত অন্ত্যজ জাতীয় কয়েকটি যুবক আসিয়াছেন। নানা কথার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা ছোট জাত ব'লে ঘৃণা পাচ্ছিস, তা দুর করার উপায় কি কখনো ভেবে দেখেছিস্? শুধু অনুযোগ দিলেই চল্‌বে না যে, বামুন-কায়েতেরা তোদের শ্রদ্ধা করে না, সম্মান করে না, সদ্ব্যবহার করে না। কেন করে না, তাও দেখতে হবে। করে না, তোরা অশিক্ষিত ব'লে, মূর্খ ব'লে, অজ্ঞান ব'লে। অবশ্য তারা যে তোদের ঘৃণা করে, এটা অন্যায়, কিন্তু এ ঘৃণা দূর করার উপায় যে বাবা তোদেরই হাতে রয়েছে। তোরা জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ ও মনুষ্যত্ব সঞ্চয় কর্। বড় জাতের লোকেরা তোদের উন্নতির জন্যে কিছু করুক আর না করুক, তোরা তোদের নিজেদের উন্নতি সাধনের

জন্য মরণ-ব্রত গ্রহণ কর্। জাত ভায়েদের মধ্যেই ত' তোদের সেবার সহজ অধিকার, আপনজনেই ত' আপনজনের কল্যাণ অনায়াসে কত্তে পারে। তবে তোরা বামুন, কায়েত, বৈদ্যদের মুখপানে কাঙ্গালের মত তাকিয়ে থাক্‌বি কেন? প্রতিজ্ঞা কর্ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে তোরা তোদের নিজ সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য কখনো ভুলে যাবি না। প্রতিজ্ঞা কর্, স্বজাতীয় একটী নরনারীও যতদিন মুর্খ থাক্‌বে, অজ্ঞান থাক্‌বে, অধার্ম্মিক থাক্‌বে, আলস্য-পরতন্ত্র থাক্‌বে, ততক্ষণ তোরা আত্মসুখের দিকে তাকাবি না। প্রতিজ্ঞা কর্, একটী পুরুষ যতক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল থাক্‌বে, একটী নারী যতক্ষণ অসতী থাক্‌বে, ততক্ষণ তোরা সমাজ-সেবা পরিত্যাগ করবি না। তোদের সমাজ পতিত সমাজ, কিন্তু এই পতিত সমাজই তোদের জন্মভূমি। প্রতিজ্ঞা কর্, রায়-বাহাদুর উপাধির লোভে নয়, ধন সম্পদে সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনা দেখে নয়, সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণের প্রলোভনে নয়, কোনও কারণেই তোরা এ পতিত সমাজের বুক, জন্মভূমির ক্রোড় ছেড়ে যাবি না।

মহাপ্রাণ কুমারকৃষ্ণ

অতঃপর মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আগমন করিলেন। কুমারবাবু প্রণতি করা মাত্রই শ্রীশ্রীবাবামণি সমাগত যুবকদিগকে বলিলেন,— এই দেখ, একজন স্বপ্নচারী পুরুষ, Who creates a universe

in ideas. (যিনি নিয়ত ভাব-সাগরে বিচরণ করেন।)

কুমারবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে একজন বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন, সৎকাজে তিনি দুই হাতে টাকা বিলাইয়াছেন। আইন ব্যবসায় ত্যাগের পর এখন আয় কমিয়াছে, ছেলেরা মাত্র মাসিক পাঁচশত টাকা পেন্সন দেন, ইহা হইতে নিজের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া তীর্থ-ধর্ম্ম ও দান-ধ্যান প্রভৃতি করিয়া থাকেন। বৈদ্যনাথধামের নিকটবর্ত্তী "কুশমা" নামক এক গ্রামে তিনি কয়েক শত বিঘাব্যাপী এখ বিশাল ভূখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রায় আশী-নব্বই হাজার টাকা খরচ করিয়া তাহাতে কূপ, তড়াগ, দালান ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্থানে একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার জীবনে একমাত্র কাম্য, সেই সম্পর্কেই শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে তিনি আগমন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে দুইবার তিনি নিজ খরচে শ্রীশ্রীবাবামণিবে কুশমা নিয়া গিয়াছিলেন এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। নানা কারণে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই।

কুমারবাবু বলিলেন,—স্বামীজী, আপনার অনুগ্রহের প্রতীক্ষায় আমি ব'সে আছি। আপনি হাত দিলে নিমেষের মধ্যে আশ্রম মাথা তুলে দাঁড়ায়। কত জনকে আমি আহ্বান করেছি, কিন্তু আপনার মত এমন স্বাবলম্বন-বলদৃপ্ত কেউ নয়। নিজের শক্তিকে, নিজের পুরুষকারকে এমন ক'রে আর কেউ বিশ্বাস করে না। চাঁদার ভরসা, দাতার ভরসা ক'রে তবে সবাই কাজে হাত দিতে চাচ্ছেন। আপনার ওটি নাই, আপনি দাতা বা চাঁদাকে গ্রাহ্য

করেন না। এই জন্যেই আপনার প্রতি আমার মনটা আরও আকৃষ্ট হয়।

আত্মশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে আত্ম-বলদৃপ্ত, একথাটা কিন্তু ঠিক নয় কুমারবাবু। আমার বলের পশ্চাতে আরও একজনের বল আছে। তাঁরই বলে আমি বলীয়ান্, তাঁরই পৌরুষে আমি পুরুষকার-প্রবুদ্ধ।

নিজ বলে করিব না বল,
সকল বলের উৎস
তুমিই কেবল।
সকল পুরুষকারে
ভাবি যেন বারে বারে
মোর সাধনার পিছে
তোমারি কৌশল।
সকল যতন মম
উষার শিশির সম
তোমারি আলোকে যেন
করে ঝলমল।

দান-সংগ্রহে অনিচ্ছা

কুমারবাবু বলিলেন,—অফুরন্ত বিস্ময় সহকারে আমি এক এক দিন ভাবি, কি সেই শক্তি, যার মহিমায় আপনি দান-

সংগ্রহের চেষ্টাকে এমন দৃঢ়ভাবে বর্জ্জন ক'রে চলেছেন। এখনো এদেশে ভিক্ষা চাইলে পাওয়া যায়, দান-সংগ্রহে নামলে এবং মানুষের পরে মানুষের কাছে বারংবার কেবলি চাইতে থাক্‌লে নিতান্ত কঞ্জুষ ব্যক্তিও কিছু না কিছু দান করেই। কিছু কাজ হয়েছে দেখাতে পারলে তারই কৃতিত্বের জোরে অনেক অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে উৎসাহবান্ দাতায় পরিণত করা যায়। নিজের কর্ম্মপন্থা এবং কার্য্য-তালিকার কিছু বিবরণ দিয়ে ভালো ভাবে প্রচার-কার্য্য চালাতে পারলে টাকার অভাবে সৎ-কার্য্য বন্ধ হ'য়ে থাকে না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত দাতা সবাই হতে পারে না কিন্তু ক্ষুদ্র দাতার অভাব এদেশে নেই। আপনার দান-সংগ্রহে অনিচ্ছা দেখে এক এক সময়ে মনে হয়, ইহা কি আমাদের সকলের প্রতি ধিক্কার? কিন্তু দান সংগ্রহ ছাড়া যে কাজ করাও অসম্ভব দেখ্‌ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন।

কুমার বাবু বলিয়া চলিলেন,—আপনাকে, পীযূষবাবুকে * এবং ক্যাপ্‌টেন পেটাভেলকে † নিয়ে যে পরিকল্পনা আমরা তৈরী কর্‌লুম, তার জন্য আমার এই আট শতাধিক বিঘা ভূমি, তৈরী দালান, বিরাট তালাও, বহু ফলকর বৃক্ষের চারা তৈরী হয়ে আছে। পীযূষবাবু প্রতিষ্ঠানে ছোট খাট একটী প্রেস দিয়ে

---

* অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক পীযূষ কান্তি ঘোষ।

† মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল।

দেবেন, আর অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্য-বর্ত্তিতায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা কর্‌বেন, যাতে সমগ্র ভারতের লোক জান্‌তে পারে যে, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টিকে পুনর্জ্জাগরিত করার জন্য একটা সত্যিকারের চেষ্টা এতদিনে সুরু হ'ল। আরও কত কত মনীষীকে আমি এই কাজে ডেকেছি। সবাই বলেন, এত টাকার একটী তোড়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দাও, তবে আমরা কাজে হাত দিতে পারি। কেবল একটী লোকই সে কথা বলেন নি। সে হচ্ছেন আপনি। প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্বের জন্য লোকের কাছে টাকা চাইব, তাতে আপনার আপত্তি কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনা আপনি দান আসে, অতি উত্তম কথা। দান না আসে, পরম দুঃখ ও দারুণ ক্লেশের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠান চলাব। তাতে চিত্তশুদ্ধি হবে। দান-সংগ্রহের জন্য চিন্তা, চেষ্টা এবং শক্তি ক্ষয় করার যে আমার সাধ্য নেই কুমারবাবু। স্বাভাব-বিরুদ্ধ কাজ কি ভাবে করি?

প্রণাম করিয়া কুমার বাবু প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতা

১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৪

ব্রহ্মচারী প্রভঞ্জন

অদ্য আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারী প্রভঞ্জন (শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মজুমদার) চাঁদপুর হইতে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানার মর্ম্ম আমরা নিম্নে সন্নিবিষ্ট

করিলাম। এই গ্রন্থ যখন মুদ্রিত হইতেছে, তখন ভ্রাতা প্রভঞ্জন পার্থিব সংসারের মায়া ছাড়িয়া অমৃতলোকে বাস করিতেছেন। তাই, আমরা তাঁহার জীবনের নিগূঢ় কাহিনী সম্বলিত পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম। অন্তরে অন্তরে তিনি সদ্‌গুরুতে যেই সর্ব্বস্ব-সমর্পণের ব্রতকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শত বিঘ্নেও সেই ব্রত হইতে স্খলিত হন নাই। তপঃ-সাধনার চিরকণ্টকময় পথে বিচরণ করিয়া তিনি অমরার অমৃত আহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ভয়-ভাবনাকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই। তপস্যার বীর্য্যে জীবনকে বজ্রদৃঢ় অনমনীয় করিয়া তুলিবার জন্য চাঁদপুরের শ্মশানে বসিয়া তিনি তাঁর পরমসখা শ্রীগুরু-সাহচর্য্যে অন্ধ নিশীথিনীর চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া পরপারের জ্যোতির্ম্ময় জগৎ আলোড়িত করিয়াছিলেন, সাধনে-অক্ষম দুর্ব্বলের মত শ্রম-স্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হইতেছে, তার বহু পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন,—তাঁর চির-সাধনার ক্ষেত্র, তাঁর সদ্‌গুরু-সংগমের নিভৃত নিবাস, তাঁর নীরব তপস্যার মহাপীঠস্থান, সেই চাঁদপুরের মহা-শ্মশানেই তাঁহার নরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। জীবৎ কালে যিনি বহুশত ওলাউঠা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছেন, সেই ওলাউঠাই তাঁহার দেহাবসানের উপলক্ষ্য হইয়াছে। অভিক্ষার পৌরুষময়ী শক্তিতে আর কেহ যখন বিশ্বাস করেন নাই, তিনি তখন তাহা করিয়াছিলেন, অভিক্ষাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আর কেহ যখন আসেন নাই, তিনি তখন মাথা পাতিয়া সকল কৃচ্ছ্র বহন

করিয়াছিলেন। লোকদৃষ্টির অগোচরে তিনি তাঁর মহীয়ান্ জীবন গড়িতেছিলেন, অগোচরেই তিনি পরার্থে আত্মদান করিতে করিতে অকালে চলিয়া গেলেন,—বুঝি যোগ্যতর নব কলেবর ধারণ করিয়া ধ্বংসোন্মুখ জাতির জন্য নব-জীবনের অমৃত-রসায়ন লইয়া পুনরাবির্ভূত হইবার জন্য। তিনি জীবিত থাকিলে যে বিষয় আমরা প্রকাশ করিতাম না, তাঁর চরিত্রের একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের দিক্ উন্মুক্ত হইবে বলিয়া আমরা তাহাই এস্থলে প্রাকশ করিলাম। যদি কেহ সংশয়ি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট পাঠক থাকেন, তবে তাঁহাদের নিকটে নিবেদন, তাঁহারা যদি অলৌকিক রহস্যে আস্থাবান হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কয়কটী পৃষ্ঠা বাদ দিয়াই গ্রন্থখানা পাঠ করিবেন।

গুরুনিষ্ঠার শক্তি

প্রভঞ্জন লিখিয়াছেন,—ইন্দ্রিয়-সংযমে তিনি যতই দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছেন, ততই নূতন নূতন প্রলোভন আসিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহা অপ্রতুল বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটেই ধ—বাবুর বাসা। এই বাসাতে প্রভঞ্জন কখনো কখনো যাতায়াত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি যৌবন-সুলভ সম্ভ্রম-হেতু যাতায়াত কমাইয়াছেন। কিন্তু ধ—বাবুর স্ত্রী মাঝে মাঝে পত্র লেখাইবার জন্য প্রভঞ্জনকে চাকর দ্বারা ডাকান, প্রভঞ্জন যাইয়া প্রয়োজনীয় পত্রগুলি লিখিয়া দিয়া আসেন। প্রথম প্রথম পত্রগুলি সাংসারিক

সুখ-দুঃখ, বৈষয়িক বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধেই লেখান হইত, কিন্তু ধীরে ধীরে পত্রগুলির লিখা বিষয় যেন একটু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ছোট বোন বা বউদি'র নিকট পত্র লিখিতেও তার মধ্যে একটা প্রণয়ের তরঙ্গ, একটা বিরহের উচ্ছ্বাস আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভঞ্জন এই কথাগুলি লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেও লজ্জাবশতঃ প্রতিবাদও করিতেন না। ধ—বাবুর স্ত্রী বয়সে প্রায় যৌবনাতিক্রান্তা হইলেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও দৈহিক লাবণ্যে পরমা রূপসী।

সৌন্দর্য্যের একটা চিত্তাকর্ষণী শক্তি আছে। প্রভঞ্জন এই আকর্ষণ অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। ধ—পত্নীর প্রতি এই আকর্ষণ শুধু সৌন্দর্য্যেরই আকর্ষণ, না, প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা,—তাহা প্রভঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ধ-পত্নী ক্রমশঃ যেন কথায়, আচরণে ও ঘনিষ্ঠতা-সম্পাদনে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু একটু করিয়া অসম্বৃতা ও চপলা হইতে লাগিলেন। প্রভঞ্জনের চিত্ত বিকারগ্রস্ত হইল, কিন্তু মনের অসংযমকে প্রাণপণে সদ্গুরুস্মরণের দ্বারা বশীকৃত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন রমণী লজ্জা-সরমে ডালি দিয়া প্রভঞ্জনকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভঞ্জনের বুক দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণে "জয়গুরু—জয়গুরু" উচ্চারণ করিতে করিতে সবলে রমণীর বাহুপাশ ছাড়াইয়া পলায়ণ করিলেন। দুই-তিনদিন পর্য্যন্ত কেমন একটা ঘৃণা, কেমন একটা বিদ্বেষ

এবং একটা বিভীষিকা প্রভঞ্জনের অন্তরটা ঘিরিয়া রহিল। কিন্তু কতিপয় দিবস-মধ্যে এই বিভীষিকা দূরীভূত হইয়া গেল, আস্তে আস্তে রমণীর দেহস্পর্শের কথা অন্তরের মধ্যে একটু সকাম-ভাবে জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিল। সেই বাহু-যুগলের ব্যাকুল আবেষ্টন, সেই পয়োধরযুগলের কোমল স্পর্শ,—আস্তে আস্তে এই চিন্তাই যেন প্রবলতর আকার ধারণ করিল। শেষে এমন হইল যে, কামের তাড়নায় প্রভঞ্জন অধীর হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় যাইয়া রমণীর নিকট উপনীত হইলেন। রমণী বিন্দুমাত্র বাধা দিলেন না, প্রভঞ্জন তাহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া অধীর আবেগে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেহে মনে কেমন এক আশ্চর্য্য অনুভূতি, কেমন এক স্নিগ্ধ সরস স্পর্শের অনির্ব্বচনীয় সুখাবেশ উপলব্ধ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রভঞ্জন দেখিলেন,—রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে, বাহুপাশে আবদ্ধ শ্রীমদ্‌গুরুদেব স্মিতহাস্যে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত দীর্ঘকেশ মৃদু মলয়ে একটু একটু নড়িতেছে, তাঁর মুখমণ্ডলীবিশোভী গুম্ফ-শ্মশ্রু দিব্য শোভা বিতরণ করিতেছে। বিস্মিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত প্রভঞ্জন গুরুপাদপদ্মে কাঁদিয়া পড়িলেন। চিত্তাবেগ প্রশমিত হইলে দেখিলেন, গুরুদেব নাই,—রমণী কক্ষান্তরে গমন করিতেছেন।

সেই দিনই প্রভঞ্জন চ'খের জলে বুক ভাসাইয়া গুরুদেবের

নিকটে এক পত্র লিখিলেন, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন, জানা ছিল না বলিয়া হয়ত বা পত্র তাঁহার হাতে পৌঁছেই নাই। এই পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

কতিপয় দিবস বেশ গেল। যে রমণীর প্রতিই চক্ষু পড়ে, অমনি তাহার মুখমণ্ডলে শ্রীগুরুদেবের মুখমণ্ডল যেন ফুটিয়া উঠে, কামভাব কাছে ঘেঁষিতেও পারে না। চিত্তে অহঙ্কার জন্মিল। প্রভঞ্জন কয়েক জন বন্ধুর নিকটে তাঁর এই দৃষ্টি-শৌর্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন। বন্ধুরা কেহ এই কাহিনী বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। ক্রমশঃ রসনার রশ্মি একটু একটু করিয়া শিথিল হইতে লাগিল, দু-একজন বন্ধুকে প্রভঞ্জন শ—বাবুর স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারটা একটু-আধটু বলিলেন। কেহ বিশ্বাসের ভাণ করিল, কেহ বা প্রভঞ্জনের চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া কুৎসা রটনায় আত্মনিয়োগ করিল। অবশ্য, কুৎসা বা প্রশংসায় কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই বলাবলির পর হইতেই প্রভঞ্জন নিজের ভিতরে সেই সংযমপূত শুদ্ধাভাবটাকে যেন একটু দুর্ব্বল বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভঞ্জনের বলক্ষয় ঘটিল।

আবাস-স্থান হইতে স্নান করিতে তাঁহাকে নদীতে যাইতে হয়, কারণ নিকটে ভাল পুকুর নাই, অথচ ডাকাতিয়া নদীও দূরে নহে। নদীতে যাইবার পথেই গণিকা-পল্লী পড়ে, দুই পাশে বারবনিতাদের গৃহ, মাঝখান দিয়াই পথ। প্রতিদিন এই পথেই প্রভঞ্জন স্নানার্থে যান, এই পথেই ফিরিয়া আসেন, একদিনও

একটী রমণীর মুখপানে তিনি তাকাইয়া দেখেন নাই। কিন্তু এখন যেন তাঁর চিত্তে কি এক দুর্ব্বলতা আসিয়াছে, মাঝে মাঝে তাঁর চক্ষু উহাদের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়, প্রভঞ্জন জোর করিয়া চক্ষুকে ফিরাইয়া নিয়া আসেন। কিন্তু একদিন সতের-আঠারো বৎসর বয়ঃস্থা একটী গণিকাপল্লী-বাসিনী যুবতীর উপর প্রভঞ্জনের চক্ষু পড়িল, তাঁর মন কেমনতর হইয়া গেল। আস্তে আস্তে তাঁর চিত্তে লালসা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল, একদিন তিনি গণিকা-পল্লীতে যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রয়োজনীয় অর্থও তিনি সংগ্রহ করিলেন।

রাত্রি হইলে প্রভঞ্জন গণিকা-পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। বাঞ্ছিতা রমণীর কুটীর-দ্বারে আসিতেই দেখিলেন,—অপর কে একজন রমণীর নিকটে বসিয়া আছে। প্রথমে একটু ভয়ের মত হইল, কিন্তু ভাবিলেন, ওখানেও ত' আমারই মত একটা লম্পট বসিয়া আছে, এক চোরকে অপর চোরের ভয় কি? এই ভাবিয়া আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলেন,—শ্রীমদ্‌গুরুদেব গণিকার শয্যোপরি উপবিষ্ট, প্রভঞ্জনের বাঞ্ছিত রমণী গুরুদেবের পার্শ্বদেশেই উপবিষ্টা, তার করযুগ গুরদেবের কোলের উপরে গুরুদেবের হস্তদ্বারা বিধৃত। প্রভঞ্জন অতিমাত্র বিষ্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবি-লেন,—জন্মাবধি যাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, তাঁরও রুচি পড়িল বারবনিতায়? যাক্, তাঁহাকে আর লজ্জা দিবার প্রয়োজন নাই, যার উপরে তাঁর দৃষ্টি পড়িয়াছে, তার উপরে আমারও লোভ রাখা উচিত হইবে না। এই ভাবিয়া প্রভঞ্জন গণিকা-পল্লী ছাড়িয়া রাস্তায় দাঁড়াইতেই

দেখিতে পাইলেন, গুরুদেব তাঁর আগেই আসিয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এবার প্রভঞ্জনের আর বিষ্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার সর্ব্বশরীর এক অব্যক্ত অনুভূতিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

গুরুদেব হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। প্রভঞ্জন তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তা দিয়া আস্তে আস্তে তাঁহারা আসাম-বেঙ্গল রেলপথে পড়িলেন এবং পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে বসিয়া গুরুদেব প্রভঞ্জনকে লইয়া কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, যেখানে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে উভয়ে মিলিয়া কত বিনিদ্র-রজনী কাটিয়া গিয়াছে, সেই দুই নম্বর পোলের নিকটে আসিয়া গুরুদেব বাঁধানো শানের উপর উপবেশন করিলেন এবং প্রভঞ্জনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রভঞ্জন বসিলেন, গুরুদেব টানিয়া তাঁহাকে একেবারে নিজের পাশখানে বসাইলেন এবং গণিকাগৃহে বারবনিতাকে যেভাবে এক হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অপর হাতে নিজ ক্রোড়োপরি তার করযুগল ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। প্রভঞ্জনের মনে হইতে লাগিল, তাঁর যেন সমগ্র দেহে একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে, দেহের পুরুষ-চিহ্নসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন স্ত্রী-চিহ্নসমূহের উদগম হইয়াছে, নিজের চক্ষু, নিজের কর্ণ, নিজের নাসিকা, নিজের হস্ত, পদ, বক্ষ, উদর, সব যেন নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে এবং বাঞ্ছিত-রমণীর অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি যেন এখানে আসিয়া বসিয়াছে। এইভাবে কতক্ষণ অতীত হইল,

প্রভঞ্জন তাহা বুঝিতেও পারিলেন না, কিন্তু সহসা যখন তাঁহার দৃষ্টি পূর্ব্বাকাশে পতিত হইল, তিনি দেখিলেন গগনমণ্ডল রক্তাভায় শোভিত করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন এবং গুরুদেব নাই।

আবেগপূর্ণ ভাষায় এই কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রভঞ্জন শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—এই সব ব্যাপার কি? সত্যই কি গুরুদেব গিয়াছিলেন, না, ইহা মনেরই কল্পনা? ইহা কি কোনও সত্যানুভূতি, না, মস্তিষ্কের কোন রোগ?

আমারা পত্রখানার বহু ব্যক্তিগত অংশ বাদ দিয়া বহুস্থানের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত বা বর্জ্জন করিয়া এবং বহু স্থানের ভাষা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া অতি সাবধানে এই পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলাম।

পত্রখানা পাইয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি ইহার উত্তর লিখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা ডাকে দিলেন। পত্রোত্তরে লিখিলেন,—

"প্রাণাধিক প্রভঞ্জন, তোমার সৌভাগ্যদর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। এগুলি মস্তিষ্কের রোগ নহে, যদিও সাধারণ লোক অন্য কিছু বলিয়া মনে করিতে হয়ত পারিবে না।' একটা স্থানে সমগ্র নিষ্ঠাকে সমর্পণ করিতে পারিলে, সাধকের মধ্যে যে অমানুষিকী দৈবশক্তি অজ্ঞাতসারেই জাগ্রত হয়, ইহা তাহারই অনির্ব্বচনীয় লীলা।

"পরমাত্মারূপী সর্ব্বনিয়ন্তা গুরু তোমাকে জীবনের প্রত্যেকটী পদবিক্ষেপে রক্ষা করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে তোমাকে দেখাইয়া

দিতেছেন যে, গুরু সীমাবদ্ধ নহেন, সর্ব্বময়; অতএব জগতের যে বস্তুতেই আসক্ত হও না কেন, তুমি তোমার গুরুদেবেরই সান্নিধ্য উহা দ্বারা লাভ করিতেছ। প্রথমোক্ত ঘটনা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, তোমার বাঞ্ছিতা আর তোমার গুরুদেব এক ও অভিন্ন। সুতরাং কদর্য্য লালসার স্থান এখানে থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়োক্ত ঘটনা তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে যে, তুমি এবং তোমার বাঞ্ছিতা এক ও অভিন্ন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বাসনা-প্রবাহের বিদ্যমানতার অধিকার নাই, কারণ দূরান্তরের বস্তুদ্বয়ের মধ্যেই আকর্ষণ থাকে, অভিন্ন বস্তুতে থাকে না। অতঃপর তোমার আর একটি অনুভূতি লাভ করিবার বাকী রহিল। তাহা হইতেছে, তোমাতেও তোমার গুরুতে অভেদ-দর্শন। এইটুকু হইলেই ইন্দ্রিয়জয়ের সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমিতে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

"যৌগিক পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সিদ্ধদেহী যোগীরা সূক্ষ্মদেহে যাইয়া দূরদূরান্তরেও শিষ্যকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। ইহা সত্য কথা,—কবি কল্পনা নহে। কিন্তু আমি, একজন সাধারণ মানুষ, যোগৈশ্বর্য্য, বা অলৌকিক শক্তি আমার কিছুই নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পরমগুরু তোমাকে সত্যপথে স্থিতধী রাখিবার জন্য তোমার চিত্তের অনুকূল-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ছিলেন। লৌকিক গুরুর মধ্যে সামর্থ্যের ন্যূনতা থাকিলেও একান্ত গুরুনিষ্ঠ শিষ্যের জন্য পরমগুরু পরমাত্মা এই অদ্ভুত অলৌকিক খেলা করিয়া থাকেন।

তুমি ভগবানের নামে অধিকতর নিষ্ঠবান্ হইয়া অধিকতর শ্রদ্ধা, উৎফুল্লতা ও বীর্য্য-সহকারে সাধন করিতে থাক, অমৃতত্ব তোমারই করায়ত্ত হইবে।

"পরিশেষে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সতর্কতা এই যে, এই সব দিব্য অনুভূতির কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিও না, কারণ তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শক্তিহ্রাস ঘটে।"

শ্রীযুক্ত প্রভঞ্জনের পত্র পাইবার পর হইতে দুইদিন শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী হইয়া রহিলেন।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪

শেষরাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি স্তূপীকৃত পত্রের জবাব দিতেছেন। অধিকাংশ পত্রই নানাস্থানবর্ত্তী ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষণলিপ্সু যুবকের লেখা।

ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ; ভগবৎসেবার সহিত জীব-সেবার যোগ

শ্রীহট্টের ফান্দাউক-মুরাকরি হইতে লিখিত একখানা পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

"বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মচারীকে মনে রাখিতে হইবে যে, একদিকে যেমন সে ভগবানের সহিত নিয়ত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবে, অপর দিকে আবার তেমনি ভগবানের সৃষ্টি জীব-জগতের সঙ্গেও সেব্য-সেবক সম্বন্ধ অটুট ভাবে বজায় রাখিতে হইবে। সেই যুগ চলিয়া গিয়াছে, যেই যুগে ভগবানকে পূজিতে যাইয়া পূজক

ভগবানের জীবকে ভুলিয়া থাকিত। তোমার ব্রহ্মচর্য্য তোমাকে যেমন ভগবানের সহিত যুক্ত করিবে, তেমন সঙ্গে সঙ্গে দুঃখার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, অভাবক্লিষ্ট, অত্যাচারিত, অবমান-পীড়িত অনন্তকোটি দুর্ভাগ্যদগ্ধ জীবের সহিতও অচ্ছেদ্য প্রীতির পাশে আবদ্ধ করিবে।—আমার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের আদর্শ ইহাই।"

যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারক-প্রতিষ্ঠান

ঐ পত্রেরই শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-কার্য্যে এমন একটী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন, যাহার প্রত্যেকটি কর্ম্মী নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যাহাদের তপঃসাধনায় ফাঁকী নাই, ভাবের ঘরে চুরী নাই, ভিতরের সম্পদের চাইতে বাহিরের জৌলস অধিক নহে, এমন সব খাঁটি কর্ম্মী লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। বাহ্য আড়ম্বরের চাইতে যাহারা অন্তরের সাধনাকে অধিকতর কর্ম্মসহায়ক মনে করে, বাহিরের চটকের চাইতে ভিতরের সঞ্চয়কে যাহারা গরীয়ান্ বলিয়া বিশ্বাস করে, এমন অন্তর্মুখদৃষ্টি কর্ম্মী লইয়াই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। নতুবা সে তাহার আপন ব্যর্থতার বীজ সযত্নে আপনার মধ্যেই লুক্কায়িত রাখিবে, সন্দেহ নাই।"

গণিকার ঈশ্বর-সাধনা

কলিকাতার জনৈক অপরিচিতা পত্রলেখিকা শ্রীশ্রীবাবামণির

নিকটে কতগুলি প্রশ্ন করিয়া এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

মা, তোমার বহু-প্রশ্ন-সম্বলিত পত্রখানা পাইয়াছি। তুমি কে, এই জাতীয় প্রশ্ন করিবারই বা উদ্দেশ্য কি, তাহা কিছুই আমি জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য যাহা যাহা বলিতে হয়, সবই আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব। মায়ের কাছে ছেলে পত্র লিখিতেছে, অথচ কুটিল সংসারের এমন অনেক জটিল কথা আছে, যাহা ছেলে আর মায়ে বসিয়া আলোচনা করে না। কিন্তু এস্থলে আমি ছেলে হইলেও জিজ্ঞাসিত এবং তুমি মা হইলেও জিজ্ঞাসু। সুতরাং আমার সরলতায় কিন্তু মা আঘাতের কারণ ঘটিলেও আহত হইও না, এইটী আমার অনুরোধ।

প্রকৃতই গণিকাবৃত্তি কামারের ব্যবসায়, কুমারের ব্যবসায়, কাপড়ের ব্যবসায়, তৈল-নুন-ঘিয়ের ব্যবসায় প্রভৃতিরই ন্যায় একটা ব্যবসায়। অন্যান্য ব্যবসায় করিবার যেমন ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন আছে, গণিকাবৃত্তি পরিচালনার প্রয়োজনও এক শ্রেণীর নারীর আছে। সেই প্রয়োজন, অর্থোপার্জ্জন,—জীবিকা সংস্থানের জন্য, প্রার্থনীয় বস্তুজাত সংগ্রহের দ্বারা তৃপ্তি লাভের জন্য এবং দানাদি দ্বারা পুণ্য ও আত্মপ্রসাদ প্রাপণের জন্য। কিন্তু কোনও ব্যবসায় করিতে হইলে খরিদ্দারের প্রয়োজনের দিক্‌ও চাহিতে হয়। খরিদ্দার যাহা চাহে, ব্যবসায়ীকেও তাহা দিতে হয়। এই দিক্ হইতেও গণিকাবৃত্তি একটা মস্ত ব্যবসায় সন্দেহ নাই।

কারণ, এক শ্রেণীর পুরুষ দৈহিক-সুখ-লালসার প্রণোদনায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু দান না করিলে, এই বিষয়ে যাহারা ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুকা নহেন, তাঁহাদের কাছ হইতে জোর করিয়া তাহা আদায় করিবার চেষ্টা হইবে। তাহাতে সমাজ-নামধেয় শৃঙ্খলার ধ্বংস হইবে, বহুজনের শান্তি-ভঙ্গ ঘটিবে।—ফলে যে প্রয়োজন-বোধের তাড়নায় পুরুষেরা গণিকাদের সংসর্গে যাইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষজাতির অন্তর হইতে সেই প্রায়োজন-বোধ বিদূরিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জগতে গণিকাবৃত্তি থাকিবেই এবং স্বেচ্ছায় কেহ গণিকার ব্যবসায় খুলিতে না চাহিলে, যে পুরুষদের গণিকা দিয়া প্রয়োজন, তাহারা নানাভাবে একশ্রেণীর নারীকে দিয়া এই ব্যবসায় অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিবেই।

কিন্তু তাহা দ্বারা বুঝায় না যে, চিরকালই গণিকারা কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী হইতেই আসিবেন। যে শ্রেণী হইতে সাধারণতঃ অধিকাংশ গণিকা আসিয়া থাকেন, সমাজে উদারতা এবং সমাজ-জঠরে জারকশক্তি বর্দ্ধিত হইলে, সেই জন্মজাতা গণিকার শ্রেণীমধ্য হইতেই অনেকে গণিকাবৃত্তি পরিহার করিয়া অন্যতর বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। আবার, গণিকাবৃত্তির প্রতি বর্ত্তমান মানবের যে পুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত একটা সহজাত ঘৃণার ভাব রহিয়াছে, কোনও কারণে সর্ব্বজনীন-ভাবে তাহা মন্দীভূত হইলে অনেক তথাকথিত কুললক্ষ্মী, হয় রিরংসার তাড়নায় নতুবা স্বাধীনতার কামনায়, গণিকাদের সংখ্যাপুষ্টি করিবেন। কিন্তু

সভ্যতার ও সমাজের বিবর্ত্তন যতই অগ্রসর হউক, বারবনিতার ব্যবসায় যে জগতে কখনো খুব উচ্চ সম্মান লাভ করিবে, এইরূপ সম্ভব বলিয়া মনে করি না। কারণ, সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ে নারীমাত্রেই অনাবৃতা ছিলেন এবং সমাজ-সংস্থিতির প্রয়োজন বুঝিয়াই ইঁহাদিগকে আবৃতা করা হইয়াছে।

কিন্তু আজ কিম্বা ভবিষ্যতে এই ব্যবসায়কে যতই জঘন্য বলিয়া বিবেচনা করা হউক, জীব-মাত্রেরই যখন ঈশ্বর-সাধনার অধিকার আছে, তখন আমার গণিকা-মায়েদেরও তাহা আছে, এই কথা আমি বজ্রকণ্ঠে স্বীকার করিব। শাস্ত্র, সন্ত এবং পরমেশ্বর,—এই তিনের উপরে সর্ব্বজীবের সমান অধিকার, সমান দাবী। শাস্ত্র যদি দুর্ব্বোধ্যতাহেতু কাহারও অধিকারের বাহিরে যায়, তবু ঈশ্বর কখনো কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। সাধু-মহাপুরুষেরা যদি কাহারও সন্নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতে সুবিধা না পান, তবু পরমেশ্বর কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকেন না। তিনি ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, মান্য-জঘন্য, পূজ্য-ঘৃণার্হ সকলেরই জন্য, সকলেরই আপন, সকলেরই সামগ্রী। অতএব গণিকারাও ঈশ্বরের নামজপে অধিকারিণী, ঈশ্বর-সাধনায় অধিকারিণী, ঈশ্বর-সেবায় অধিকারিণী। প্রয়োজন অনুভব করিলে, তাঁহারাও শাস্ত্রীয় সাধন-দীক্ষা পাইবার অধিকারিণী।

অবশ্য, উচ্চবংশীয় কিম্বা বহুজনমান্য গুরুরা ইহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করেন না, এ কথা সত্য। কিন্তু বহু-রমণী-সংসর্গী লম্পট পুরুষকে দীক্ষা প্রদান করিলে যাঁহাদের আভিজাত্যে

আঘাত পড়ে না কিম্বা লোকদৃষ্টিতে যাঁহারা হেয় বলিয়া বিবেচিত হন না, গণিকাকে সাধনদীক্ষা প্রদান করিলেই কেন যে তাঁহাদের অভ্রচুম্বী আভিজাত্য ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে এবং হিমগিরি-স্পর্দ্ধী লোক-সম্মান খর্ব্ব হইয়া পড়িবে, তাহা আমি বুঝি না। তবে ইহাও ধ্রুব-সত্য যে, সিদ্ধ যোগাচার্য্যেরা ছোট-বড়'র পার্থক্য, মান্যঘৃণ্যের পার্থক্য কোনও কালেই স্বীকার করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। সিদ্ধগুরুরা লোকত্রাণার্থে যাকে তাকে কোল পাতিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অভয়-চরণের এক কোণে পাপী ও পুন্যবান, প্রবুদ্ধ ও পতিত, সকলেই একটুখানি আশ্রয় পাইয়াছে। যিনি সর্ব্বত্যাগী, তিনি পার্থক্য-বিচারও ত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহা সুনিশ্চিত।

রূপোপজীবিনী মায়েদের ভিতরে এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেহকে দেহের ধর্ম্মে নিয়োজিত রাখিয়াও সমগ্র অন্তর দিয়া পরমাত্মপরায়ণা। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞা গণিকা যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা যে খুবই অল্প হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ সুদুর্ল্লভা বারাঙ্গনার সংস্পর্শে আসিলে জগতের অনেক দুঃসংশোধনীয় মহাপাতকীরও চিত্ত-পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এবং পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সামান্য সাধনার ফলে কোনও বারাঙ্গনা এই অত্যুচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া ফেলিতে পারেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

কঠোর তপস্যার ফলেই ইহা সম্ভব এবং জগতে কেহ

কেহ নিশ্চয়ই এইরূপ করিয়াছেনও, সন্দেহ নাই। ঐশ্বরিকী সাধনার বলে ভবিষ্যতে বহু গণিকা যে এইরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবেন, ইহা সত্য বলিয়া আমি মনে করি।

যদিও এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি মানসিক বিচার দ্বারা অনুভব করিতে পারি যে, এইরূপ বহু গণিকা আছেন বা থাকিতে পারেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই অভ্যাগতের মনোরঞ্জন করেন, কিন্তু দৈহিক জঘন্যতায় অবতরণ করেন না। কিন্তু ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইবে না যে, তাঁহারা ব্রহ্মদর্শিণী বা ব্রহ্ম-সমাহিতা। পরামাত্ম-পরায়ণতার প্রধান লক্ষণই হইল, নিজ সংসর্গের ফলে অপরকে পরমাত্মার দিকে টানিয়া আনা। এমন কি মৌখিক কোনও উপদেশও প্রয়োজন হয় না। যিনি ব্রহ্মপরায়ণা, যাঁর চিত্ত পরমেশ্বরে সমাহিত, ভোগবাসনার পঙ্কিল-তরঙ্গ যাঁর অন্তরের তট-ভূমিকে আকুলিত করে না, তাঁর সংসর্গের ভিতরেই এমন এক জীবনীয় অমৃত-রসায়ন লুক্কায়িত থাকে, যাহা নয়ন-গ্রাহ্য না হইলেও অন্তরে বাহিরে একটা শুচিতা, একটা শুদ্ধতা, একটা অনাবিল পবিত্রতা সৃষ্টি করিয়া দেয়। বন্ধুর মত বৈঠকে বসিয়া হাসি-গল্প করিলাম, দেহ-দান করিলাম না, ইহাই ব্রহ্মজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পরম বন্ধুর মত প্রত্যেক অভ্যাগতের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়নিচয় পরমাত্মার পানে টানিয়া আনিলাম, আঁখির দৃষ্টিতে পরমাত্মার শক্তি চিত্তে

চিত্তে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলাম, আমার সঙ্গের ফলে, আমার হাসির ছটায়, আমার রহস্যামোদের লহরীতে হৃতসর্ব্বস্ব লম্পট জীবনের সকল হারানো রতন ফিরিয়া পাইল, আত্মবিধ্বংসী জঞ্জাল হইতে নিজেকে বিমুখ করিয়া লইল, ইহ-পর-জীবনের চরম চরিতার্থতার দিকে অবারিত গতিতে কেশরি-পরাক্রমে ছুটিয়া চলিল,—তবে বলা চলিবে ব্রহ্মজ্ঞ। জননি, আমার এ কথায় তুমি কিছু মনে করিও না যে, আমরা সাধন না করিয়া শাস্ত্রপাঠ করি বলিয়াই শাস্ত্রোক্ত খুব উচ্চ উচ্চ অবস্থাগুলিকে তুচ্ছ তুচ্ছ অবস্থার সঙ্গে তুলিতে করিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের দ্বারাই নিজেরা প্রবঞ্চিত হই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভগবানের নাম অপরিসীম শক্তির আকর এবং অফুরন্ত মধুর উৎস। এই নামে যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে, সে সকল শক্তি লাভ করে, সকল মধু আস্বাদন করে। নামের পীযূষ প্রবাহে যে মনকে ভাসাইয়া দিয়াছে, সে গণিকা হইলেও আমার ন্যায় শত কোটি সন্তানের মাতৃস্থানীয়া, পূজনীয়া এবং সম্মাননীয়া। ভগবানের নামের অমৃত-সাগরে যে ডুব দিয়াছে, সে অমর হইয়াছে, আমার ন্যায় লক্ষ কোটি মর-জীবের সে চির-বন্দনীয় এবং চির-নমস্য পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। অকুণ্ঠিত কণ্ঠে আমি তাঁর নামে জয়োচ্চারণ করি।

পরমাত্মা তোমার কুশল করুন। ইতি—

তোমারই অন্যতম সন্তান,

স্বরূপানন্দ

নাম-জপে রোগারোগ্য

দিনাজপুর জেলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরমেশ্বরের নামে রোগারোগ্য হয়, ইহা আমাদের দেশের এক দৃঢ়মূল সংস্কার। এই সংস্কারকে আধুনিক ত' বলা চলেই না, এমন কি ভারতীয় জীবনে ধর্ম্ম-সাধনার উন্মেষ-মুহূর্ত্ত হইতেই এই সংস্কার আমাদের রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। বৈদিক মন্ত্রাদিতে দীর্ঘায়ু ও আরোগ্যের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং পৌরাণিক বা তান্ত্রিক যুগেও রোগ-নিরাময়ার্থে যজ্ঞ, হোম, ব্রত, উপবাস, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি যথেষ্টই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের নামে রোগারোগ্য ব্যাপারটা আধুনিক বা আমাদের সমসাময়িক কাহারও প্রবর্ত্তিত, এইরূপ মনে করিতে বলা ভুল হইবে। সত্য বটে, রুগ্ন ব্যক্তিদের চিত্তোদ্বেগের সুযোগ লইয়া কোথাও কোথাও কেহ কেহ গুরুগিরিরূপ একটা ব্যবসায় পাতিবার ফিকির করিয়া লইতেছেন, তথাপি একথা সত্য নহে যে, রোগ সারাইবার জন্য ঈশ্বরের নাম-স্মরণ এই আমরা প্রথম করিতেছি।

"আর, বাস্তবিক ভগবানের নাম শ্রদ্ধাপূত চিত্তে নিয়মিত প্রযত্নে করিতে থাকিলে নিতান্ত দুরারোগ্য রোগও প্রশমিত হয়, ইহা সত্য কথা। শত শত ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা ইহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। নাক করিতে করিতে রোগীর মনে আশার একটা আলোক যেন জ্বলিয়া উঠে। এই আলোকের সম্পাতে হতাশা,

নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণতা অচির-কালমধ্যে দূরে অপসারিত হয়, সমগ্র চিত্তে ইহা একটা অপার্থিব প্রসন্নতা, এক অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাই আরোগ্যকে সম্ভব ও চিরস্থায়ী করে।

"যুক্তির দিক্ দিয়াও কথাটা একটু আলোচনা করিব। কারণ, সদ্‌যুক্তি পাইলে কথাটা সহজে বুঝিতে পারিবে। আমরা যাহা কিছু আহারীয়রূপে গ্রহণ করি, তাহা শরীরের উপাদানমূলক পরামাণুসমূহে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন যদি শারীর স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের সহায় হইল, তাহা হইলেই আমরা বলিয়া থাকি,—'সুপথ্য' গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু আহারের ফলে যদি একন ভাবে আণবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাহাতে স্বাস্থ্য-ধ্বংস হয়, তাহা হইলে আমরা সেই খাদ্যকে 'কুপথ্য' নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যখন কোনও কারণবশতঃ শারীর স্বাস্থ্য বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়, তখন যে বস্তু দেহ-মধ্যে গ্রহণ করিলে এই বিশৃঙ্খলতার পুনঃ-সংস্কারোপযোগী আণবিক পরিবর্ত্তনসমূহ দেহ-মধ্যে সংঘটিত হইতে থাকে, তাহাকে আমরা 'ঔষধ' সংজ্ঞা প্রদান করি। কিন্তু মুখ দিয়া যেমন আহার চলে, মনেরও তেমন আহার আছে। মুখের আহারীয় বস্তু জড় পদার্থ, কিন্তু মনের আহারীয় বস্তু চিন্তা। মুখের দ্বারা জড় পদার্থ আহারীয়-রূপে গ্রহণ করিলে দেহের উপরে তাহার যেমন হয় সুপথ্যের, নয় কুপথ্যের, নতুবা ঔষধের ক্রিয়া হইবে, মন দিয়া চিন্ময় পদার্থকে আহারীয়রূপে গ্রহণ করিলেও দেহের উপরে তেমন হয় গঠনমূলক, নয়

ধ্বংসমূলক, নতুবা শোধনমূলক ক্রিয়া হইতে থাকিবে। জিহ্বায় তেঁতুল রাখিলে জল-সঞ্চার হয়, কিন্তু মনে মনে তেঁতুলের কথা চিন্তা করিলে কি জল-সঞ্চার হয় না? হয়। কেন হয়? যেহেতু দেহের উপাদানীভূত অণু-পরমাণুসমূহের মধ্যে পরিবর্ত্তন-সাধন করিবার শক্তি চিন্তারও আছে। কতকগুলি চিন্তা দেহের অণুপরমাণুগুলির উপরে গঠন-মূলক প্রভাব বিস্তার করে, কতকগুলি চিন্তার ক্রিয়া অনুপরমাণুর উপরে ধ্বংসমূলক, আবার কতকগুলি চিন্তার ক্রিয়া শোধনমূলক হইয়া থাকে।

"দুগ্ধ যেমন মৌখিক আহারীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের নাম তেমন মানসিক আহারীয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুগ্ধ যেমন একাধারে ঔষধ এবং পথ্য, ভগবানের নামও তেমন একাধারে ঔষধ এবং পথ্য। পার্থক্য এই যে, কোনও কোনও রোগে দুগ্ধ অহিতকর, কিন্তু ভগবানের নাম সর্ব্বাবস্থায় হিতকর। আর এক পার্থক্য এই যে, মৌখিক পথ্য বা মৌখিক ঔষধের প্রয়োজনের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রয়োগ করিলে অহিত সম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবানের নামরূপ অমৃতময় পথ্যের বা ঔষধের প্রয়োজনের একটা কোনও নির্দ্ধারিত সীমা নাই এবং যতই ইহা সেবন করা যায়, ততই ইহার সুফল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, রোগারোগ্যের উদ্দেশ্য লইয়া একজন ভগবানের নাম জপিতে আরম্ভ করিল, শেষে রোগ সারিবার পরে নাম জপ চলিতে লাগিল এবং ইহার ফলে প্রেম-কল্প-পাদপ অঙ্কুরিত

হইয়া একজনের উপলক্ষ্যে সহস্র সহস্র দুঃখার্ত্ত মানব মানবীকে পরমা শান্তি বিতরণ করিতে লাগিল।

"ভগবানের নাম-স্মরণে শরীরস্থ উপাদানসমূহের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যে সমস্ত উপাদান দেহমধ্যে অবস্থান করায় কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর তাড়নায় জীব অধীর হয়, ভগবানের নাম সেই সব উপাদানগুলিকে স্থল-বিশেষে ধ্বংস এবং স্থলবিশেষে রূপান্তরিত করে।

"অতি সংক্ষেপে আমি ভগবানের নামের অপার মহিমার অংশমাত্র কীর্ত্তন করিলাম। তুমি নিজে নামের সাধনা তীব্রভাবে করিয়া নামের অফুরন্ত শক্তির পরিচয় স্বয়ং প্রাপ্ত হও, এই আশীর্ব্বাদ আমি করিতেছি।"

মায়ের পরিচয়

একটী ভক্তিমতী মহিলার একান্ত আগ্রহে প্রাতে সাতটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যারাকপুর আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির মৌনভঙ্গ হইলে মহিলাটী বলিলেন,—আমাকে বোধ হয় বাবামণি চিনতে পারেন নি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়ের পরিচয় শুধু মা। এর চাইতে অধিক পরিচয় ত' মায়ের কখনো দরকার হয় না।

উচ্ছ্বাস সাধন-জীবনের শত্রু

মহিলাটী বলিলেন,—কুমিল্লা আমি আপনার কাছে দীক্ষা

নিতে গিয়েছিলাম। আপনি দীক্ষা দেন নি। আমার স্বামী তখন জীবিত ছিলেন। এখন তিনি মরদেহে আর নেই। আমি আপনার মুখে শোনা উপদেশ মতই কাজ করে যাচ্ছি। সপত্নী-পুত্রেরা চাক্‌রী বাক্‌রী করেন, তাঁরাই প্রতিপালন কচ্ছেন। তাঁদেরই একজনকে উপলক্ষ্য ক'রে এখানে এসেছি। অনেকদিন বাবামণির চরণ দর্শন করি না, তাই পত্রের পর পত্র দিয়ে বিরক্ত করেছি। আমার ত' মনে ভয়ই ছিল, কি জানি যদি না আসেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না আসাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তোমার ছেলেরা যখন পত্র দিলেন যে, আমার একবার আসা চাইই, তখন ভাব্‌লাম ঘুরেই আসি না কেন? পত্রগুলিতে তোমার মা বড়ই উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসের চেয়ে বড় শত্রু সাধন-জীবনে অতি কমই আছে।

গুরুতে বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস

মহিলাটী একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন,—মনের ভাবকে প্রকাশ ক'রে যেন অর উঠতে পারি না। মনে হয়, যা লিখ্‌লাম, তাতে বুঝি নিজেকে প্রকাশ করা হ'ল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এইটাই তোমাকে বর্জ্জন কত্তে হবে। তুমি যখন আমাকে গুরু ব'লে জেনেছ, তখন এই কথাও তোমার জানা প্রয়োজন যে, তোমার হাতের ছোঁয়া কাগজখানা দুটী মাত্র অক্ষর নিয়ে গেলেও আমি তা' থেকে তোমার

প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝতে পারি। ভক্ত যখন দেবতার পায়ে তুলসী-বিল্বপত্র অর্পণ করে, তখন সেই তুলসী পাতায় বা বেলপাতায় সে নিজের অন্তরের আকিঞ্চন লিখে দেয় না। প্রাণের সকল আবেদন বহন ক'রে কিন্তু সেই একটী দুইটী গাছের পাতা ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়। গুরুর কাছে পত্র দিতেও শিষ্যের তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। তা' হ'লেই উচ্ছ্বাস ক'মে যাবে।

উচ্ছ্বাসের দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উচ্ছ্বাসের অনেক দোষ। তোমার মনে যে ভাবটা যতটুকু প্রকটিত, তাকে তার চেয়ে বেশী ক'রে দেখানই হচ্ছে উচ্ছ্বাসের স্বভাবধর্ম্ম। মিশ্রি মিষ্টি লেগেছে, একথা বল্‌লেই মিশ্রি সম্পর্কে সকল কথা একরকম বলা হ'ল। কিন্তু যদি বল্‌তে শুরু কর, কি আশ্চর্য্য মিষ্টি, কি নিদারুণ মিষ্টি, কি সাংঘাতিক মিষ্টি, কি মারাত্মক মিষ্টি, কি ভয়ঙ্কর মিষ্টি, তা' হ'লে সত্য সত্যই কতকগুলি শব্দের অতি সাংঘাতিক অপপ্রয়োগ হ'য়ে গেল। পরিচ্ছন্ন কয়েকটী শব্দের মধ্য দিয়ে মনের ভাবকে প্রকাশ কত্তে কপটতার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাকে সাহিত্যিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট করার জন্য দুনিয়ার যত উপমা ও তুলনার সমাবেশ ক'রে, নানাবিধ আলঙ্কারিকতার জঞ্জালে তাকে ভারাক্রান্ত ক'রে যখন কথা বল্‌তে বা লিখতে সুরু কর্ল্লে, তখনই তোমার আসল ভাব বস্তাপচা শব্দরাশির তলায় প'ড়ে

ম'রে পচতে আরম্ভ করে। "ভগবান্, তোমাকে ভালবাসি,"— এই কথাতেই ভগবানের সঙ্গে চরম মধুর সম্পর্ক স্থাপন হ'য়ে গেল, কিন্তু যখন বল্‌তে সুরু করবে,—"হে ভগবান্, তোমাকে ভালবাসি গ্রীষ্মকালের কাঁচা আমের চাটনীর চেয়ে বেশী, শীতকালে লেপের চাইতে বেশী, ক্ষুধার সময়ের ইলিশমাছ-ভাজার চাইতে বেশী", তখন তা' ভালবাসাকে করবে কবরস্থ এবং সেই কবরের তলা থেকে কেবল পচা মড়ার গন্ধই আস্‌তে থাক্‌বে। ভগবান্ মহাকবি, তিনি কবিতা ভালবাসেন, কিন্তু সেই কবিত্ব হবে স্বতোনিঃসরিত, কষ্ট-কল্পনা ক'রে নয়।

সৎসঙ্গের শক্তি

বৈকাল বেলা কতিপয় ভক্ত সমাগত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎসঙ্গই ভক্তিপথের সবচেয়ে বড় পাথেয়। যথার্থ শক্তিমান্ সাধুপুরুষ যদি কৃপা ক'রে তোমাকে তাঁর সঙ্গ দান করেন, তবে তোমার আর সাধ্য কি যে তুমি বিপথে যাবে? সৎপুরুষেরা যেন চুম্বক, আর তুমি যেন লোহা। লোহা চাক্ আর না চাক্, চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির বিস্তারের মধ্যে আস্‌লে সে আর ছুটে পালাবে কোথায়? কোনো চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি বেশী থাকে, কোনোটার বা কম থাকে, কিন্তু ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পণের ফলে যাঁর ভিতরে এই আকর্ষণী শক্তি জন্মেছে, তাঁর সংস্পর্শ অল্পকালের জন্য হ'লেও তোমার পরম মঙ্গলপ্রদ হবেই হবে।

প্রেমের বিচিত্র বিকার

সকলে চলিয়া গেলে একজন বলিলেন,—বাবামণি, আমাদের স্বামী ও স্ত্রীতে বড়ই কলহ চলেছে। জীবন যেন অশান্তিময় হ'য়ে উঠেছে; কি এর উপায় করি, তাই বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কি নিয়ে তোমাদের অ-বনিবনা?

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিছু নিয়ে নয়, হঠাৎ কলহ আরম্ভ হ'ল ত', কি নিয়ে যে আরম্ভ হ'ল, তাই পরে আর খুঁজে পাই না। অন্তরের জ্বালা, মর্ম্মদাহ এইমাত্র শেষে থাকে সাথী। অথচ আমরা বিবাহের পর থেকে কিছু দিন বড়ই নিবিড় প্রীতির মধ্য দিয়ে বাস ক'রে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বুঝেছি। তোমাদের ভালবাসাই কলহের রূপ ধরেছে। প্রেম এক বিচিত্র বস্তু, তার কত সময়ে যে কত রূপান্তর আর কত অবস্থান্তর হচ্ছে, তা' বুঝে উঠা মুস্কিল। এক দিন তোমরা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ, তখন কিন্তু জানতে পার নাই যে, একজন আর একজনের ভিতরে নিত্যনিরঞ্জন পরমেশ্বরকেই কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছ। আজ আবার নিজেদের মধ্যে অকারণ কলহে অধীর হয়ে জীবনকে মৃত্যুপ্রদ ব'লে অনুভব কচ্ছ, কিন্তু এখনো অনুভব কত্তে পাচ্ছ না যে, ভালবাসা তোমাদের দুজনকে করেছিল অত নিবিড়, অত নিকট, সেই ভালবাসাই একটা রূপান্তর ধ'রে তোমাদের মধ্যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা, মনোভঙ্গ, অমিল, মতান্তর এবং নানা অশান্তিকর মনোভাব-রূপে আত্মপ্রকাশ কচ্ছে। আসলে সবটাই সেই একই ভালবাসা।

ভালবাসার আসল বস্তুকে পাচ্ছ না, কেবল খোলস নিয়েই ক'রে এসেছ নাড়াচাড়ি, ফলে এক দিন যাকে পেলে মনের গভীর গহন নীড় অপার অসীম তৃপ্তিতে আর প্রাপ্তিতে যেত ভ'রে, তাকে কাছে পেয়ে কেবল শূন্যতা আর রিক্ততা পেয়ে পেয়ে তোমাদের মনেরও অগোচরে একের প্রতি অপরের কেবল সন্দেহই হচ্ছে যে, তোমার জীবনসঙ্গী বোধ হয় তার ভালবাসা অন্যখানে অর্পণ করেছে। নইলে, আগে যার কাছে এলেই মনঃপ্রাণ শান্তিতে, আনন্দে, তৃপ্তিতে ভ'রে যেত, আজ কেন তার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ বাস ক'রেও কোনো আনন্দ নেই, কোনো রোমাঞ্চ নেই, কোনো উল্লাস নেই?

দেহের পরিতৃপ্তি ও ভালবাসার পিপাসা

প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীশ্রীবাবামণির এই অনুমানের সত্যতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের অনেকগুলি অতি গূঢ় ব্যাপার বর্ণনাও করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম যখন বিবাহ হয় বা প্রথম যখন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন তারা একে অন্যকে পরিপূর্ণ ভাবে পাবার জন্য হয় ব্যগ্র এবং একের কাছে অপরকে পরিপূর্ণ ভাবে অর্পণ ক'রে দেবার জন্য হয় ইচ্ছুক। সাংসারিক হিসাবে জীবনের এই দিনগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ দিন, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই দিনগুলিতে তারা কেবল দেহের মিলন আর মনের মিলন নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আত্মার মিলন ত' হ'য়ে উঠে না। দেহের পরিতৃপ্তি সীমাবদ্ধ, মনের

গঠন পরিবর্ত্তনশীল, তাই দুদিন পরে সকল কিছুই আলুনি মনে হয়। অথচ প্রাণভরা রয়েছে ভালবাসার পিপাসা, আরো ভালবাসা সে পেতে চায়, আরো ভালবাসা সে দিতে চায়। যে আধারটাকে আশ্রয় ক'রে ভালবাসার আদান-প্রদান সুরু হয়েছিল, তা' ত' দুদিন পরেই নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। তখনই আসে এই সকল অশান্তিকর উপসর্গ।

স্বামি-স্ত্রীতে আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আমার এখন কি করা সঙ্গত? আমি যে আর পেরে উঠ্‌ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাব্‌বারও কিছু নেই, যেখানে মুস্কিল, সেখানেই আসান,—শোন নি এ কথাটা? স্ত্রীর সাথে অসংখ্যবার দেহের মিলন-সাধনের চেষ্টা করেছ, কিন্তু প্রাণের মিলন তাতে আসে নাই। মনের মাদকতা হয়ত বেড়েছে, কিন্তু প্রাণের নিবিড় একতাকে উপলব্ধিতে আন্‌তে পার নাই। এখন সেই কাজটাই গিয়ে কত্তে হবে। স্ত্রীকে কাছে ডেকে এনে বল, 'এতকাল আমরা দেহেরই মিলন সাধনের চেষ্টা করেছি, এস এবার প্রাণে প্রাণে মিলন সাধন করি।' তারপরে দুজনে দুজনের শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতাগতির মিল রেখে একে অপরের আপন হবার চেষ্টা কর। পাশাপাশি বসে, মুখামুখি বসে, বুকে বুক লাগিয়ে, বুকে পিঠ লাগিয়ে প্রভৃতি যখন যে অবস্থায় ঘনিষ্ঠ হচ্ছ, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সকল অবস্থায় একে অন্যের শ্বাসের

সঙ্গে নিজ শ্বাসকে মিলাতে লেগে যাও। প্রত্যহ কিছু কিছু সময় এভাবে কাজ ক'রে যাও, দেখবে, কামের প্ররোচনাকে না বাড়িয়েও, ইতর লুব্ধতাকে প্রশ্রয় না দিয়েও, একের সঙ্গে অপরের কেমন গভীর মিলন সাধিত হ'য়ে যাচ্ছে। যার সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতার সামাজিক বা ধার্ম্মিক ভাবে কোনো সীমারেখা টানা নেই, তার মধ্যে তার প্রাণের মিলন অতি সহজ ব্যাপার যে হে! কেন অত বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, নারীপুরুষের মিলন দেহ দিয়েই আরম্ভ কিন্তু আত্মায় গিয়ে তার শেষ। জড় দেহের মিলনকেই চৈতন্যময় মিলনে পরিণত করা তোমার বিবাহের উদ্দেশ্য। সেই আসল কথাটা ভুলে গিয়েই কত কষ্ট পাচ্ছ। সত্যিই যখন বুঝতে পেরেছ যে, দেহ দিয়ে মিলন পাকা হয় না, এখন সূক্ষ্মতর মিলনের পথ ধ'রে চল। চলতে চলতে পথ আপনি এসে ধরা দেবে। ভগবান্ শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপী দুই মহাশক্রকে জীবের সব চেয়ে বড় বন্ধু ক'রে পাঠিয়েছেন। তাদের আশ্রয় নিয়ে তাদের মিত্র ক'রে নাও, তাদের সহায়তায় মহামিলনের পথ বের ক'রে নাও। অপদার্থেরাই বিপদে পড়ে, বিহ্বল হয়, পুরুষ-সিংহ বিপদের মাঝ থেকে সম্পদকে কুড়িয়ে নেন। স্বামি-স্ত্রীতে আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন কর, জীবন তাতেই হবে সুখময়।

কলিকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৪

অদ্য দ্বিপ্রহরে ভবানীপুর হইতে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা

আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির সাক্ষাৎ পাইয়া মহিলাটী নানাভাবে সাধুদর্শনের সৌভাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মায়া ও সংসার

মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখুন এই যে সংসারের জন্য মায়া, এটা দূর হ'তে পারে কি করে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দূর ক'রে আর কত লাভ? তার চেয়ে এ মায়াকে বাড়িয়ে চলুন। যে মায়া আজ আপনাকে একজনের সাথে বাঁধছে সে মায়া কাল আপনাকে দুজনের সাথে বাঁধুক, পরশু সে মায়া আরও বিস্তারিত হ'য়ে আরও একজনের সাথে আপনাকে বাঁধুক। বাড়তে বাড়তে মায়া যখন সবারই সাথে আপনাকে বেঁধে ফেল্‌বে, তখন মায়া আর বন্ধন কিসের? তখন যে মা, মায়াই আপনার মুক্তি।

মহিলা।—কিন্তু নিজের ছেলেটীকে যেমন দেখি, পরের ছেলেটীকে যে তেমন দেখতে পারি না! তার উপায় কি হবে!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার জন্যই মা, ভাব্‌না করেন কেন? ক্রমে পার্‌বেন। নিজের ছেলেকেই আদর করুন আর পরের ছেলেকেই আদর করুন, আদর কিন্তু কচ্ছেন ছেলেকে নয়, আদর কচ্ছেন ভগবানকে। যেদিকে যাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন মা, সবই ঐ ভগবানেরই রূপ। ভগবানকে অন্তরেই খুঁজে পেতে হয় বটে কিন্তু বাইরেও মা, তিনি ছাড়া আর ত' কেউ নেই। ভিতরে যাঁকে পূজা কচ্ছেন, তিনিও যে ভগবান্, বাইরে যাকে

পূজা কচ্ছেন, তিনিও ত' সেই ভগবানই বটেন! স্বার্থান্ধ হ'য়ে যখন নিজের ছেলের সেবা করেন, তখনো যেমন ভগবানেরই সেবা হয়, পরমার্থ-বুদ্ধি হ'য়ে যখন পরের ছেলের সেবা করেন, তখনো তেমন ভগবানেরই সেবা হয়। যে ভাবে আমরা যাই করি না মা, সব-তাতে তাঁরই পূজা হচ্ছে।

মহিলা।—কিন্তু একথা আমরা বুঝি না যে!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বুঝি না ব'লেই যে পূজো হয় না, তা নয় মা। তবে অজ্ঞতায় পূজো অঙ্গহীন হয় কিন্তু যখন বুঝ্‌তে পারি, তখন আমাদের পূজো হয় ষোড়শোপচারে। এখন আমরা অঙ্গহীন পূজো ক'রে যাচ্ছি ব'লেই অত ভয়ের কি আছে? তামসিক পূজো কত্তে কত্তেই ক্রমে সাত্ত্বিকে অধিকার জন্মে। অজ্ঞানীর পূজো তামসিক, জ্ঞানীর পূজো সাত্ত্বিক।

স্ত্রী-জাতির ভবিষ্যৎ

মহিলা।—দেখুন বাবা, আমাদের পক্ষে সদুপদেশ পাওয়ার সুযোগ বড়ই অল্প।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু এ দুর্দ্দিন বেশীদিন থাক্‌বে না মা। পুরুষের পক্ষে মা-দের সৎসঙ্গের অভাব পূরণ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু শীঘ্রই মা-দের ভিতরে এমন সব মহাপুরুষের উদ্ভব হবে, যাঁরা অনেক যুগের ক্ষতি পূরণ ক'রে দিতে পার্ব্বেন। পুরুষদের ভিতরে ত' বুদ্ধ, শঙ্কর,যীশু, চৈতন্য অনেকেই জন্মেছেন মা, এবার হচ্ছে আপনাদের পালা। এবার যীশু, বুদ্ধ এঁরা সব মায়েদের মধ্য

দিয়ে বেরুবেন। এতদিন মেয়েরা পুরুষদের মুখে ভগবানের বাণী শুনে আস্‌ছেন, এখন থেকে মেয়েদের মুখে সবাইকে ভগবানের বাণী শুনতে হবে। এবারকার রবই হচ্ছে,—"জয় মা জয় মা", এবারকার মন্ত্রই হচ্ছে,—"জয় মা আনন্দময়ী, জয় মা মঙ্গলময়ী"।

কলিকাতা

২০শে বৈশাখ, ১৩৩৪

শয়ন-কালে নাম জপ

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শয়ন-কালে বাজে চিন্তা কত্তে কত্তে নিদ্রাগত না হ'য়ে ভগবানের পরম-মঙ্গলময় নামের সেবা কত্তে কত্তে শয়ন কর্ব্বে। তাতে মন সর্ব্বপ্রকার অপ্রকাশ্য কুসংস্কার ও নিরতিশয় কদর্য্য আসক্তি-সমূহের হাত থেকে সহজে মুক্তি পাবে। জনহিত বা জগদ্ধিতের চিন্তা অন্য চিন্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শয়নকালে সেই চিন্তাও আংশিক সুনিদ্রাভেদ করে। কিন্তু মঙ্গলময় নামের নিষ্কাম সেবা কত্তে কত্তে নিদ্রাগত হ'লে মন, প্রাণ একসঙ্গে সুস্থ, সবল ও শান্ত হয়। অন্য সকল প্রকার চিন্তারই নানা প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু নামের নিষ্কাম সেবা সর্ব্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া বর্জ্জিত এবং স্নায়ুসমূহের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক।

শয়ন-কালে সচ্চিন্তার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শয়নকালে মনোমধ্যে কামনা,

বাসনা, লালসা, লোলুপতা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অনুতাপ, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, হিংসা বা পরোপকার-চিন্তাকে কিছুতেই থাক্‌তে দেওয়া উচিত নয়। জাগ্রদবস্থায় মন চলে সঙ্কল্পের অধীন হ'য়ে আর নিদ্রাবস্থায় মন চলে নিদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চিন্তাগুলির ধাক্কায়। এজন্যই প্রত্যহ শয়ন-কালে যে বিষয়ের চিন্তা করা যায় মনটী নিদ্রাকালে সকলের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ তার অনুরূপ গঠন লাভ কত্তে থাকে।

গৃহীর শয্যা কিরূপ থাকা প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহস্থ মাত্রেরই মনে রাখ্‌তে হবে যে, তার শয্যাখানা নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতার নিকটে নিজেকে বলি দিয়ে দেওয়ার যূপকাষ্ঠ নয়। শয্যাখানা হচ্ছে ভবিষৎ বংশধরের মানবোচিত আবির্ভাবের প্রথম পাদক্ষেপের পীঠিকা। নিদ্রাকালীন সচ্চিন্তার অমোঘ প্রভাবের দ্বারা এই শয্যাতে এমন বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চারণা ক'রে রাখা আবশ্যক, যেন দুই চারি বৎসর পরে একদিন যখন এই শয্যাতে শায়িত থাকা কালে সন্তানের জননীর গর্ভে জনকের বীর্য্যবিন্দু আহিত হবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি পরলোক-প্রস্থিত মহামানবের দল সেই পবিত্র দৃশ্য দর্শন ক'রে কৃতার্থ হবার জন্য এই শয্যার চতুর্দ্দিকে এসে সমবেত হন। সন্তানের আবির্ভাবটীকে যেন তাঁরা অশরীরী বেদমন্ত্র-গানের দ্বারা অভিনন্দিত করেন। গৃহীর শয্যা এরূপ পবিত্র থাকা প্রয়োজন।

সন্ন্যাসীর শয্যা কিরূপ হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীর শয্যা হবে এমন, যেন কামুক, লম্পট, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি এই শয্যা স্পর্শ কর্‌লেও প্রবল বৈদ্যুতিক ডি-সি কারেণ্টের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে দূরে নিপাতিত হয়।

শয়নকালীন নামজপে দৃঢ়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তার উপায় হচ্ছে, শয়ন-কালীন চিত্ত-ভাবকে প্রসন্ন, অনুত্তেজিত, সুস্থির, ধীর এবং ইষ্টলক্ষ্য রাখা। তারই জন্য শয়নকালীন নামজপের উপরে আমি এত জোর দিই। জগতের আর কোনও ধর্ম্মপ্রবক্তা হয় ত' তোমাদের এই বিষয়ে এত জোর দিয়ে কথা না ব'লে থাক্‌তে পারেন কিন্তু তার জন্য আমি আমার জোর কমাতে পারি না। শয়ন-কালীন নামজপকে তুমি তোমার এক অতীব মহৎ কর্ত্তব্য এবং অপরিহার্য্য ব্রত ব'লে মনে করবে। শয়ন-কালীন নামজপে তোমরা খুব দৃঢ় হবে।

কলিকাতা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৪

যৌবনের উন্মাদনা ও সংযমের সহজ পথ

পালং-নিবাসী সু-বাবু শ্রীশ্রীবাবামণির প্রণীত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের কিয়দংশ পড়িতেছিলেন। কতকটা পড়িয়া

বলিলেন,—তা' ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যত কথাই লেখা হোক্‌না কেন, যৌবনের উন্মাদনা বন্ধ ক'রে তাকে সৎপথে চালান বড় সহজ কথা নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সহজ কথা ত' নয়ই, কিন্তু তবু আমাদের চেষ্টা দেখ্‌তে হবে, একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না। বহিরে আমরা যে ভগবানকে পাচ্ছি, তাঁকে সেবা কত্তে হ'লে, শ্রেষ্ঠ সেবা এই ভাবেই কত্তে পারি। অন্নহীনকে অন্ন দিলে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলে, কর্ম্মহীনকে কর্ম্ম দিলে, নিরুদ্যমকে উদ্যাম দিলে, অধার্ম্মিককে ধর্ম্ম দিলে, অসংযমীকে সংযমের পথে চালাতে চেষ্টা করলে তাঁর শ্রেষ্ঠ সেবা হয়। আমরা তাঁর সেবক, সেবা ক'রেই খালাস, ফলাফল ভাব্‌বার দরকার কি? গৃহীর জীবন পঙ্কিল হয়েছে ব'লেই আজ সমগ্র দেশময় দুঃখ দৈন্য এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা সফলকাম হই আর নাই হই, গৃহীকে এ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত কত্তে চেষ্টা পেতেই হবে।

সু-বাবু।—কিন্তু যে উপায়গুলো দেখান হবে, সেগুলো সহজ হওয়া চাই। নইলে তারা পাল্‌তে পার্‌বে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে কথা সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ ক'রে দিতে হবে। একদিকে যেমন তাকে সহজ পথ দেখাতে হবে, অপরদিকে তেমনি আবার কঠিন নিয়ম পাল্‌বার মত সাহস এবং শক্তি দিতে হবে। সামর্থ্য এলে কঠোর বিধি আর কঠোর থাকে না, সহজ হ'য়ে যায়। বর্ত্তমান

গৃহীদের মনের দুর্ব্বলতার পরিমাণ বুঝে একদিকে যেমন সরল পথের খোঁজ দিতে হচ্ছে, তেমনি আবার এ লক্ষ্যটিও তীব্রভাবেই রাখ্‌তে হচ্ছে, যেন বন্ধুর দুর্গম পথে চল্‌বার মত সামর্থ্যও এদের দিন দিন বাড়্‌তে পারে।

সু-বাবু।—যুবক-বয়সে কেউ যে দাম্পত্য সংযমের প্রয়োজনই স্বীকার কত্তে চায় না। এদের ভাণ্ডার অফুরন্ত, খরচও করে বে-পরোয়া হ'য়ে। এদের জন্য উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একমাত্র ভগবানই এর উপায়। মানুষের হাতে যে উপায় ছিল, তা' ত' গোড়াতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর মানুষের হাতে কিছু নেই। তবে যারা এখনও যুবকত্ব পায় নি, তাদের জন্য মানুষ অনেক কত্তে পারে। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন এক আমূল পরিবর্ত্তন মানুষ অবশ্যই আন্‌তে পারে, যাতে এখনকার বালকেরা যৌবন-সংগ্রামের যোগ্য অস্ত্রশস্ত্র আগে থেকেই সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌তে পারে। এ' শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন যদি সর্ব্বজনীনভাবে সম্ভব না-ও হয়, তবু অনেকের জন্যেই হ'তে পারে। কিন্তু যারা যৌবনের জোয়ারে একবার গা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের উপায় বিধান কত্তে পারে, ভগবানের কৃপা।

সু-বাবু।—তা' হ'লেই প্রকারান্তরে বলা হ'ল যে, অসংযম-মগ্ন বিবাহিত যুবকদের আর কোনও উপায় নেই!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' কেন? উপায় নিশ্চয়ই আছে। সে উপায় হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান্। তবে, ভগবানকে ত' আমরা আর

সব সময় আমাদের হাতের কাছে পাই না। সুতরাং তাঁর নামই এ অবস্থায় পরম সম্বল। যৌবন যতই প্রবল হোক্, ভোগাকাঙ্ক্ষা যতই উদ্দাম হোক্, নর-নারী যদি ভগবানের নাম-সাধন কত্তে মন-প্রাণ দেন, তাহ'লে আপনা আপ্নি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সু-বাবু।—একথা মান্তে পারি, কিন্তু প্রমাণের অভাব।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রমাণের অভাব নয়, প্রমাণ পাবার জন্যে প্রকৃত আগ্রহের অভাব। কিন্তু সে কথা যাই হোক্, গৃহীদের জীবনের এই নরক-মুখিনী গতিকে ফিরাতেই হবে, এই প্রবল লালসার স্রোতকে মঙ্গলতর পথে নিতেই হবে। নিশ্চয় ভগবান্ আমদের মধ্যে সে শক্তি দেবেন, যে শক্তি কথার চাইতে ইচ্ছার বলে বেশী কাজ করে।

গার্হস্থ্যের বিশোধন ও সন্ন্যাসীর সংখ্যাহ্রাস

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—এই যে পালে পালে গেরুয়াধারীরা গৃহি-জীবনের প্রতিবাদ-স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন, এদের সংখ্যা অত সমাজ-সংস্কার ক'রেও, অত বক্তৃতা দিয়েও কেউ হ্রাস কত্তে পাচ্ছেন না কেন, বল্তে পারেন? সন্ন্যাসীদের গাল দিয়ে, তাদের জীবনের শত কল্পিত বা বাস্তব ত্রুটি দেখিয়ে, এমন কি অত্যাচার, নির্য্যাতন বা আইন ক'রেও সন্ন্যাসের স্রোত বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ কত্তে হবে গৃহীর জীবনে পূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। জগতে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে সন্ন্যাসী খুব সুলভ বস্তু নন। যেদিন

গৃহীর জীবনকে পঙ্কিলতা-মুক্ত হবার উৎকৃষ্ট সুযোগ দেওয়া যাবে, যেদিন গৃহীর গৃহেও পরমানন্দের ঠাঁই হবে, যেদিন গৃহীর প্রাঙ্গণ-তল পবিত্রতায় শুভ্র হ'য়ে উঠ্‌বে,—সেদিন দেখ্‌বেন সাড়ে পনর আনা সন্ন্যাসী গৈরিক বসন গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে শান্ত-শিষ্ট হ'য়ে এসে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করেছেন। বর্ত্তমান সন্ন্যাসাতিশয্য ত' অপবিত্র গার্হস্থ্যের প্রতিক্রিয়া। তাই, প্রকৃত সংস্কারকের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে গার্হস্থ্যের বিশোধন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৪

অতীত ভুলিয়া যাও

অদ্য প্রাতঃকালে চট্টগ্রাম মেইলে শ্রীশ্রীবাবামণি ভাগ্যকুল রওনা হইলেন। ষ্টেশনে একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করিলেন। যুবকটী অতীতের কলঙ্কময় জীবন পরিহার করিয়া অতি অল্পদিন হয় কল্যাণের পথে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীত জীবন ভুলে যাও, ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে মাতঙ্গ-বিক্রমে পথ চল, সিংহ দর্পে সকল পূর্ব্ব সংস্কারের মাথায় পদাঘাত কর। জীবনে অপরাধ কে না করে? ত্রুটী কার না হয়? কিন্তু একবার খাদে পড়্‌লে আর একবারের জন্য—সাবধান হ'লেই হ'ল। কলঙ্ক ক'দিন থাকে রে? রত্নাকরকে আজ আর কে মনে ক'রে ব'সে আছে? বাল্মীকিরই নামের জয়জয়কার। আগে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হও, তখন দেখ্‌বে হৈ-চৈ করার জন্য লোকের অভাব হবে না। জয়যাত্রার সাথী সব সময়েই মিলবে।

আগে লড়াই জিতে নাও, কেল্লা ফতে ক'রে নাও।

সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

এই সময়ে অপর এক ভক্ত স্টেশানে আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন,—দেখ্‌রে, সন্ন্যাসীদিগকে সংসারীরা হতভাগ্য বলে। চুয়ান্ন লক্ষ্য সন্ন্যাসী গৃহীদের ঘাড় ভেঙ্গে খাচ্ছে, এই হ'ল তাদের প্রথম অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সন্ন্যাসীরা স্ত্রী-ভীত কাপুরুষ, তাদের জীবনের আদর্শ অসম্পূর্ণ। তৃতীয় অভিযোগ হচ্ছে, তাঁরা নিজের মুক্তি, নিজের মোক্ষ নিয়েই ব্যস্ত। এই সব অভিযোগের উত্তর আমাদিগকে কিভাবে দিতে হচ্ছে জানিস্? মুখে জবাব দিলে চল্‌বে না, কাজে দিতে হচ্ছে। প্রথমতঃ গৃহীর কষ্টার্জ্জিত অন্নের পানে তাকিয়ে আমরা জীবন বহন কচ্ছি না, অভিক্ষা ব্রতের বজ্র দিয়ে আমরা গৃহীদের অভিযোগের ভিত্তি উৎখাত করেছি। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতির উন্নতিকেই জাতীয় উন্নতির মূল বলে অনুভব করেছি ব'লে আমরা তাঁদের অভ্যুদয়ের জন্য কোন্ দিক্ দিয়ে কি করা যায়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কচ্ছি। তৃতীয়ঃ ব্রহ্ম-সাধনায় উপেক্ষা না ক'রেও কর্ম্মকে ব্রহ্ম ব'লে গ্রহণ করেছি।

কর্ম্ম ও তপস্যা

রাত্রিতে ভাগ্যকুল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক

শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শিক্ষক মহাশয় একজন কর্ম্মী-পুরুষ। প্রাণপাত পরিশ্রমে ইনি এখানে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির প্রচারিত "ব্রহ্মচারীর দিন-লিপি" বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। দেশের সেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত শিক্ষক মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, দেখুন, কর্ম্ম ত' আমরা চাইবই, তাতে আর সংশয় কি? কর্ম্মই যে ব্রহ্ম, এই কথাটাই আমাদের সিদ্ধিমন্ত্র। কিন্তু আমরা যেন চাই হিমাচলের মত বিরাট্ সাধনার ফলে হীরক খণ্ডের মত ক্ষুদ্র কিন্তু সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান। তপস্যাহীন বনিয়াদের উপরে জাতীয় জীবনের সৌধ দাঁড়াবে না। তাকে দাঁড় করাতে হবে, অফুরন্ত তপস্যার উপরে।

তপস্যার অর্থ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য তপস্যা বল্‌তে শুধু মালা-জপই বুঝাচ্ছি না। মালা-জপ করারও প্রয়োজন পড়বে, ধ্যান-ধারণারও আবশ্যকতা হবে, কিন্তু তপস্যা বল্‌তে আমি বুঝেছি সঙ্কল্পের একাগ্র সাধনাকে। একটী মাত্র সঙ্কল্পকে বুকের মাঝে পোষণ ক'রে চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্যকে তারই সাধন-কল্পে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখার নাম তপস্যা। সঙ্কল্পের সফলতায় কিছুমাত্র অবিশ্বাসী না হ'য়ে, এক দিনের জন্যও আস্থাহীন না হ'য়ে, মুহূর্ত্তের জন্যও না ট'লে, সম-প্রযত্নে, সমান

সাহসে আগাগোড়া তাতে লেগে থাকার নাম তপস্যা। লোক নিন্দাতে না ব্যস্ত হ'য়ে, যশোবৃদ্ধিতে না ভুলে, নির্য্যাতনকে না গ্রাহ্য ক'রে মৃত্যুদণ্ডকে না ভয় ক'রে, সঙ্কল্পের সাধনায় লেগে থাকার নাম তপস্যা।

তপস্বীর আত্মগঠন

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন, তপস্যা করা সোজা নয়, সহজ লোকে পারে না, বলহীনের তপস্যা হয় না। তপস্যায় বল বাড়ে, আবার বলে তপস্যা বাড়ে। তাই, আগে চাই বল। এই বলের গোড়া ব্রহ্মচর্য্য, এই বলের গোড়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। ভগবানকে জান্‌তে হবে সঙ্কল্পের পূর্ণতা-বিধাতা, তবে হবে তপস্যা। নিজের বাহুবলকে জান্‌তে হবে ভগবদিচ্ছার দাস, ভগবৎশক্তির প্রতিনিধি, তবে হবে তপস্যা।

ভাগ্যকুল

২৮শে বৈশাখ, ১৩৩৪

অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি ভাগ্যকুল স্কুলে শুভাগমন করিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও কর্ম্মীর সৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধীয় মতামত শুনিয়া হেমবাবু বলিলেন,—কিন্তু residential (আবাসিক) আশ্রমাদি

প্রতিষ্ঠা বড়ই ব্যয়সঙ্কুল ব্যাপার।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অর্থসংগ্রহ ছাড়াও এই সম্পর্কে অন্য বিষয়ে চিন্তা কত্তে হচ্ছে। মনে করুন, residential (আবাসিক) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর্থিক বাধা আমরা দূরই কত্তে পার্লাম। কিন্তু এইখান থেকে শিক্ষিত হ'য়ে গিয়ে ছেলেরা যদি বর্ত্তমান যুগের জীবন-সংগ্রামে টিকে থাক্‌তে না পারে, তা' হ'লে প্রতিষ্ঠানটার বাঁচবার অধিকার থাকে না। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের ছাত্রেরা যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মতন আত্মসুখলোভীর জীবনই যাপন কর্ল্ল, সমাজের কোনও প্রত্যক্ষ-সেবায় আত্মনিয়োগ না কর্ল্ল, তা' হ'লে এত কষ্ট ক'রে বুকের রক্ত দিয়ে আশ্রম গ'ড়ে লাভ হ'ল কি? সুতরাং শুধু আর্থিক অভাব দূর হ'লেই সব হ'ল না। সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য, উৎসর্গীকৃত-জীবন কর্ম্মী-পুরুষদের সৃষ্টিরই জন্য এ আশ্রম,—এই সঙ্কল্পটিতে আগে আমাদিগকে মনে প্রাণে আরূঢ় হ'য়ে নিতে হবে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দালাল ও ব্যবসাদার তৈরী করার জন্য দেশের ঢের প্রতিষ্ঠান আছে, নাই শুধু কর্ম্মী-সৃষ্টির জন্য। মরণ-ভয়-রহিত অক্লান্ত কর্ম্মী যে আজ চাই মাষ্টার মশায়। তাই, আমি অর্থের চিন্তাকে চিন্তা ব'লেই গণনায় আনিনি।

স্ত্রী-জাতির আত্মশক্তি

বৈকাল বেলা জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির

চরণপ্রান্তে উপদেশ লাভার্থে বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—স্ত্রীজাতি যে আজ কত অধঃপতিত, এই কথাটা মুহূর্ত্তের তরেও ভুলে যেয়ো না। স্ত্রীজাতির দুঃখকে স্ত্রীজাতিকেই দূর কত্তে হবে। নারীর বুকের উপরে যে অজ্ঞানতার পাষাণ-ভার চেপে রয়েছে, তার মাথার উপরে অত্যাচার ও অবিচারের যে গুরুতর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পেষণ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা নারীকেই কত্তে হবে। আমরা দূর থেকে তোমাদের উৎসাহ মাত্র দিতে পারি, ভাল কর্ল্লে প্রশংসা মাত্র কত্তে পারি, কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না। কারণ, যার যার মুক্তি তার তার হাতে। তোমাদের সৌভাগ্য, তোমাদের সমৃদ্ধি, তোমাদের অভ্যুদয়—তোমাদের করায়ত্ত। পুরুষের জাতি আজ নিজেরাই মুক্ত নয়, তারা আবার তোমায় কি মুক্তি দেবে? তারা নিজেরাই যে সব অজ্ঞতার ক্রীতদাস, মিথ্যার উপাসক, তারা তোমাদের জ্ঞানের আলো কি ক'রে দেবে, তারা তোমাদের সত্যদর্শন কি ক'রে করাবে? আজ তোমাদের বিশ্বাস কত্তে হবে যে, তোমরা সব পার। ঐ য়ুরোপের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা কি না কচ্ছে? য়ুরোপ-অ্যামেরিকার সবটাই যে তোমাদের নকল কত্তে হবে, তা' বল্‌ছি না। কিন্তু তাদের জীবনে যেইটুকু বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে, সেইটুকু গ্রহণ কত্তে হবে। ঐ সব দেশে তাকিয়ে দেখ, নিবেদিতা, নাইটিঙ্গেল প্রভৃতির মত কত শত শত পুণ্যশীলা মেয়ে জগতের কল্যাণের জন্য চিরকুমারী থেকে গেলেন, প্রাণপণে

আমৃত্যু জীবসেবা ক'রে গেলেন। ধন্য তাঁদের জীবন! আমাদের দেশেও কি তেমন হবার দরকার নেই? এই যে বালবিধবার গোষ্ঠী, এদের দিয়ে কি সমাজের কোনো কল্যাণ হ'তেই পারে না? ভগবান্ যাঁদের দয়া ক'রে চিরব্রহ্মচর্য্যের অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিয়ে দিলেন, সংসারীর দাসত্ব না ক'রে যাতে তাঁরা ভগবানেরই কাজ কত্তে পারে, তার ব্যবস্থা করা কি আমাদের দরকার নয়? বাল-বিধবার জীবন এক পরম দুঃখের জীবন, অথচ কি পবিত্র জীবন এঁদের! এঁরা ব্রহ্মচারিণী, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে দেশ বিন্দুমাত্রও লাভবান্ হচ্ছে না। এদের ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট এই যে প্রচণ্ড শক্তি, তার হচ্ছে অপব্যবহার, অব্যবহার। বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের প্রতিবাদ কর্ব্বার সময়ে আমরা লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ি, "বিধবারা তপস্বিনী, তাঁরা দেবী," কিন্তু তাঁদের তপস্যার আমরা দেই না এক কড়াও সুযোগ, তাঁদের দেবীত্বের বিকাশে না করি আমরা এককণাও সাহায্য। এই দুর্ভাগ্য থেকে দেশকে উদ্ধার করার নেই? এজন্য তোমাদেরই ভাবতে হবে, এজন্য মেয়েদেরই খাটতে হবে। এখন তোমরা সব ছেলেমানুষ, বিশেষতঃ ঘরের বউ, তোমাদের দ্বারা কাজ এখন বিশেষ কিছু এগুবে না। কিন্তু এই বিষয়ের চিন্তায় তোমাদের অগ্রসর হতে হ'বে। মুক্তির পথ মনে মনে খুঁজতে হবে। কল্যাণের উপায় ধ্যানের বলে বের কত্তে হবে। এক-শ দু-শ তিন-শ বছর পরে যা হবে, তার চিন্তা আজ থেকে আরম্ভ কত্তে হবে।

ব্রহ্মচর্য্য ও সরল মেরুদণ্ড

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় সেবাশ্রমে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেবাশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন,—প্রত্যেক ছাত্রকে মেরুদণ্ড সরল রেখে বস্‌তে উপদেশ দেবেন। সরল মেরুদণ্ডই ব্রহ্মচর্য্যের অর্দ্ধেক।

এই জন্মেই ঈশ্বর-দর্শন চাই

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক জন্মেই মানুষ পাপমুক্ত হ'তে পারে, ভগবদ্‌ভক্ত হ'তে পারে, ঈশ্বর-দর্শন কত্তে পারে। শত, সহস্র, কোটি জন্ম প্রতীক্ষা ক'রে তারপরে ভগবদ্দর্শন কর্ব্বে, এরূপ শম্বুক-গতি সাধনার প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হ'য়ো না। উদ্যম অবলম্বন কর, পৌরুষকে জাগ্রত কর, সমগ্র প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্যত কর আর তাই নিয়ে ভগবানের পরমমঙ্গলময় শক্তিগর্ভ মহানামের সাধনায় ব্রতী হও। কেননা, এই জন্মেই তোমাকে জীবনের পরম পুরুষার্থ অর্জ্জন কত্তে হবে, এই জন্মেই শত জন্মের পাপ-তাপের প্রভাব নির্ম্মূল কত্তে হবে, এই জন্মেই, এই মরণশীল দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই অমৃতত্ব লাভ কত্তে হবে।

প্রতিবেশীর কুশল

রাত্রে জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরদান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি শুধু তোমারই কুশল প্রার্থনা করি না, তোমার প্রতিবেশীদেরও সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল নিয়ত আকুল প্রাণে প্রার্থনা করি। যাহার প্রতিবেশীরা সুখে নাই, তাহার সুখ অতীব ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্ব্বল। প্রতিবেশীদের নিরন্ন জঠর, বিষণ্ন বদন এবং মলিন বস্ত্র তোমার পূর্ণোদর, হাস্যমুখ এবং সজ্জাবিলাসকে নিয়ত উপহাস করে, তাই আমি তোমার কুশলের সাথে সাথে তোমার প্রতিবেশীদেরও কুশল কামনা করি।"

ভাবী-কাল সম্পর্কে সতর্ক লক্ষ্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তর-দান-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরীক্ষা যদিও সত্য সত্যই অনেক দূরে, তথাপি ইহাকে দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহাকে অতীব সন্নিকট বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং সেইভাবে একান্ত তৎপরতার সহিত প্রস্তুত হইবে। স্কুলেই বল, কলেজেই বল, ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রেই বল, আর জাতির জীবনের রণ-কোলাহলেই বল, পরীক্ষাকে নিতান্ত আসন্ন জানিয়া নিয়ত তাহার জন্য প্রস্তুত থাকাই একান্ত প্রয়োজন। বিশ বৎসর পরের ভবিষ্যৎকে যে এখনি সুস্পষ্ট দেখিতে চেষ্টা করিতেছে না, তাহাকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত বলিয়া স্বীকার করিব না। ভাবী কাল সম্পর্কে প্রখর সতর্কতা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের বিশেষত্ব হউক।"

মানুষ হও

"পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য্য হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশীর্ব্বাদ এই যে, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং বিপদে, জয়ে এবং পরাজয়ে, লাভে এবং ক্ষতিতে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হও। সম্পদে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ-কোলাহল নয়, বিপদে আর্ত্তনাদ ও আত্ম-ধিক্কার নয়, প্রয়োজন হইতেছে নিজেকে প্রতি লোমকূপে, প্রতি অণু-পরামাণুতে, প্রতি হৃৎস্পন্দনে, প্রতি পাদক্ষেপে মানুষ বলিয়া, পূর্ণ মানুষ বলিয়া, মহামানব বলিয়া জানা এবং জানিয়া স্থির এবং অবিচল থাকা। তেমন আশীর্ব্বাদ আমি তোমাকে করিতে চাহি। আমি চাহি, তুমি মানুষ হও।"

ভাগ্যকুল
৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন ও স্বাধীন চিন্তা

ভাগ্যকুল হইতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত হ—কাদেরপুর ষ্টেশানে আসিতেছেন। প্রাণায়াম ও ধ্যান-জপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানা প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন,—আসন-মুদ্রা খুবই দরকারী, প্রাণায়ামও সাধন-পথের এক মস্ত বন্ধু। কিন্তু অস্থানে শিখ্‌লে আর অবিধিতে কর্‌লে বিপদ পদে পদে। এখন বরং এসব দিকে দৃষ্টি না-ই দিলে। নিয়মিত ব্যায়াম কর্ব্বে আর উপাসনা কর্ব্বে, এইটাই হ'ল এখনকার পথে শ্রেষ্ঠ নিয়ম। এভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নত হও, কালে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর প্রণালী সব জান্‌তে পার্‌বে। তোমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধিই তখন এমন তীক্ষ্ম ও সুপটু হবে যে, তোমার তখন কিসের দরকার আর কিসের অদরকার, অনায়াসে তা' বুঝ্‌তে পারবে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, বাছা। সব সময় নিজের প্রাণের গতির দিকে তাকিয়ে চল্‌তে হবে। প্রাণ কি চায়, সেইটি বুঝতে শিখ্‌তে হবে। এই যে আমরা ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছি, তার মানে কি জান? এই যে আমরা নানাজনেকে নানাভাবে আত্মোন্নতি সম্বন্ধে বুদ্ধি-পরামর্শ যোগাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পেরেছ? আমরা চাই মানুষের স্বাধীন-বুদ্ধিকে জাগ্রত কত্তে, আমরা চাই, তাদের সুপ্ত-চেতনাকে প্রবুদ্ধ কত্তে। যারা পরের মুখে ঝাল খেয়ে ঠকে, তাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগাতেই আমরা চাই। তোমাদের চিন্তার শক্তি নিজ স্বাধীনতাকে লাভ করুক, তোমাদের কর্ম্মের শক্তি তোমাদের স্বাধীন চিন্তাকে অনুসরণ করুক, তোমাদের স্বাধীন চেষ্টা লক্ষ লক্ষ পরাধীন মনের অধীনতা-বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিক্, এইটাই আমরা চাই।

ব্রহ্মচর্য্য ও স্বদেশসেবা, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুবাদ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিতে লাগিলেন,—

ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে স্বদেশ-সেবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এ সম্বন্ধটা কোথায় রয়েছে জানো? দেশ-সেবার নির্দ্দিষ্ট একটা পদ্ধতিতে তোমাকে পরিচালিত কর্ব্বার জন্যেই ব্রহ্মচর্য্য নয়, তোমার নিজের চেষ্টায় খুঁজে নেবার সামর্থ্য দেবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য। তোমার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ কর্ব্বে, তাই ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে স্বদেশ-সাধনার ঘনিষ্ঠ যোগ। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে গুরুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্য্য বীর্য্যের সাধনা, পৌরুষের সাধনা, স্বয়ম্প্রতিষ্ঠার সাধনা, এ বীর্য্য, এ পৌরুষ, এ স্বয়ম্প্রতিষ্ঠা তোমাকে যেখানে নিয়ে পৌঁছাবার পৌঁছাক, তুমি স্বাধীন মনে স্বাধীন জ্ঞানে নিজের কল্যাণ, নিজের পূর্ণতা আহরণ কর। এর মাঝে গুরুবাদের বস্‌বার জায়গা নেই। সম্প্রদায়-প্রসার কখনো ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

জগন্মঙ্গল ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প ব্রহ্মচর্য্যের এক পরম সাধনা। নিয়ত ভাব্‌তে থাক,—তোমার জন্ম জগতের কল্যাণে। ভাব্‌তে থাক, তোমার জীবন-ধারণ জগতের কল্যাণে, ভাবতে থাক, তোমার মরণও হবে জগতের কল্যাণে। জগতের মঙ্গল ছাড়া তোমার অস্তিত্বই মিথ্যা, তোমার প্রাণ-ধারণই নিরর্থক। ভাব্‌তে থাক, জগতের মঙ্গলই তোমার মঙ্গল, তাতেই তোমার অভ্যুদয়, তোমার সার্থকতা। ভাব্‌তে থাক, জগতের মঙ্গলই তোমার ধ্যান, তোমার জ্ঞান, তোমার

কর্ম্ম। ভাব্‌তে থাক, জগতের মঙ্গলই তোমার ধর্ম্ম, তোমার অর্থ, তোমার কাম, তোমার মোক্ষ। এরূপ ভাবনাতে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। শরীরের প্রতি অঙ্গে মনকে স্থির কর আর ভাব,—"আমি জগতের মঙ্গলকারী।" মস্তিষ্কের মধ্যে ভাব,—"আমি জগতের মঙ্গলকারী", মেরুদণ্ডের মধ্যে ভাব,—"আমি জগতের মঙ্গলকারী"। হস্ত, পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে ভাব—"আমি জগতের কল্যাণকারী।" এ চিন্তা নিবিড় হোক্, ঘনীভূত হোক্। এই চিন্তাই তোমাকে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবে। জগতের মঙ্গলে যার হস্ত, পদ, সর্ব্বশরীর, সে কি কদভ্যাসের দাস থাক্‌তে পারে? জগতের মঙ্গলে যার সর্ব্বস্ব, তার পক্ষে কি অবৈধ বীর্যক্ষয় হতে পারে?

লৌহজঙ্গ

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিবার জন্য লৌহজঙ্গ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক তারপাশা ষ্টেশনে আসিলেন।

সেবকের যোগ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ মাষ্টার, সেবক হওয়া বড় শক্ত কথা। যার তুমি সেবা করবে, মনোভাবে হ'তে হবে তোমাকে তার চেয়ে বিনীত কিন্তু সামর্থ্যের দিক্ দিয়ে তোমাকে হ'তে হবে সর্ব্বপ্রকারে বড়, মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় তোমাকে হ'তে

হবে সর্ব্বপ্রকারে মহৎ। নইলে তুমি তাকে সেবা দেবে কি ক'রে? যার যেটার অভাব, তার সেটার পূরণ করার নামই হ'ল সেবা। যেই জিনিষটার যার অভাব, তাকে সেই জিনিষটা না দিতে পারলে ত' আর সেবা হ'ল না। তোমরা চাচ্ছ সমাজের সেবা কত্তে, মানে, সমাজের যেখানে যে অভাবটুকু আছে, সেইটুকু পূরিয়ে দিতে। কিন্তু যা তোমার নিজের নেই, তা' তুমি দেবে কি ক'রে? যে ধনের তুমি নিজেই অধিকারী নও, সেই ধন তুমি অন্যকে বিলাবে কি ক'রে? তাই, সেবক হ'তে হ'লে আমাদের আগে হ'তে হবে অভাব-পূরণের যোগ্য, আগে আমাদের নিজেদের হ'য়ে নিতে হবে ধনী,—বিজ্ঞানের ধনে ধনী,—গুণের ধনে ধনী, ত্যাগের ধনে ধনী, বৈরাগ্যের ধনে ধনী।

ব্যর্থতার সার্থকতা

শিক্ষক।—আমরা নিজেদের অল্পশক্তি নিয়ে যখন দুর্ব্বলকে শক্তি যোগাতে যাই, আর, তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উদ্দীপিত ক'রে দেবার পরে যখন আর তাকে সাহায্য কত্তে পারি না, তখন সেই নবজাগ্রত দুর্ব্বলের মনে যে প্রবল দ্বেষ আসে, সেটা তার নিজের উপর নয়, সেটা তার উপর, যে গিয়েছিল দুর্ব্বলকে সবল কত্তে, নিদ্রিতকে জাগিয়ে তুল্‌তে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাই ত' হবে বাছা। কিন্তু নিজেদের স্বল্পশক্তির ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও যখন আমরা অন্যকে শক্তি যোগাতে

যাই, তখন ঐ অবশ্যম্ভাবী বিদ্বেষের আঘাত আমাদিগকে দুঃখ দেয় সত্য, কিন্তু সে দুঃখ আমাদিগকে বলীয়ান করে, আমাদের শক্তিমত্তার ক্ষুদ্রত্বকে চূর্ণীকৃত করে, আমাদের সহ্য করার ক্ষমতাকে প্রবর্দ্ধিত করে। সমাজ-কল্যাণ কত্তে গিয়ে যদি আমরা ভুল ক'রে থাকি, অপরাধও ক'রে থাকি, তবু এটা ঠিক যে, আমাদের ভুলটার চাইতে আমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষাটা অধিকতর সত্য। পরোপকার কত্তে গিয়ে যদি আমরা নিজেদের শক্তির অভাব নিয়েও অগ্রসর হ'য়ে থাকি, তবু জেন যে, ঐ অভাব আমাদের যে দুঃখ দেবে, তাতে আমাদের স্বভাবেরই সরোবর কাণায় কণায় পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। আঘাতকে ভয় ক'রো না বাছা, ঠিক্ ঠিক্ সেবক হ'তে হ'লে, সেবা দেবার যোগ্যতা লাভ কত্তে হবে, আঘাত পেয়ে পেয়েই নিজেকে গ'ড়ে নিতে হবে। তোমার অপূর্ণতা একজনের প্রতি সেবাদানে অনধিকারী ক'রে তোমাকে যে সহনাতীত বেদনা দিয়েছে, সেই বেদনাটাই তোমাকে সহস্র জনকে সেবা দান কর্ব্বার ক্ষমতা দেবে, যোগ্যতা দেবে। এ জগতে কোনো জিনিষ অসার্থক নয়, আমাদের প্রতিদিনকার অসাফল্যগুলির পর্য্যন্ত এক একটা সফলতা, এক একটা সার্থকতা আছে।

নাইক প্রাণে ভয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

জন্ম-জোড়া ভুল ক'রেও
নাইক' প্রাণে ভয়,

(আমার) ভুলের মাঝে
নির্ভুলেরই জয়।।
অসত্যের ঐ অন্ধকারে
অন্বেষি' পথ বারে বারে
হোঁচট্ খেয়ে পেয়েছি মোর
সত্য পরিচয়।।
দীর্ঘ দিনের কান্না-কাটি
কর্‌ল আমায় সরল খাঁটি ;
এখন বুঝি, প্রাণের প্রভু
হৃদয় জুড়ে রয়।।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

শ্রীশ্রীবাবামণি বরিশালের ষ্টীমারে চাঁদপুর আসিতেছেন। প্রাতঃকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় এম-এ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদবাবুর একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে সুর-সংগ্রহ-যন্ত্র বাজাইয়া শুনাইলেন। তারপরে আলোচনা হইতে লাগিল।

গুরু কে

এই সঙ্গে বরিশাল-নিবাসী একজন ভদ্রলোক আলোচনায় যোগদান করিলেন। কথাবার্ত্তা ধর্ম্মতত্ত্ব, সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েই হইতে লাগিল। কুমুদবাবু প্রচলিত গুরুবাদের বিরুদ্ধে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে একটী গল্প শুনুন। গল্পটী শুধু গল্প নয়, সত্য ঘটনাও বটে। শিষ্য এসে গুরুকে জিজ্ঞেস্ কল্লেন,—আমার গুরু কে মশাই? গুরু বল্লেন,—তুমিই তোমার গুরু। শিষ্য বল্লেন—কিন্তু আমি যে আমার উপরে সব সময় নির্ভর কত্তে পারি না, দুর্ব্বলতা যে এসে যায়। গুরু বল্লেন,—তখন আমি তোমার গুরু। শিষ্য বল্লেন,—কি ক'রে তা' হবে? একবার আমি আমার গুরু, আর একবার আপনি আমার গুরু, এটা কি রকম? গুরু বল্লেন,—তুমি আর আমি যে অভেদ। শিষ্য বল্লেন,—কিন্তু যখন অভেদ ব'লে বোধ না হবে—আর আপনাকেও বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছা না হবে? গুরু বল্লেন,—তখন ভগবানের নামই তোমার গুরু। শিষ্য বল্লেন,—ভগবানের কোন্ নাম? যে নাম আপ্‌নি দিয়েছেন? গুরু বল্লেন,—তার কোনো মানে নেই। আমি দিই, আর তুমিই আবিষ্কার ক'রে নাও, কিম্বা অন্য কারো কাছেই পাও, তাতে কিছু যায় আসে না। যে নাম পরিত্যাগ করার সামর্থ্য তোমার নেই, সেই নামের কথাই আমি বল্‌ছি। যে নাম পরিহার করার সামর্থ্য তোমার হবে, সে নাম তোমার গুরু নয়, যে নাম যতবারই বর্জ্জন কর না কেন, বাধ্য হ'য়ে পুনরায় তোমাকে নিতে হবে, সেই নামই তোমার গুরু। যে নাম অপরিবর্জ্জ্য, সেই নামই তোমার গুরু,—সে নাম কোথা থেকে পাচ্ছ, কি ভাবে পাচ্ছ, তার কোনও সর্ত্ত চুক্তি নেই। শিষ্য জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—কি ক'রে বুঝব, কোন্ নাম

অপরিহার্য্য? গুরু বল্লেন,—বর্জ্জন ক'রে পরীক্ষা কর। যিনি পরীক্ষায় টিকবেন, তিনিই তোমার গুরু।

সদ্‌গুরু ও যোগ্য শিষ্যের দুর্ল্লভতা

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কুমুদবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই গুরু-শিষ্যের গল্প বল্লাম, তাদের মধ্যে প্রচলিত স্থূল গুরুবাদ আছে ব'লে আপনার মনে হয় কি?

কুমুদবাবু।—তা' মনে হয় না, কিন্তু এরূপ গুরু মিলবে ক'জন?

বরিশাল-নিবাসী ভদ্রলোক বলিলেন,—শুধু গুরুর দোষ দিলেই চ'লবে না, সদ্‌গুরু পাবার মত যোগ্য শিষ্যই বা ক'জন হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সদ্‌গুরু ও যোগ্য শিষ্য উভয়ই সমান দুর্ল্লভ। কত গুরু কেঁদে ম'চ্ছেন "যোগ্য শিষ্য পাচ্ছি না।" কিন্তু একদিন যখন যোগ্য শিষ্য জুটল, তখন শিষ্যের খাপ-খোলা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণধার চরিত্র-বলের কাছে ম্লান দীপ্তিহীন হ'য়ে গুরুদেব প্রাণ নিয়ে পালালেন জঙ্গলে। আবার কত শিষ্য কেঁদে ম'চ্ছেন, "যোগ্য গুরু পাচ্ছি না," কিন্তু যেদিন গুরু মিল্‌ল, সেদিন নিজেকে প্রতিপদে তাঁর অযোগ্য জেনে, তাঁর আদেশ পালনে অক্ষম বুঝে, শিষ্য সু-কৌশলে স'রে পড়লেন। শুধু স'রেই পড়লেন, তা'নয়, যাবার সময় সহরময় ঢেঁড়া পিটিয়ে গেলেন যে, গুরুদেব দারুণ ক্রোধী, অবিবেচক, শিষ্যদের

কষ্ট বুঝেন না, কাজের পরে কাজ চাপিয়ে শিষ্যের প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন, গুরুদেব নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ, নির্দ্দয়তার সিদ্ধ-তাপস। কথায় বলে,—গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক, কেউ বলেন,—চেলা মিলে লাখ লাখ, গুরু না মিলে এক। দুটো কথাই সমান সত্য জানবেন।

চাঁদপুর

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

ত্যাগী শিষ্যের বিষয়ী গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর আছেন। তাঁদের এক স্নেহভাজন ভক্ত আসিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্নাদি করিতেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারী নিয়ে যিনি ব্যস্ত, ত্যাগ-বুদ্ধি ব্যক্তি যদি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তবে তার বড় বিপদ।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপদ কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিপদ হচ্ছে সংশয়ের। গুরুবাক্যে নিঃসংশয়িত বুদ্ধি না থাকলে সাধারণ লোকের পক্ষে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া বড় কঠিন। বিষয়ী গুরুর জীবনে নানা অসামঞ্জস্য দেখে ত্যাগেচ্ছু শিষ্য বিষম সংশয়ে প'ড়ে যায়, তাতে তার অনেক সময়ে ভয়ানক ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। তবে, যাঁরা একান্ত সাধন-বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষে পৃথক্ কথা। তাঁরা গুরুর কাছে সাধন পেয়ে ঐ সাধনকেই গুরু ব'লে মনে করেন এবং একান্ত চিত্তে সাধনই কত্তে থাকেন, গুরুর পানে ফিরেও তাকান না।

এদের আর গুরুর সঙ্গে সাধন পাবার পরে বড় একটা সম্পর্কই থাকে না।

গুরু-ত্যাগ

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই বিপদ অতিক্রম করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উপায় হচ্ছে, ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি যদি কাউকে প্রাণের জন ব'লে চিনিয়ে দেন, তবে তাঁর সহায়তা নেওয়া।

ভক্ত।—এতে গুরুত্যাগের অপরাধ হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ব্রহ্মই গুরু, মানুষ ত' আর গুরু নন। সেই পরমগুরুকে লাভ করার জন্যই মানুষকে গুরু ব'লে মান্‌তে যাওয়া। যাঁকে গুরু ব'লে মান্‌লে পরম-গুরুকে পাওয়ার পথ হয়, তাকেই শধু গুরু ব'লে মান্‌ব, তাঁর কাছেই শুধু মাথা নত কর্ব্ব। যাকে গুরু ব'লে মানলে পরম-গুরুকে পাওয়া যায় না, তাকে মান্‌ব না, তার কাছে মাথা নত করব না। পরমগুরুকে পাব না বুঝেও যদি কেউ মানুষ-গুরুর সেবা করে, তবেই সে প্রকৃত পক্ষে গুরু-ত্যাগী। আর, পরম-গুরুকে পাব না জেনে যদি কেউ মানুষ-গুরুকে ত্যাগ করে, তাকে গুরু-ত্যাগী বলে না, তাকেই বল্‌তে হয় প্রকৃত গুরু-নিষ্ঠ। পরমগুরুর সাথে যখন মানুষ-গুরুর লড়াই হবে, তখন পরম-গুরুই গুরু, মানুষ-গুরু কিছুই নন্।

বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য

আলোচনা চলিতে থাকিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য কথাটা শিষ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক হ'লেও গুরুর পক্ষে লাভজনক। শিষ্যের ত্যাগোন্মুখ জীবনের প্রভাব গুরুকে নির্ব্বিষয় হবার প্রেরণা দেয়। গুরুর কাছ থেকে যেমন শিষ্যের লভ্য আছে, শিষ্যের কাছ থেকেও গুরুর তেমন লভ্য আছে। সেই দিক থেকে বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য থাকা গুরুর পক্ষে অধ্যাত্ম-সম্পদ-বর্দ্ধক। যেখানে গুরু-গিরি একটা ব্যবসায় বা আর্থিক আয়ের পন্থা, সেখানকার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু যেখানে পথনির্দ্দেশহীন পথিকের হিতার্থেই দীক্ষাদান ও সাধন-কৌশলাদি শিক্ষা-প্রদান গুরুর লক্ষ্য, সেখানে বিষয়ী গুরু ত্যাগ-বুদ্ধি সুপাত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজেও ক্রমশঃ ত্যাগ-বুদ্ধির প্রতি প্রাণের অনুরাগ উপলব্ধি করেন। অবস্থার ফেরে বাহ্য ত্যাগ তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলেও আভ্যন্তর ত্যাগের অনুকূলতা সৃষ্টি হ'তে থাকে। এটা বিষয়ী গুরুর মস্ত লাভ।

প্রচলিত গুরুবাদের ফরমূলা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশপ্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান গুরুবাদের মূল ফরমূলা হচ্ছে, গুরুই ব্রহ্ম, গুরুই ইষ্ট, গুরুই মহামন্ত্রের অভেদ-বিগ্রহ। এই 'ফরমূলা'র ফল হ'য়েছে এই যে, ব্রহ্মাভিমানী গুরু ত্যাগী শিষ্যের ভিতরে অনেক সময়েই মানব-গুরুতে ব্রহ্মভাবার্পণ জাগ্রত কত্তে পাচ্ছেন না।

প্রচলিত ফরমূলার পরিবর্ত্তনে বিপ্লব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বহুপ্রচলিত এই "ফরমূলার" পরিবর্ত্তন হওয়া মাত্র, রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তন ঘ'টে যাবে, ভারতের ধর্ম্মজীবনে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ মহাবিপ্লব এসে যাবে। দীক্ষাদাতাই গুরু নন্, দীক্ষাদাতা সমপথের অগ্রসর পথিক মাত্র, এই ধারণা প্রত্যেকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। ফলে মহামন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে নিজেকে একান্তভাবে নামেরই শরণাগত কর্ব্বার জন্য সবাই চেষ্টা কর্ব্বে এবং দীক্ষাদাতার ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটীর বিবেচনা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হবে। সেই সময়ে শত শত বিষয়ী আচার্য্য নিঃসঙ্কোচে ত্যাগবুদ্ধি পথনির্দ্দেশহীন পথিককে মহামন্ত্র দান ক'রে সুস্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিতে পারবেন,—এই রইলেন তোমার সমক্ষে জ্বলদগ্নিসমপ্রভ স্বতেজোদীপ্যমান্ পরমপবিত্র মহামন্ত্র তোমার এক ও অদ্বিতীয় গুরুরূপে—আর কাউকে গুরু ব'লে মান্‌বার বা ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই।"

ত্যাগী-গুরুর বিষয়ী-শিষ্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্যাগী গুরুর বিষয়ী-শিষ্য থাকাও এক কম আপদ নয়। যে যার সঙ্গ করে, সে তার দোষগুণ পায়। বিষয়ী শিষ্য ত্যাগী গুরুর সঙ্গ পেয়ে ত্যাগের দিকে আকৃষ্ট হন, আবার ত্যাগী-গুরু বিষয়ী-শিষ্যের সঙ্গগুণে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই জন্যই দেখা যায়, অনেক

ত্যাগীরা গৃহীদের পাত্তাই দেন না। তবে যাঁর ত্যাগ একেবারে পাকা, কারো সংসর্গেই তাঁর বিকার বা পরিবর্ত্তন আসে না। কিন্তু উন্নতির ত' অন্ত নেই। যেই যত অগ্রসর হোন্, আরো সম্মুখে যেতে হবে। যিনি যত উচ্চ উপলব্ধির অধিকারী হোন্, আরও উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অমৃতত্বের ভাণ্ডার অক্ষয়, একটী জিভ দিয়ে চেটে চেটে কে তার ক্ষয় বিধান কর্ব্বে? সুতরাং কোনো ত্যাগীরই নিজেকে পূর্ণ ত্যাগী ব'লে মনে করা উচিত হয় না। সুতরাং জীবের হিতকল্পে কাউকে দীক্ষা দিলেও সর্ব্বত্যাগীরও নিজের উপর "গুরু" অভিমান রাখা চ'ল্‌বে না। শিষ্যের পাপ-তাপ গুরুকে পায়। নিজের ভিতর 'গুরু'-অভিমান না থাক্‌লে সব পাপতাপ জগদ্‌গুরু পরমব্রহ্মে গিয়ে লয় পায়, দীক্ষা-দাতাকে ছোঁয়ও না।

ভগবানে সমর্পণই কামার্ত্ততার প্রতীকার

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি ধ্যানাদি সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, রাস্তার পাশে একটী যুবক পায়চারী করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি অগ্রসর হইতেই যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। যুবক আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—আমার বড় বিপদ, আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বিপদ রে?

যুবক।—আমাদের পাড়ার একটি বয়স্কা মেয়েকে নষ্ট করার জন্য অনেকগুলি অসচ্চরিত্র যুবক চেষ্টা কচ্ছিল। আমার আপ্রাণ

প্রচলিত ফরমূলার পরিবর্ত্তনে বিপ্লব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বহুপ্রচলিত এই "ফরমূলার" পরিবর্ত্তন হওয়া মাত্র, রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তন ঘ'টে যাবে, ভারতের ধর্ম্মজীবনে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ মহাবিপ্লব এসে যাবে। দীক্ষাদাতাই গুরু নন, দীক্ষাদাতা সমপথের অগ্রসর পথিক মাত্র, এই ধারণা প্রত্যেকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। ফলে মহামন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে নিজেকে একান্তভাবে নামেরই শরণাগত কর্ব্বার জন্য সবাই চেষ্টা কর্ব্বে এবং দীক্ষাদাতার ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটীর বিবেচনা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হবে। সেই সময়ে শত শত বিষয়ী আচার্য্য নিঃসঙ্কোচে ত্যাগবুদ্ধি পথনির্দ্দেশহীন পথিককে মহামন্ত্র দান ক'রে সুস্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিতে পারবেন,—এই রইলেন তোমার সমক্ষে জ্বলদগ্নিসমপ্রভ স্বতেজোদীপ্যমান্ পরমপবিত্র মহামন্ত্র তোমার এক ও অদ্বিতীয় গুরুরূপে—আর কাউকে গুরু ব'লে মান্‌বার বা ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই।"

ত্যাগী-গুরুর বিষয়ী-শিষ্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্যাগী গুরুর বিষয়ী-শিষ্য থাকাও এক কম আপদ নয়। যে যার সঙ্গ করে, সে তার দোষগুণ পায়। বিষয়ী শিষ্য ত্যাগী গুরুর সঙ্গ পেয়ে ত্যাগের দিকে আকৃষ্ট হন, আবার ত্যাগী-গুরু বিষয়ী-শিষ্যের সঙ্গগুণে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই জন্যই দেখা যায়, অনেক

ত্যাগীরা গৃহীদের পাত্তাই দেন না। তবে যাঁর ত্যাগ একেবারে পাকা, কারো সংসর্গেই তাঁর বিকার বা পরিবর্ত্তন আসে না। কিন্তু উন্নতির ত' অন্ত নেই। যেই যত অগ্রসর হোন্, আরো সম্মুখে যেতে হবে। যিনি যত উচ্চ উপলব্ধির অধিকারী হোন্, আরও উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অমৃতত্বের ভাণ্ডার অক্ষয়, একটী জিভ দিয়ে চেটে চেটে কে তার ক্ষয় বিধান কর্ব্বে? সুতরাং কোনো ত্যাগীরই নিজেকে পূর্ণ ত্যাগী ব'লে মনে করা উচিত হয় না। সুতরাং জীবের হিতকল্পে কাউকে দীক্ষা দিলেও সর্ব্বত্যাগীরও নিজের উপর "গুরু" অভিমান রাখা চ'ল্‌বে না। শিষ্যের পাপ-তাপ গুরুকে পায়। নিজের ভিতর 'গুরু'-অভিমান না থাক্‌লে সব পাপতাপ জগদ্‌গুরু পরমব্রহ্মে গিয়ে লয় পায়, দীক্ষা-দাতাকে ছোঁয়ও না।

ভগবানে সমর্পণই কামার্ত্ততার প্রতীকার

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি ধ্যানাদি সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, রাস্তার পাশে একটী যুবক পায়চারী করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি অগ্রসর হইতেই যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। যুবক আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—আমার বড় বিপদ, আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বিপদ রে?

যুবক।—আমাদের পাড়ার একটি বয়স্কা মেয়েকে নষ্ট করার জন্য অনেকগুলি অসচ্চরিত্র যুবক চেষ্টা কচ্ছিল। আমার আপ্রাণ

চেষ্টায় মেয়েটি ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের মাঝ থেকে মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচেছে। সে অবধি আততায়ী পক্ষ ঐ মেয়েটিকে জড়িয়ে আমার নামে নানা কদর্য্য কথা প্রচার কচ্ছে। প্রথম আমি ওসব গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু ওদের অপবাদগুলি শুনে শুনে ঐ মেয়েটার উপরে আমার এমন এক ভয়ানক কামার্ত্ততা জন্মেছে। নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখ্‌তে পাচ্ছি না, দিনের পর দিন কেবল লালসার জালেই জড়িয়ে পড়ছি। এখন কি করি বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তুমি প্রাণপণ বলে ভগবানের নাম জপ কত্তে থাক, জীবনটাকে একেবারে ভগবানময় ক'রে নাও। বস্‌তে, দাঁড়াতে, শুতে, চল্‌তে সম সময় ভগবানকে স্মরণ কত্তে থাক। প্রাণের কামার্ত্ততা ভগবানের পায়ে উপহার দাও। ভক্ত যেমন নিঃসঙ্কোচ চন্দনসিক্ত পুষ্পবিল্বপত্র দেব-বিগ্রহের পায়ে দেয়, তুমি তোমার লালসাগুলি তেমনি নিঃসঙ্কোচে ভগবানের পায়ে অঞ্জলি দিতে থাক। কাম এলে বল,—"ভগবান্, এ কাম তোমার পায়েই দিলাম।" যাকে নিয়ে তোমার এ অধীরতা,—তার মুর্ত্তিটি মনে হ'লেই বল,—"ভগবান্ এ নারীমূর্ত্তি তোমার পায়েই দিলাম, তুমি ওকে গ্রহণ কর।" আর যতক্ষণ জাগ্রত থাক, ততক্ষণ এমন কোনও না কোনও সৎকাজে লেগে থাক, যাতে কঠোর পরিশ্রম কত্তে হয়।

মাতৃমন্ত্র মহৌষধ

যুবক।—কিন্তু আমার বিপদ যে আরো বেশী। এত বেশী

যে, ব'লে পাচ্ছি না। আমার এক যুবতী ভ্রাতৃবধূ আমার সঙ্গে তরল রহস্যালাপ কচ্ছেন। আমি বাধা দিলেও মানেন না। আমার কিন্তু মন তাতে আরো খারাপ দিকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিছুদিনের জন্য কি তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক্‌তে পার না? পড়াশুনার ক্ষতি কয়েক দিন হ'ল, তাতে কিছু আসে যায় না। চরিত্ররক্ষার জন্য পড়াশুনা ত্যাগ করা যায়।

যুবকটি তাহার এমন সব অসুবিধা ও বৈষয়িক বিপদের কথা বলিলেন, যাহাতে তাহাকে স্থান-ত্যাগের পরামর্শ কিছুতেই দেওয়া যায় না। তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক কাজ কর। পড়াশুনার সহস্র ক্ষতি ক'রেও খুব জোরসে সাধন-ভজন চালাও, আর, যে মেয়েটীর উপরে তোমার মন্দ ভাব যাচ্ছে, তাঁকে এবং তোমার বৌদিকে 'মা' ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ কর। 'মা' ব'লে ডাক, আর 'মা' ব'লে ভাব, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে যাবতীয় নিষ্প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতার বর্জ্জন কর। প্রাণপণে সাধন-ভজন কর, আর তাঁদের প্রতি মাতৃবোধকে নিয়ত পুষ্ট কত্তে থাক। মা ও ছেলের সম্বন্ধের পবিত্রতা নিয়ত ধ্যান কর। যে মেয়েটীর কথা প্রথমে বল্লে, তার প্রতি ভাল ভাব তোমার দুদিনেই এসে যাবে কোনো ভয় ক'রো না, শুধু তীব্র সঙ্কল্প নিয়ে কাজ ক'রে যাও। তুমি তাঁরই রক্ষার জন্য বিপন্ন, ভগবান্ তোমার বিপদ দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কাটিয়ে দিবেন। শুধু বিপদ-ভঞ্জনের শরণাপন্ন হও। কিন্তু বৌদিকে দিয়েই তোমার বিপদ বেশী।

তাই, বারংবার তাঁকে তোমার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে,—তিনি তোমার মা, তুমি তাঁকে মায়ের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, নিজেকে তুমি তাঁর গর্ভজাত সন্তানের মত মনে কর। তোমার শিষ্টাচারের দ্বারা বারবার তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি যখন তাঁর কাছে থাক, তখন একটি সন্তান তার মায়ের কাছে থাকে, তুমি যখন তাঁর সাথে কথা বল, তখন একটি সন্তান তার মায়ের সাথে কথা বলে, তুমি যখন তাঁর পানে তাকাও, তখন একটি সন্তান তার মায়ের মুখের পানে তাকায়। বারংবার তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে, তাঁর মুখখানা তোমার মায়ের মুখের মত, তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার মায়ের কণ্ঠস্বরের মত, তাঁর পবিত্রতা তোমার মায়ের পবিত্রতার মত। দেখো, আপনি তাঁর রহস্যালাপ থেমে যাবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁকে প্রণাম করা আরম্ভ কর আর যখনি কোন তরল কথা তিনি তুল্‌তে চাইবেন, অম্‌নি তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন ক'রে বল যে, সন্তানের সঙ্গে মা কখনো এসব কথা আলোচনা করে না। দেখো, লজ্জা পেয়ে তাঁর তারল্য স্বব্ধ হ'য়ে যাবে। মাতৃমন্ত্র জগতের এক অপূর্ব্ব মন্ত্র, বিশ্বাস কর, "মা" "মা" বল্‌তে বল্‌তেই তুমি এই ঘোর সংগ্রামে জয়ী হবে। "জয় মা" "জয় মা" ব'লে মেদিনী কাঁপাও, আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ ক'রে দাও।

মা-ডাকের শক্তি

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ঘরে ঘরে আজ

অসতী নারীর দল অসংযমের বিষ ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাই বলে কি আমরা সব ভয়ে পালিয়ে যাব? আমাদের জীবনের কল্যাণ দিয়ে এদের জীবনের অকল্যাণকে কি দূর কর্ব্ব না? আমাদের জীবনের শুদ্ধতা দিয়ে এদের জীবনের অশুদ্ধতাকে কি বিনষ্ট কর্ব্ব না? নিশ্চয়ই কর্ব্ব এবং তা' করার শক্তি আমরা পাব মাতৃমন্ত্র থেকে। "মা"-ডাক রাক্ষসীর রক্ত-পানেচ্ছার গতিরোধ কর্ব্বে। "মা"-ডাক নাগিনী-যোগিনীর উন্মত্ত নৃত্য থামিয়ে দেবে। "মা"-ডাক ডাকিনীর মোহিনী বিদ্যা স্তম্ভিত ক'রে দেবে।

চাঁদপুর

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী

জনৈক যুবক অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে আসিয়া বসিয়া আছেন। ধ্যান-জপাদির পর শ্রীশ্রীবাবামণি বাহিরে আসিলে যুবক বলিলেন,—একবার ভোগ ক'রে নিতে না পার্ল্লে ইন্দ্রিয়-সংযম কি সম্ভব হয় বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সম্পূর্ণ সম্ভব। ধ্যান-জপে ভোগাসক্তি নাশপ্রাপ্ত হয়।

যুবক।—তবে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তাঁর গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে নেবার জন্যে ঘরে ফিরিয়ে পাঠালেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে কি ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্যে?

যুবক।—জীবনী-গ্রন্থে তাই লিখেছে।

সঙ্গ-লিপ্সা ও আসঙ্গ-লিপ্সা

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তারা ভুল লিখেছে। যে সময় ব্রহ্মচারীকে তার গুরু বাড়ি ফিরিয়ে পাঠালেন, সে বয়সে কোনো বালক-বালিকার ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না। সুতরাং ভোগের পূর্ণ আস্বাদও অসম্ভব। ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার জন্যেই যদি গুরু লোকনাথকে বাড়ী পাঠাবেন, তাহ'লে ইন্দ্রিয়ের বিকাশের সময়েই পাঠাতেন। কারণ, বিকশিত ইন্দ্রিয়ই ভোগের পূর্ণ আস্বাদন দিতে পারে। কিন্তু তা' না ক'রে তিনি তাঁকে পাঠালেন নিতান্ত বালক-বয়সে। সুতরাং বুঝতেই হবে যে, লোকনাথকে ঘরে ফিরিয়ে পাঠাবার উদ্দেশ্য তাঁর অন্য প্রকার ছিল। আরো একটা দিক্ দেখ্‌তে হবে যে, লোকনাথের গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী একটা কচি খোকা ছিলেন না। দশ সহস্র বৎসর ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ক'রেও রাজা যযাতির ভোগতৃষ্ণা দূর হ'ল না বরং উত্তরোত্তর বেড়েই গেল, একথা ভগবান্ গাঙ্গুলী জানতেন। সুতরাং তিনি লোকনাথকে ভোগ ক'রে ভোগ-তৃষ্ণাকে দূর কর্ব্বার জন্যে ঘরে ফিরিয়ে কিছুতেই পাঠাতে পারেন না। গুরুর কাছে শিষ্য যে কি জিনিষ, সে কথা জীবনী-লেখকেরা কি বুঝবে? গুরু যক্ষের মত সতর্কভাবে শিষ্যের নির্ম্মল চরিত্রকে রক্ষা করেন,—তিনি কি নিজ হাতে শিষ্যকে ইন্দ্রিয়-লালসার হলাহলে ফেলে দিতে

পারেন? লোকনাথ গুরুর কাছে এসে সাধনে অমনোযোগিতা দেখাচ্ছিলেন, বাড়ীতে তিনি যে সঙ্গিনীদের সাথে সর্ব্বদা থাকতেন, তাদের সঙ্গ-ছাড়া হ'য়ে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছিল। তাই, গুরু তাঁকে বাড়ী পাঠিয়েছিলেন। কারণ, সঙ্গের স্মৃতি বড় বিষম জিনিষ, সুকৌশলে এই স্মৃতিকে ম্লান না কত্তে পার্লে সাধনে অভিনিবেশ বড় শক্ত কথা। চিরবিরহ এই স্মৃতিকে অনেক সময় একেবারে অমর ক'রে রাখে। লোকনাথের গুরু ছিলেন পাকা খেলোয়াড়, তিনি সখ্য-বন্ধনটাকে সুকৌশলে ভেঙ্গে দিয়ে লোকনাথের মনটাকে ভগবৎ-সাধনে একাগ্র ক'রে দেবার জন্যেই সখীর সাথে চির-বিরহের ব্যবস্থা না ক'রে দ্বিতীয়বার উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের একটা সুযোগ দিলেন। কিন্তু গুরুর কাছে থাকতে যার জন্য লোকনাথের প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছিল, তার কাছে এসে কিন্তু আর সে ব্যাকুলতা রইল না। এক দিকে এই মিলনটা বিরহের তীব্র আকর্ষণকে দিল নষ্ট ক'রে আর এক দিকে গুরুর স্নেহ, গুরুর ভালবাসা, লোকনাথের হৃদয় অজ্ঞাতসারেই জয় কচ্ছিল। ফলে, তিনি দ্বিতীয়বার যে গুরুর কাছে গেলেন, সেটা নিজেরই প্রাণের টানে, কারো আদেশ বা উপদেশে নয়। ভোগ-লিপ্সা লোকনাথের সাধনের তত বড় বিঘ্ন ছিল না, যত বড় বিঘ্ন ছিল ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকার লোভ। গুরু লোকনাথকে সঙ্গ-লিপ্সার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই ঘরে পাঠিয়েছিলেন, সম্ভোগের দ্বারা আসঙ্গ-লিপ্সা দূর করা কখনো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনে শিক্ষণীয়

যুবক।—কিন্তু জীবনী-গ্রন্থে যে ভাবে লিখেছে, তাতে বারদীর ব্রহ্মচারীর দৃষ্টান্ত আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আমার মনের মধ্যে এই একটা কথা বাসা বেঁধে ব'সে আছে যে, সম্ভোগ ছাড়া কামের নিবৃত্তি নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তোমরা সে-ভাবে নাও কেন? বারদীর ব্রহ্মচারীকেও ভোগ ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ কত্তে হয়েছিল, এই খামাখা কথাটাকে বারংবার চিন্তা না ক'রে বরং এই কথাটা ভাব না কেন যে, লোকনাথেণর মত একটা ভোগ-লুব্ধ বালকও কতবড় একজন অসামান্য মহানুরুষে পরিণত হ'তে পারেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্চর্য্য জীবন থেকে তোমরা উৎসাহ সংগ্রহ ক'রে নাও যে, তোমরাও অনায়াসে রিপুজয়ী মহাবীর হ'তে পার্ব্বে। কৈশোরের লোকনাথ তোমাদেরই মত একজন সামান্য মানুষ ছিলেন, আর একদিন তিনিই হলেন অসাধ্য-সাধনকারী মৃত্যুঞ্জয় মহাযোগী। লোকনাথের জীবন থেকে তোমরা এই পরম সত্যকে শেখ, সাধারণ মানুষই ত' তপস্যার বলে অসাধারণ হয়, দুর্ব্বল মানুষই দুর্জ্জয় সাধনায় মহামানব হয়। বাল্যাবধি আমি লোকনাথকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছি। আমার জীবনের উপরে লোকনাথের প্রভাব অকথনীয়। লোকনাথকে দেখেছি আমি পুরুষকারের জ্বলন্ত মহিমারূপে। যদিও আমি চর্ম্মচক্ষে তাঁকে কখনো দেখিনি, কিন্তু আমার জীবনের উপরে তাঁর দান অপরিসীম। লোকনাথের জীবন

থেকে উপদেশ নিয়ে তোমরা এই পুরুষকারের মহিমাতে বিশ্বাসবান্ হও, আত্মশক্তিতে সকল শত্রু জয় কর।

ব্যায়াম, শয়ন

দ্বিপ্রহরে দুইটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্বাভিমুখী রওনা হইলেন। ট্রেণে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, প্রাতঃকালের যুবকটিও আসিয়াছেন। যুবক কয়েক ষ্টেশন গিয়াই যে ষ্টেশনে ফেরৎ গাড়ির সহিত ক্রসিং হইবে, সেখানে নামিয়া চাঁদপুর চলিয়া আসিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীবাবামণির আরও উপদেশ পাওয়া।

যুবক।—এত ব্যায়াম করি, তবু অজ্ঞাতসারে বীর্য্যক্ষয় বন্ধ হ'চ্ছে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অত্যাধিক ব্যায়াম ক'রো না, আস্তে আস্তে বাড়াও।

যুবক।—কোন কোন দিন সারাদিনই মনটা পবিত্র থাকে, কিন্তু বিছানায় প'ড়লেই যত কুচিন্তা।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্বেচ্ছায় কখনো শয্যাশায়ী হবে না। শয্যায় ব'সে নাম জপ কত্তে কত্তে স্বতঃনিদ্রা না এলে শোবে না।

যুবক।—আলস্য দূর করি কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিয়ম কর, দৌড়ান সম্ভব হ'লে হাঁটবে না, হাঁটা সম্ভব হ'লে দাঁড়াবে না, দাঁড়ান সম্ভব হ'লে বসবে না, বসা সম্ভব হ'লে শোবে না। এই নিয়মটী পালন কর্ব্বার চেষ্টা কত্তে কত্তেই আলস্য দূর হ'য়ে যাবে।

সৎসাহস

যুবক।—আমার একটি বন্ধু আপনার কাছে একটা উপদেশ চেয়েছেন! তাঁর বাবা বাড়ীতে কতগুলি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের ছবি এনে টানিয়ে রেখেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাকে বলো, সে যেন ঐ ছবিগুলো সব ফেলে দেয়।

যুবক।—কিন্তু তার বাপ ভয়ানক লোক। বোধ হয় এ অপরাধে তাকে মেরে খুন কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' করুন, কিন্তু তাও সহ্য কত্তে হবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে হ'লে সৎসাহস চাই। নির্ভীক না হ'লে কেউ কখনো সাধনায় সিদ্ধিলাভ কত্তে পারে না।

ধর্ম্মগনর, ব্রিটিশ ত্রিপুরা
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

জাতিভেদের স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরত্ব

গয়ানাথ মাষ্টার নামক জনৈক ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষে মানুষে ভেদও আছে, অভেদত্বও আছে। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে যিনি বাস করেন, সেই একজনকে নিয়েই সব মানুষের মানুষত্ব, তাই সব মানুষই সমান। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজস্ব বিচিত্রতা র'য়েছে, তাই মানুষে মানুষে পার্থক্য। মানুষের এই সমত্বকে যেমন শত চেষ্টা ক'রেও দূর করা যাবে না, এই অসমত্বকেও তেমন দূর করা অসম্ভব। এই সমত্বও

যেমন স্বতঃসিদ্ধ, এই অসমত্বও তেমন স্বতঃসিদ্ধ।

গয়ানাথ মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—জাতিভেদ তাহ'লে চিরস্থায়ী?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এক হিসাবে যেমন চিরস্থায়ী আর এক হিসাবে তেমনি অচিরস্থায়ী। বৈচিত্র্যভেদ যদি জাতিভেদের মূল হয়, তবে এটা নিত্য। সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা যদি জাতিভেদের মূল হয়, তবে এটা ক্ষণভঙ্গুর।

জাতিভেদের অদৃষ্ট-নির্ণয়

গয়ানাথ।—বর্ত্তমান জাতিভেদ কি কখনও ভাঙ্গবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভাঙ্গতে বাধ্য। তবে, যার তার হাতে ভাঙ্গবে না। জাতিভেদ মানুষেই গ'ড়েছিলেন, মানুষেই ভাঙ্গবেন, অমানুষে পারবে না। যিনি ভাঙ্গার সাথে সাথেই গড়তে জানেন, তেমন শিল্পী পুরুষেরাই জাতিভেদ ভাঙ্গবেন, যা' তা' বাজে লোকেরা কিছু কত্তে পার্ব্বে না।

গয়ানাথ।—জাতিভেদ ভাঙ্গতে গেলে বিশৃঙ্খলারও কি সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব আছে। এই জন্যই যিনি অরাজকতার মধ্যেও সুরাজ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে পার্ব্বেন না, তিনি জাতিভেদ ভাঙ্গতে গিয়ে বিফল-মনোরথই হবেন। তাই, আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে,—মনুষ্যত্ব। যে জাতির হই, যে বর্ণের হই, যে বংশের হই, আমরা মানুষ হচ্ছি কিনা এইটাই হচ্ছে সব কথার সেরা

কথা। মানুষ যদি হ'তে পারি, তা' হ'লে জাতিভেদের অদৃষ্ট-নির্ণয় আমরা পাঁচ মিনিটে ক'রে ফেল্‌তে পার্ব্ব।

মনুষ্যত্বের পন্থা

গয়ানাথ।—কিন্তু মনুষ্যত্বের পন্থা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মনুষ্যত্বের পন্থা স্বাধীনতা, কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতা। ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যাক্ কিম্বা আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক্ তবু আমার চিন্তাকে, আমার চেষ্টাকে, আমার আদর্শকে আমার ধর্ম্মজ্ঞানকে, আমার হিতাহিত-বুদ্ধিকে পরের অধীন কর্ব্ব না,—এই জিদ্‌ই হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। অমুক দার্শনিক ভাব্‌ছেন, পৃথিবীটা ঘোরতর শ্মশান, আর মানুষগুলো সম মৃত্যু-কঙ্কাল, অতএব আমাকেও এই রমকই ভাব্‌তে হবে, তা' নয় ; আমি স্বাধীন মতে ভাবব। অমুক নামজাদা কর্ম্মী গাছে কাঁঠাল থাক্‌তেই গোঁফে তেল দেন, অতএব, আমাকেও এই রকমই কত্তে হবে, তা' নয়; আমি আমার স্বাধীন রুচি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ব্ব। অমুক মহাপুরুষ ব'লেছেন, গাঁজায় দম দিলে ভগবৎ-প্রেম বাড়ে, অতএব আমাকেও সেই কথাই শুন্‌তে হবে, তার কোনো মানে নেই ; আমি আমার জীবনাদর্শ নিজের স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা বেছে নেব। অমুক ঠাকুর ব'লেছেন, শীতলা ঠাক্‌রুণের পূজো কত্তে হবে, নইলে স্বরাজ মিলবে না, অতএব আমি তাই কত্তে ব'সে যাব, তা' নয় ;—আমি চল্‌ব আমার নিজের প্রাণের নির্দ্দেশ শুনে। অমুক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে মুক্তি হবে না, সুতরাং

আমি সেইটাই বেদবাক্য ব'লে মেনে নেব, তা' নয় ; আমার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে আমার আত্মার কুণ্ঠাহীন আনন্দের মুখ চেয়ে। সর্ব্বত্র যে লজ্জাহীন স্বাধীনতা, সঙ্কোচহীন স্বাধীনতা, এইটাই হ'ল মনুষ্যত্বের রাজ্যে প্রবেশ কর্ব্বার সিংহ-দুয়ার।

স্বাধীনতার স্বরূপ

গয়ানাথ।—কিন্তু সবাই যদি স্বপ্রধান হয়, তাতে কি ঘোরতর অনৈক্যের সৃষ্টি হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যথার্থ স্বাধীনতা অনৈক্য সৃষ্টি করে না, প্রত্যেকের নিজস্ব বৈচিত্রকে পূর্ণরূপে বিকশিত ক'রে দেয় মাত্র। স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রধান সর্ত্তই হ'চ্ছে পরমতে সহিষ্ণুতা। যেখানে দেখ্‌বে স্বাধীনতার সঙ্গে পরমতে অসহিষ্ণু বিদ্বিষ্ট ভাব রয়েছে, সেখানেই বুঝবে খাঁটি স্বাধীনতার উপাসনা হয় নি, গোঁড়ামিরও ভেজাল সঙ্গে আছে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

স্ত্রী-শিক্ষা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি উক্ত পল্লীর জনৈক কর্ম্মীকে বহুবিধ ব্যক্তিগত উপদেশ-দানের পরে বলিলেন,—স্ত্রীকে আগে লেখাপড়া শেখাও। কারণ, অশিক্ষিতের ভিতরে উচ্চভাব স্থায়ী ক'রে রাখা বড় সহজ নয়। শিক্ষার গুণে বড় ভাবের সঙ্গে পরিচয় কর্ব্বার পথটুকু দিনের পর দিন প্রশস্ত হ'তে থাকে। আজকে যে

তোমাকে যত পিছনে টান্‌ছে, শিক্ষার গুণে সে তোমাকে কালে তত অগ্রসর ক'রে দেবে। তোমার স্ত্রী পিতৃগৃহ থেকে এসেছেন এক সমান্য নারীরূপে, তাঁকে তুমি শিক্ষার বলে, সাধনের বলে মহাশক্তিতে পরিণত কর। আজ যিনি তোমার পরমবাধা, দেখবে, তখন তিনি কেমন ক'রে তোমার পরমসহায় হচ্ছেন।

হাবলাউচ্চ, কুমিল্লা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

ভক্ত-সম্মিলনী

পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য-প্রবর স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের সহিত যাঁহারা আধ্যাত্মিক যোগে সংযুক্ত রহিয়াছেন, জনসমাজে ইঁহারা অখণ্ড বলিয়া পরিচিত। শাক্ত, বৈষ্ণব বা রামায়ৎ প্রভৃতির ন্যায় অখণ্ডেরা কোনও একটা সম্প্রদায় নহেন, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থকে মূলরূপে ধরিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হন নাই, ইঁহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম-সম্পর্কিত মতবাদাদি নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও রুচি অনুসারে স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারাই নির্ব্বাচিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজেদিগকে স্বরূপানন্দ-সন্তান বলিয়া আখ্যাত করিতে ভালবাসেন, মাঝে মাঝে তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, সাধনা ও সংযম বিষয়ে আলোচনা এবং কীর্ত্তন, ভজন, পূজা ও উপাসনাদি দ্বারা আনন্দ করিয়া থাকেন। এই সকল সম্মিলনীতে কখনও কখনও শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং উপস্থিত

থাকিয়া সকলের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

বিগত ১৩৩১ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে বাঘাউড়ায় এইরূপ সম্মিলনী হইয়াছিল। এবার ব্রিটিশ ত্রিপুরারই অন্য এক পল্লী হাবলাউচ্চে কিঞ্চিৎ বৃহত্তরভাবে সম্মিলনী হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্যের নানা অবস্থা

আগামী কল্য সম্মিলনী, অদ্যই কেহ কেহ সম্মিলন-স্থানে আসিয়া জমিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পরে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া একখানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইয়াছে কি না, একথা কখন বুঝা যাইবে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। গ্রন্থ-লিখিত কথাগুলি শ্রীশ্রীবাবামণির মনঃপূত হইল না, ভক্তমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোরা বল্ দেখি, ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতই যে লাভ হয়েছে, একথা কখন বুঝা যাবে?

উপস্থিত অনেক ভক্তই এক একটা উত্তর দিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্বে আর পুরুষের পুংস্ত্বে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে যদি উভয়ের প্রতি দৃষ্টিমাত্রই ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা হয়, তবে বুঝতে হবে, ষোল আনা ব্রহ্মচর্য্য হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ একত্র ভোগাসক্ত-ভাবে প'ড়ে রয়েছে, এ দেখেও যাঁর মনে একমাত্র ব্রহ্মভাব ছাড়া অন্য কোনও ভাবের, অন্য কোনও আলোচনার বা কোনও স্মৃতির উদয় হয় না, তিনিই পূর্ণ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় সিদ্ধির হিসাবে ইনি মণিময় সিংহাসনের অধিকারী। যখন স্ত্রীলোক দেখলে তাঁকে

স্ত্রীলোক ব'লেই মনে হবে, কিন্তু 'মা' ছাড়া অন্য কথা ভ্রমেও মনে হবে না, তখন বুঝতে হবে, ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়েছে। কুমারী দেখ্‌লেও 'মা' ব'লেই ডাক্‌তে ইচ্ছা হয়, সতী নারীকে দেখলেও মায়ের কথাই মনে পড়ে, অসতী কুলটাকে দেখ্‌লেও মাতৃবুদ্ধিই জাগে,—এই অবস্থাটা যখন এল, তখন বুঝতে হবে, যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হ'য়েছে। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার সিদ্ধি হিসাবে এরূপ ব্রহ্মচারী স্বর্ণময় সিংহাসনের অধিকারী। যখন স্ত্রীলোক দেখ্‌লে কু-ভাব আসতে চাইলে অথবা নারী-নিরপেক্ষভাবেই প্রাণমধ্যে ভোগ-কামনা জন্মালে তৎক্ষণাৎ তাকে দমন করার সামর্থ্য হবে, তখন হবে আট আনা ব্রহ্মচর্য্য। এরূপ ব্রহ্মচারী রজতময় সিংহাসনের অধিকারী। যখব মনে অন্যায়ভাব প্রকৃতি-প্রেরিত হ'য়ে আসবে, কিন্তু সম্পূর্ণ দমন করা না গেলেও দমনের চেষ্টায় তোমার ক্রটী থাক্‌বে না, সফলকাম হও আর না হও, প্রাণ দিয়ে যখন তুমি কদিচ্ছার প্রতিরোধ কত্তে ব্রতী হবে, তখন হবে তোমার চারি আনা ব্রহ্মচর্য্য। এরূপ ব্রহ্মচারী লৌহময় সিংহাসনের অধিকারী। এর নীচে যার স্থান, তাকে কখনও ব্রহ্মচারী বলা চলে না, তার আচরণের নাম অব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যলাভের উপায়

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যলাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের নাম-জপ, ব্যায়ামাভ্যাস, সৎসঙ্কল্প এবং পরহিতে আত্মদান।

হাবলাউচ্চ
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

ছদ্মবেশী রাক্ষসী

অদ্য একটী অবিবাহিত যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—একটা বাল-বিধবা যুবতী মেয়ে, আমার স্বর্গীয় সমপাঠীর স্ত্রী, আমাকে মাঝে মাঝে খুব উচ্ছাসপূর্ণ ধর্ম্ম-গন্ধী পত্র লিখ্‌ছেন। নাম সই কচ্ছেন— "তোমার মা।" আমার কাছে পত্র না লিখ্‌লে নাকি তাঁর প্রাণ অধীর হয়, আমাকে একদিন না দেখ্‌লে তাঁর প্রাণ বাঁচে না, এ সব কথাই তাঁর পত্রে বেশী থাকে। এ অধীরতার কারণ আমি কিছুতেই অনুমান কত্তে পাচ্ছি না। একদিন অমার গুরুদেব এসেছেন, বিধবা মেয়েটী গোপনে একখানা পত্র দিয়ে আমাকে উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় জানালেন, প্রভুর প্রসাদ তাঁর চাই, রাত্রিতে গোপনে পৌঁছাতে হবে। তিনি ব্রাহ্মণ-বিধবা, আমি অ-ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি কি ক'রে তাঁকে প্রসাদ নিয়ে দিই! আর, এ প্রসাদ প্রার্থনার অর্থই বা কি? আমি কিন্তু কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য?

মা হওয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পাতান সম্পর্কটা মাতা-পুত্রই হোক আর যাই হোক্, এর প্রকৃত মূল্য বড়ই অল্প, যদি 'মা' কথাটার পশ্চাতে মাতৃবুদ্ধির তীব্র সাধনা না থাকে। 'আমি তোমার

মা'—বল্লেই কেউ প্রকৃত 'মা' হ'তে পারে না, যদি নিজের দেহে, মনে, প্রাণে মাতৃময়ী ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে না পারে। দেহও যেন বলে,—'আমি তোর মা', মনও যেন বলে,—'আমি তোর মা', প্রাণও যেন বলে,—'আমি তোর মা'। বুদ্ধি খাটিয়ে সে মনকে বুঝিয়ে নিল, 'আমি তোর মা', আর দেহটা পশুর ধর্ম্মে অন্যরকম আবেশে অধীর হ'য়ে রইল, এর নাম 'মা' হওয়া নয়। সন্তানের দেহর প্রতি মায়ের দেহের যে ভাব, দেহ হয়ত' সেই ভাবই রক্ষা কর্ব্বার সামর্থ্য পেয়েছে, বুদ্ধির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মনও মাতৃময় ভাবকে আঁকড়ে ধরেছে, কিন্তু প্রাণের আবেগ চলেছে ভিন্নপথে,—এর নামও 'মা' হওয়া নয়। সুতরাং তাঁর পত্র লেখার পথটা বন্ধ ক'রে দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। পূর্ণবয়স্ক যুবক ও যুবকতীর মধ্যে গোপনে কোনও প্রকার ভাবের আদান-প্রদান উচিত নয়। এমন কি সদ্‌ভাবও নয়, কারণ, গোপনতা পাপের প্রসূতি। তুমি তাঁর পত্রাদির উত্তর দেওয়া একদম বন্ধ ক'রে দাও এবং তাঁর ভাল-মন্দ সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনাকেই পূরণ কত্তে বিরত হও।

কামরিপু বহুরূপী

যুবক।—কিন্তু তাঁর এ পত্র লেখার পশ্চাতে প্রকৃতই যদি কোনও সাত্ত্বিক ভাবই থেকে থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' হ'লে তোমার উপেক্ষাতে তিনি মনে কষ্ট পাবেন, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনো অপরাধ হবে না।

কারণ, উভয়ের মঙ্গল-বুদ্ধি নিয়েই তুমি এ উপেক্ষা ক'রেছ। কিন্তু, কে জানে যদি এ গোপনতার পশ্চাতে কোনও তামসিকতা লুকিয়ে থাকে, তবে যে দু'জনেরই সর্ব্বনাশ। কামরিপু এমনি এক অদ্ভুত জিনিষ যে, কখন কোন্ ছদ্মবেশ প'রে আস্‌বে, তার কোনো ঠিকানাই নেই। সকল সইজের জামা-ই অনঙ্গ-দেবতাটির গায়ে লাগে। পরোপকারী ভদ্রলোকটি থেকে ঋষি-তপস্বী পর্য্যন্ত সবারই পোষাক সে প'রতে পারে। আমার ত' ধারণা, যাঁর কাছে কোনও প্রয়োজন নেই, খামাখা তাঁকে 'মা' ব'লে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কত্তে যাওয়ার পশ্চাতেও একটা প্রচ্ছন্ন আসক্তি থাকে।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

প্রার্থনা ও নামজপ

নোয়াখালী হইতে সমাগত জনৈক ভক্ত বলিলেন,—প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ, না নামজপ শ্রেষ্ঠ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপ শ্রেষ্ঠ। কারণ, প্রার্থনা-কালে মন বহু ভাবনায় বিচরণ করে, কিন্তু নামজপে একটি তত্ত্বেই সে নিবিষ্ট হয়। তবে, নামজপ কত্তে ব'সে যাদের মন কিছুতেই একাগ্র হ'তে চাচ্ছে না, তাদের আগে একটু প্রার্থনা বা স্তোত্রাদি পাঠ ক'রে নেওয়া দরকার। নামজপই সাধকের সারাৎসার, নামজপই তার সর্ব্বস্ব। জপ আরম্ভ করার আগে যে আরো কত রকমের অনুষ্ঠান রয়েছে, সেগুলো শুধু নামজপের আনুকূল্য করার জন্য।

সম্মিলনীতে সমাগত ভক্তেরা অধিকাংশ অদ্য বৈকালে কেহ বা কল্য প্রত্যূষে চলিয়া যাইবেন। সুতরাং জিজ্ঞাসুদের ভিড় অত্যন্ত বেশী।

স্ত্রীলোকদের আচরণের কদর্থ

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোকদের কোনও আচরণের কদর্থ কখনও কর্ব্বে না। হয়ত' তোমার পানে তাকিয়ে কোনও স্ত্রীলোক হেসেছেন, তুমি কখনও মনে কত্তে যেও না, এ হাসির অন্তরালে কোনও অন্যায় অভিসন্ধি আছে। হয়ত' তোমার গান শুন্‌বার জন্য কোনও প্রতিবেশিনী তোমাকে ডেকেছেন, কখনো ভাব্‌তে যেও না যে, এর পশ্চাতে আর কোনও অসৎবুদ্ধি আছে। অনাবশ্যক ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন ক'রে ত' চল্‌বেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনেক সময়ে তোমাদিগকে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আস্‌তে হবে কাজের ঠেকায়, অথবা তাদের প্রতি চোখ প'ড়ে যাবে অনিচ্ছায়। এই সংস্পর্শ ও এই দর্শন ব্যাপারটাকে সর্ব্বপ্রকার সন্দিগ্ধতার কবল থেকে মুক্ত রাখ্‌বে। কোন স্ত্রীলোক তোমার দিকে তাকালে, তুমি মনে কত্তে যেও না যে, তুমিই তাঁর লক্ষ্যস্থল বা তাঁর দৃষ্টি কলুষিত। কোনও স্ত্রীলোক যে তোমার প্রতি অপবিত্র-ভাবাপন্না হ'তে পারেন, এই চিন্তাটাকেই কখনো মনে আস্‌তে দেবে না।

কাল্পনিকতায় সর্ব্বনাশ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহস্র সহস্র যুবক শুধু কাল্পনিকতার দোষে জাহান্নমে যাচ্ছে। তুমি হয়ত' প্রতিদিন প্রাতঃকালে নদীর হাওয়া খেতে যাও, আর নদীতীরবর্ত্তী এক সম্পন্ন গৃহের একটী কুমারীও সেই সময়ে ফুলবাগানে হাওয়া খান। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, তুমি কিন্তু এক বিষম কল্পনা ক'রে বস্‌লে যে, ঐ মেয়েটী তোমার জন্য পাগল হ'য়েছে। এই ভাবে কত যুবক যে শুধু কাল্পনিকতার অপরাধে পাপের পঙ্কে ডুবে গেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। সুতরাং কখনো কল্পনা ক'রো না, কোনও স্ত্রীলোক তোমার পানে তাকিয়েছিল ব'লেই তার ভিতরে মন্দ ভাব ছিল অথবা প্রয়োজনবশে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছিল ব'লেই তোমার ঘাড় ভাঙ্গ্‌বার তার মতলব ছিল। হয়ত' একদিন কোনো অসতর্ক বালিকা রসনার চপলতা-নিবন্ধন তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রেছিল, তাই ব'লে তুমি মনে ক'রে ফেল না যে, তোমাকে আশ্রয় ক'রে তার চিত্তের চপলতা জন্মেছে। অবশ্য এসব স্থলে এদের সংসর্গ বর্জ্জন ক'রে তোমাকে চল্‌তে হবে, কিন্তু দৈহিক দূরত্বই যথেষ্ট নয়, মানসিক ভাবে সঙ্গ বর্জ্জনই প্রকৃত দূরত্ব। এদের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে হবে।

রক্ত-পিপাসু নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—হাঁ, স্ত্রীলোকের মধ্যেও

নর-রুধির-লোলুপ জীব আছে, কিন্তু কে রাক্ষসী, আর কে দানবী, সে চিন্তা, সে বিচার বা সে কল্পনা করা তোমার কর্ত্তব্যের বাইরে। অনেক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক আছে, যারা যুবকদের মুণ্ডুপাত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসে ঘনিষ্ঠতা করে, চিঠি লেখায়, বাজার সওদা করায়, ঘরে নিয়ে সন্দেশ পায়েস খাওয়ায়। অনেক স্ত্রীলোক আছে, যারা কু-মতলবে যুবকদের দিয়ে মহাভারতের অশ্লীল অংশগুলি পড়ায়, মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান বা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম-কথা শোনে, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের জন্মেতিহাস নির্লজ্জ ভাবে আলোচনা করে। এসব স্থলে স্ত্রীলোকদের সংশ্রব বর্জ্জনই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ স্ত্রীলোকের ভাব কিরূপ ছিল, কার অভিসন্ধি কেমন ছিল, সে সব চিন্তা তুমি কর্ত্তে অধিকারী নও। এই বিষয়ে তোমাকে একেবারে উপেক্ষাশীল হ'তে হবে।

ধীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও কুম্ভক

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— উপাসনা কালে নামজপ কত্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের কিঞ্চিৎ ধীরতা সম্পাদন কারো কারো পক্ষে উপকারী। সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু এখানে ধীরতা বল্‌তে কি বুঝা যায়, তাও ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে। স্বাভাবিক শ্বাস-গ্রহণে ও প্রশ্বাস-ত্যাগে যতটা সময় লাগে, তার চাইতে সামান্য একটু বেশী সময় লাগাতে হবে। সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকেই একটুখানি মৃদু ও একটুখানি ধীরগামী ক'রে নিতে হবে।

কিন্তু কোনও ক্রমেই যেন ফুস্‌ফুসে কোনও প্রকার উদ্বিগ্নতা বা অস্বস্তি না হয়। বিনা ক্লেশে, নিরুদ্বেগে, বিনা অস্বস্তিতে, অধিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত শ্বাস-প্রশ্বাসকে যতটুকু ধীরগামী করা যায়, তার চেয়ে একটু বেশীও কর্ব্বে না। *

জোর জবরদস্তি কত্তে গিয়ে অনেকে বিপদ ডেকে আনে। অনেকে জবরদস্তি কথাটারও মানে বুঝ্‌তে পারে না, তারা মনের খুশী-মত শ্বাস-প্রশ্বাস টান্‌তে থাকে, প্রথম প্রথম উৎসাহ-প্রযুক্ত কোনও প্রকার অস্বস্তিই অনুভূত হয় না কিন্তু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় কিছুদিন পরে। আরো এক কথা, শ্বাস-প্রশ্বাসকেই ইচ্ছা ক'রে কখনও বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার দরকার নেই। জোর ক'রে শ্বাস বন্ধ ক'রে রাখাটাকেই একটা মস্ত কিছু ব'লে মনে ক'রো না। শ্বাস টান্‌বার পরে এবং প্রশ্বাস ছাড়বার আগে অতি অল্প একটুখানি সময় প্রাণবায়ু আপনি স্থির থাকে। কিন্তু এত অল্পকাল স্থির থাকে যে, সাধারণতঃ তা টেরই পেয়ে উঠ্‌বে না, বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখতে চেষ্টা কর্ল্লে ক্রমে টের পাবে। আবার প্রশ্বাস ছাড়বার পরে এবং শ্বাস-গ্রহণের পূর্ব্বে এরূপ অতি অল্প একটুখানি সময় বায়ু স্থির থাকে। বায়ুর এই যে স্থিরতা, এরই নাম কুম্ভক। ভিতরে যে বায়ু স্থির হ'য়ে থাকে,

* শ্বাস-প্রশ্বাসের এইরূপ নিয়ন্ত্রণকে 'বিশিষ্টায়াম' বলে। শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রণীত "সংযম-সাধনা"র ১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পরিশিষ্ঠ দ্রষ্টব্য। এই স্থানের উপদেশ ব্যক্তি-বিশেষকে প্রদত্ত। সুতরাং সাধারণের ইহা অনুকরণীয় নহে।

তার নাম আভ্যন্তর কুম্ভক, বাইরে স্থির হ'য়ে থাকার নাম বাহ্য-কুম্ভক। আভ্যন্তর কুম্ভক বৈদিক যোগীদের আবিষ্কার, বাহ্য-কুম্ভক তান্ত্রিক যোগীদের আবিষ্কার।

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক কুম্ভক

জিজ্ঞাসু।—জোর ক'রে দম বন্ধ রেখে কুম্ভক করার কথা ত' শাস্ত্রেই আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি। শাস্ত্রে স্বাভাবিক কুম্ভকের কথাও আছে। 'রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।' একে বলে সহজ কুম্ভক বা কেবলী কুম্ভক। কুম্ভক কৃত্রিম ও স্বাভাবিক এই দুই প্রকারেরই হ'তে পারে। জোর ক'রে ভিতরে বা বাইরে বায়ু নিরোধ ক'রে রাখার নাম কৃত্রিম কুম্ভক। এতে অনেক সময়ে বিপদও ঘট্‌তে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবে ভিতরে বা বাইরে বায়ু নিরুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌লে তার নাম স্বাভাবিক বা সহজ কুম্ভক। অনেকে ভাবে, জোর ক'রে দম বন্ধ না কর্‌লে বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কুস্তি-কসরৎ না কর্‌লে কুম্ভক হয় না। কিন্তু সে ধারণা ভুল। এমন যোগি-পুরুষ এখনও ভারতবর্ষে অনেক আছেন, যাঁদের স্বাভাবিক কুম্ভকই দুচার ঘণ্টা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। বলসিদ্ধ কুম্ভক অপেক্ষা স্বভাব-সিদ্ধ কুম্ভক সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক ভাবে বায়ুর স্থিরতা জন্মালেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত নিরাপদ কুম্ভক হ'ল ব'লে জানবে। গভীর নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য-সহকারে কিছুদিন ইষ্টনামের সাধন করার পরে

দেখ্‌তে পাবে যে, উপাসনা কালে তোমার চেষ্টা ব্যতীতই আপনা-আপনি কিছুকাল বায়ু স্থির থেকে যাচ্ছে, অতি অল্প সময়ব্যাপী হ'লেও স্বাভাবিক কুম্ভক হচ্ছে। কখনো কখনো দেখ্‌বে, শ্বাস গ্রহণের পর অতি অল্প সময়ের জন্য বায়ু স্থির হ'য়ে রইল কিন্তু প্রশ্বাস ঠিক্ তখনি পড়্‌ল না। একেই বলে আভ্যন্তর কুম্ভক। আবার কখনও হয় ত' দেখ্‌বে, শ্বাস ত্যাগের পর অতি অল্প সময়ের জন্য বায়ু নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে, ঠিক্ তৎক্ষণাৎই পুনরায় শ্বাস গৃহীত হচ্ছে না। একেই বলে বাহ্য-কুম্ভক। ব্যক্তি-বিশেষে কারো আভ্যন্তর কুম্ভক, কারো বাহ্য-কুম্ভক বেশী হয়, কারো বাহ্য-আভ্যন্তর উভয়ই সমান ভাবে হয়।

প্রাণায়াম-সাধনে ফল-পার্থক্য

জিজ্ঞাসু।—এ পার্থক্যের কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর কারণ, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৈহিক গঠন, অভ্যাসের তারতম্য, ফুসফুসের বলাবলের প্রভেদ, বংশানুক্রমিক যোগ্যতা বা অযোগ্যতা। অবশ্য, এ পার্থক্য চিরকাল থাকে না। সাধন কত্তে কত্তে একদিন সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছুতে পারে। তবে, ভাল বংশে জন্মালে, ভাল দেহ নিয়ে জন্মালে, একটু দ্রুত উৎকৃষ্ট অবস্থাগুলি লাভ হয়,—এই মাত্র। কিন্তু গোড়ার কথা ব্রহ্মচর্য্য। যে বংশেই জন্মাও না,—ব্রহ্মচর্য্য থাক্‌লে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

কামুক বংশে জন্ম ও ব্রহ্মচর্য্য

জিজ্ঞাসু।—কামুকের বংশে জন্মগ্রহণ কর্লে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয় নাকি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কঠিন ত' হবেই, কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই। অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক্ না, ভগবানের নাম তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দান কর্বে। যা' মানুষ অন্যবিধ পুরুষকারের বলে পারে না, ভগবানের নাম-সাধনের বলে তা' পারে।

ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবানের নাম

জিজ্ঞাসু।—কিন্তু কৈ, কত লোক ত' দেখ্ছি ভগবানের নাম করে, কিন্তু তাদের মধ্যে ত' সংযম আস্ছে না!

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—নারে, ওরা কেউ ভগবানের নাম করে না, করে শুধু ভড়ং, করে শুধু বাহ্যাড়ম্বর। প্রাণ-মন দিয়ে যদি কেউ তাঁর নাম স্মরণ করে, তা' হ'লে কি তার মধ্যে আবার অসংযম অ-ব্রহ্মচর্য্য থাক্তে পারে? কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের পরিরক্ষণে অগ্নিদেব যেমন খাণ্ডব-বন দগ্ধ করেছিলেন নির্ব্বিঘ্নে, ব্যাকুলতা আর একনিষ্ঠার পরিরক্ষণে তেম্নি ভগবানের নাম সকল লালসা, সকল কামুকতাকে একেবারে ভস্মসাৎ ক'রে দেয়। নামের সেবা কখনো নিষ্ফলা হয় না।

ব্রহ্মচারীর সদাচার, শ্বাস ও প্রশ্বাস

একটী ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার্থী আগ্রহশীল যুবকের প্রশ্নের উত্তরে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে কখনো অধো-অঙ্গে থাক্তে বা যেতেই দেবে না, Always be high up (সব সময় উচ্চভাবে থাক্‌বে)। নিজ অধো-অঙ্গ বা অপর কারো অধো-অঙ্গের কথা ভাব্‌বেই না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি শিশু, কি পরিণত-বয়স্ক, কেউ কারো গুহ্য-অঙ্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন কর্বে না। মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর গুহ্য-অঙ্গ দর্শন হ'লে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ইষ্ট-নাম জপ কর্বে। কাম-বিষয়ে কৌতূহল বর্জ্জন কর্বে বিষের মতন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা কচ্ছি ভেবে অনেক সময় কামকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান থাক্‌বে। কোনও ব্যক্তির দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোনো গূঢ় কথা জান্‌তে কখনো চেষ্টা কর্বে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের অত্যধিক দ্রুততা কামভাবের বর্দ্ধক ও মানসিক দুর্ব্বলতার জনক। সুতরাং কখনো মনে কামভাব আস্‌বার উপক্রম হ'লেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে ধীরগামী কত্তে চেষ্টা কর্বে। কিন্তু জবরদস্তি কর্বে না। এমন অভ্যাস কর্বে যেন শয়ন-কালে হাত কিছুতেই নিম্নাঙ্গে না যায়। শায়িত অবস্থায় মনে কোন কু-ভাব এলে তৎক্ষণাৎ উঠে বস্‌বে এবং লঘু-মহামুদ্রা * কর্বে। শয়নের পূর্ব্বে হাত, পা, তলপেট, ঘাড়ের পেছন দিক্‌টা, চক্ষু, অণ্ডকোষ ও জননেন্দ্রিয় শীতল জলে ধৌত ক'রে নেবে। আর একটী কথা, সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। এই একটি নিয়ম অভ্যাস

* শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত "সংযম সাধনা" ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করার যে কত ফল, তা' আর বর্ণনা ক'রে শেষ করা যায় না।

শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য

শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু অপর এক প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস-প্রশ্বাসে যে লক্ষ্য রাখ্‌বে, তা' শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিবেগ ভঙ্গ ক'রে নয়, তাকে যথারীতি চল্‌তে দিয়ে। এতে এক মস্ত বড় লাভ এই হবে যে, মন এমন কি নিদ্রাবস্থাতেও শ্বাসে থাক্‌বে অর্থাৎ উর্দ্ধ অঙ্গেই থাক্‌বে। নিম্ন অঙ্গে অর্থাৎ জনন-যন্ত্রে মন না গেলে আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ভাবনা কোথায়? ব্যাস-নন্দন শুকদেব কি ক'রে জনক রাজার গৃহে বহু-বিলাসিনী-পরিবৃত থেকেও ব্রহ্মচর্য্যে অটল রইলেন, তার সঙ্কেত এইখানেই পাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মন রাখ্‌বার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হ'লো, শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করা। যাদের মন্ত্র একাক্ষর, তারা শ্বাসে একবার, প্রশ্বাসে একবার জপ কর্ব্বে। যাদের মন্ত্র দুই অক্ষরের, তারা শ্বাসে একাক্ষর, প্রশ্বাসে একাক্ষর জপ কত্তে পারে। যাদের মন্ত্র ততোদীর্ঘ, তারা মন্ত্রটীকে দুই ভাগ ক'রে এক অংশ গ্রহণে অপরাংশ ত্যাগে জপ কত্তে পারে। যাদের মন্ত্র অতিশয় দীর্ঘ, তারা প্রথম অক্ষর বা মূল অংশটুকু জপ কত্তে পারে। যেমন ধর গায়ত্রী। এত লম্বা মন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করা বিড়ম্বনা। সুতরাং এ স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু প্রণবই জপ কত্তে হয়। কারণ, প্রণবই হ'লেন গায়ত্রীর বীজ বা প্রাণ।

ব্রহ্মচর্য্য-সহায়ক ব্যায়াম

অপর জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুহ্যদ্বারের ও তলপেটের নিয়মিত ব্যায়াম ব্রহ্মচর্য্যের হিতকর। কারণ, তাতে জনন-যন্ত্রগুলির দুর্ব্বলতা হ্রাস পায়। প্রথম সাধকের পক্ষে জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম নিষিদ্ধ। কারণ, গুহ্যদেশের ব্যায়ামগুলি ভালমত অভ্যাসে আসবার আগে উপস্থের ব্যায়াম আরম্ভ কর্ল্লে তাতে অনেক সময় উপকার না হ'য়ে অপকারও হ'তে পারে। নিম্নাঙ্গের ব্যায়াম আগে কর্ব্বে, মধ্যাঙ্গের ব্যায়াম তারপর কর্ব্বে, উর্দ্ধাঙ্গের ব্যায়াম কর্ব্বে সর্ব্বশেষে। উর্দ্ধাঙ্গের চেয়ে মধ্যাঙ্গের ব্যায়াম দ্বিগুণ কর্ব্বে এবং মধ্যাঙ্গের চেয়ে নিম্নাঙ্গের ব্যায়াম দ্বিগুণ কর্ব্বে। উর্দ্ধাঙ্গ বল্‌তে কণ্ঠমূল পর্য্যন্ত, মধ্যাঙ্গ বল্‌তে নাভিমূল পর্য্যন্ত, নিম্নাঙ্গ বল্‌তে পদ-নখাগ্র পর্য্যন্ত বুঝবে।

নিশাকালে নিদ্রাভঙ্গ

অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাত্রে কখনও ঘুম ভাঙ্গলে তৎক্ষণাৎ উঠে প্রস্রাব কর্ব্বে, প্রস্রাবের বেগ থাকুক আর না থাকুক। তারপরে অণ্ডকোষ ও শিশ্ন শীতল জলে ধৌত ক'রে এক গ্লাস কি আধ গ্লাস জল, ঢক্‌ঢক্ ক'রে নয়, আস্তে আস্তে খেয়ে নামজপ কত্তে কত্তে ঘুমুবে। রাত বেশী না থাক্‌লে আর ঘুমুবে না,—সরল সোজা হ'য়ে ব'সে ভগবানের নাম জপ্‌বে বা তানপুরা নিয়ে ভজন

গান কত্তে থাক্‌বে। সুযোগ মনে কর ত' পাড়ার আরো দু'চারটী সৎলোক জুটিয়ে উষাকীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবে। যদি দেখ, রাতও বেশী নেই, ঘুমের আলসও খুব আস্‌ছে, তা'লে কয়েকবার লঘুমহামুদ্রা কর্ব্বে বা প্রাতর্ভ্রমণে বের হ'য়ে পড়বে।

উষা-কীর্ত্তনের সুফল

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উষাকীর্ত্তন এবং রাত্রিতে শয়নের প্রাক্কালে বিছানায় ব'সে নামজপ, এই দুটীই বড় ভাল কাজ। শয়নকালে যে চিন্তা নিয়ে ঘুমুবে, সারারাত সেই চিন্তাটীই বার বার তোমার অবচেতন মনে এসে কাজ কর্ব্বে। আবার উষা-কীর্ত্তন ক'রে যার যার ঘুম ভাঙ্গাবে, তাদের দিবসের প্রথম চিন্তাটি হবে শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও প্রাণপ্রদ। ভগবানের নাম নিয়ে জেগে ওঠা আর ভগবানের নাম দিয়ে ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলা, দুটিই পুণ্য কাজ। তবে এটা তোমার দিবসের প্রথম কাজ ব'লে একে দলাদলি, রেষারেষি, তর্কাতর্কি ও জিদ্‌-জবরদস্তি থেকে সযত্নে দূর রাখ্‌বে।

ধ্যান-জপ ও প্রচ্ছন্ন পাপ-সংস্কার

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পদ্মের পাপ্‌ড়ীর মাঝেও যেমন কীট থাকে, তেমনি পবিত্রতম মনেও অনেক সময় পাপ-চিন্তা থাকে,—প্রকাশ্যে থাকে না, অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে। এই প্রচ্ছন্ন পাপ-সংস্কারকে দূর

করার উপায় হচ্ছে জপ-ধ্যানের অভ্যাস করা। মন দিয়ে ইষ্টনাম জপ কর্ল্লে বা ইষ্ট-ধ্যান কর্ল্লে ধ্যান-কালে অতীতের পাপগুলি মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রচ্ছন্ন পাপ-সংস্কারগুলিও সব পূর্ণরূপ ধ'রে প্রকাশ পায়। কিন্তু এইভাব প্রকাশ পেতে পেতেই পাপের সংস্কার ক্রমে লোপ পায়। প্রবৃত্তির তাড়নায় একদিন হয়ত বাধ্য হ'য়ে যে পাপের অনুষ্ঠান ক'রে ফেল্‌তে হ'ত ধ্যান ও জপের ফলে ঐ সময় তার ছবিটুকু মাত্র মনে জাগে এবং তাতেই ভবিষ্যৎ অপসম্ভাবনা নষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্যই সাধকেরা বলেন, ভগবৎ-সাধনে কর্ম্ম-বন্ধন কাটে। ধ্যান-জপের সময় কুচিন্তা আস্‌ছে ব'লে ভয় পেয়ে যেও না। কু-চিন্তা, কু-ভাবনা, ভোগের চিত্র তাদের ইচ্ছামত আস্‌তে থাকুক, তুমি তোমার আসল কাজ নিয়ে লেগে থাক। কু-চিন্তা এলে তার প্রতি উদাসীন থাক,—তার আস্‌বার প্রয়োজন আছে ব'লেই সে এসেছে। তুমি তোমার আত্মকর্ম্ম নিয়েই থাক, ভগবানের নামের গানই পান কত্তে থাক, কু-চিন্তা এল কি গেল, সে'দিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাপরায়ণ হও। তার যতক্ষণ দরকার আছে, সে থাক্‌বে, তার দরকার ফুরিয়ে গেলেই সে চ'লে যাবে। তার জন্যে তুমি একটুকুও ভেবো না, কিন্তু নিজের কাজে শিথিলতা কত্তে পার্ব্বে না। কু-চিন্তাই আসুক আর যা-ই আসুক, চুটিয়ে তুমি তোমার ধ্যান চালাও, তোমার জপ চালাও। কু-চিন্তার শক্তির চাইতে ধ্যানের শক্তি শতগুণ বেশী। ধ্যান যদি জমে, তবে আর কু-চিন্তা থাক্‌বে কতক্ষণ?

ধ্যান জমাইবার কৌশল

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—ধ্যান জমাইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর করিলেন,—একনিষ্ঠ ভাবে গোঁয়ার গোবিন্দের মত, একগুঁয়ে হ'য়ে ধ্যানে লেগে থাকাই ধ্যান জমাবার কৌশল। মনে এই বিশ্বাস রাখ্‌বে, ধ্যান তোমার জম্‌বেই, ধ্যানকে আজ জম্‌তেই হবে। কখনো মনে সংশয় কর্ব্বে না, ধ্যান জম্‌বে কিনা। একবারও বল্‌বে না,—ধ্যান হয়ত জম্‌বে না। দৃঢ়ভাবে মনকে বল্‌বে,—ধ্যানকে আজ জমাট বাঁধা চাই-ই চাই, নইলে ছাড়াছাড়ি নেই। আর একটা কাজ কর্ব্বে, প্রত্যহ একই সময়ে ধ্যানে বস্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে।

স্ত্রীলোক-দর্শনে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর কর্ত্তব্য

অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই একেবারে আঁতকে উঠো না। ভাব্‌তে থাক্‌বে,—'এঁদের মধ্যেও আমার পরমোপাস্য ভগবান্‌ রয়েছেন। এঁদের মুখমধ্যে ভগবানের মুখচ্ছবি র'য়েছে, এঁদের হাসির ভিতর দিয়ে ভগবানের হাসি ফুটে উঠ্‌ছে। ভাবতে থাক্‌বে,—এঁদের কণ্ঠস্বরে ভগবানের কণ্ঠই ধ্বনিত হচ্ছে, এঁদের চক্ষু দিয়ে ভগবান্‌ই তাঁর এক প্রিয়তম সন্তানের পানে সস্নেহ নয়নে তাকাচ্ছেন।'

পুরুষ-দর্শনে কুমারীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—পুরুষদের জন্য যেমন এই উপদেশ, মেয়েদের জন্যও তেমন জান্‌বে। পুরুষদের কুচরিত্রতা, মন্দ-উদ্দেশ্য বা পাপদৃষ্টি—এসব নিয়ে চিন্তা করা তাদের উচিত নয়। পুরুষদের সম্পর্কে তাদের এই সতর্কতা থাকা উচিত যেন কোনও প্রকারে অনাবশ্যক সংশ্রব বা অনুচিত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্ট না হয়। কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে অদূরকালের মধ্যেই নারী-পুরুষের একত্র কাজ কর্ম্ম করা একটা দৈনন্দিন ব্যাপারে এসে দাঁড়াবে। এই সময়ে প্রত্যেক পুরুষকে নিজের সন্তান জ্ঞান ক'রে মনে মনে তার সম্পর্কে অন্যায় ভাব বা কুচিন্তা বর্জ্জন ক'রে চল্‌বার চেষ্টা কত্তে হবে। আজ তোমরা ছেলেরা এসে ভিড় কচ্ছ এখানে, কাল মেয়েরা এসে এর দশগুণ ভিড় জমাবে! মেয়েদের জন্যও আমার বার্ত্তা আছে, উপদেশ আছে, তাদের ভিতরেও ব্রহ্মবল আমাকে জাগাতে হবে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

ত্রিপুরার এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ভক্ত-সম্মিলনী উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি যে কয়দিন অবস্থান করিতেছেন, এই কতিপয় দিবস তাঁহার আর পরিশ্রমের অবধি ছিল না। সম্মিলনীতে সমাগত ব্রহ্মচর্য্যানুরাগী যুবকেরা কেহ বা দীর্ঘকাল পরে শ্রীশ্রীবাবামণির সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন, কেহ বা বহুদিন সাগ্রহ অপেক্ষার পরে এই সর্ব্বপ্রথম আচার্য্যপাদের চরণ-দর্শন

করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেকেরই জ্ঞাতব্য জিজ্ঞাসিতব্য বিষয়ের অন্ত ছিল না। ইহাদের প্রত্যেকের শত শত প্রশ্ন ও উপ-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন এবং শুধু একান্ত প্রয়োজনস্থলেই কাহারও কাহারও প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিতেছেন।

এক চেলার দুই গুরু

একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—একই ব্যক্তি দুই গুরুর কাছে মন্তর নিলে তার কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়া দিলেন,—তার কর্ত্তব্য দুই মন্ত্রেরই সাধন সমভাবে করিয়া যাওয়া। তারপরে সাধন করিতে করিতেই পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে। সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমে সাধক নিজের সাধনের বলেই প্রকৃত সত্যে গিয়া উপনীত হইবে। তখন আর দুই নৌকায় পা রাখিতে হইবে না।

তর্ক-বুদ্ধির অনিষ্টকারিতা

অতঃপর গ্রামান্তর হইতে দুইজন সাধু আগমন করিলেন। ইঁহারা উভয়েই পণ্ডিত ও তার্কিক। শ্রীশ্রীবাবামণিকে আজ মৌনী দেখিয়া ইঁহারা উভয়েই বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। কারণ, পরস্পর সারা পথ যে বিষয় নিয়া তর্ক করিতে করিতে

আসিতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাতে যোগদান করিয়া এক পক্ষকে নিরস্ত ও অপর পক্ষকে বিজয়ী করুন, ইহাই যেন ছিল উভয়ের আকাঙ্ক্ষা।

প্রথম সাধু বলিলেন,—নাম জপ যতই করুন না, কিছু ফল হবে না। যাঁর নাম জপ কচ্ছেন, তিনি কি, সেই বিষয়ে খেয়াল রেখে তবে চ'লতে হবে। নইলে জপ-তপের ফল অষ্টরম্ভা।

দ্বিতীয় সাধু বলিলেন,—আপনি এ ভাবে হরিনামের নিন্দা কর্ব্বেন না। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিসত্য ক'রে ব'লে গিয়েছেন, 'হরের্নাম, হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' নাম জপ ছাড়া জীবের উদ্ধার কোথায়? ভগবানকে মনে রেখে নাম জপ কত্তে হবে,—এই হ'ল আসল কথা।

এইভাবে দুইজনে প্রবলভাবে তর্ক করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু উভয়ের কথা যে একই দাঁড়াইতেছে, জিগীষার বশে তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরকে 'মূর্খ', 'অপোগণ্ড','অর্ব্বাচীন', 'শিশু', 'শিক্ষা-নবীশ' প্রভৃতি বলিয়া আপ্যায়ণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই পণ্ডিত লোক, সুতরাং উভয়েই প্রচুর শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া করিয়া বিপক্ষ-নির্জ্জয়ে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু উভয়েই যে একই কথা শুধু বিভিন্ন শব্দাবলি দ্বারা ও বিভিন্ন বাক্য-বিন্যাসে বলিয়া যাইতেছেন, ইহা ধরিতে পারিলেন না। প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া পরিশেষে অমীমাংসিত অবস্থায়ই তর্কে ইতি দিয়া একে

অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহারা নিজ নিজ পৃথক্ গন্তব্য স্থানে রওনা হইলেন।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইঁহাদের এই ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্লেটে লিখিয়া দেখাইলেন,—সত্যভাষী হইয়াও অনেকে সত্যদর্শী হইতে পারেন না। কারণ, সাধনের অভাব পাণ্ডিত্যকে অন্ধতা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অপরকে বুঝিতে চেষ্টা না করাই অধিকাংশ স্থলে তর্ক-বুদ্ধির প্ররোচক।

দর্শনশাস্ত্র ও সাধন

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"নিত্য সত্যে স্থিতিই ব্রহ্মবিদ্যা। সংসারীর পক্ষে তাহাতে অপ্রবেশ্য কিছু নাই। বরং অতীতের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা অধিকাংশেই গৃহী ছিলেন।

"ব্রহ্মবিদ্যার সাধন গৃহীর পক্ষে যাহা, ত্যাগীর পক্ষেও তাহাই। উহা হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট যে কোনও একটী সত্যের নিকটে আত্ম-সমর্পণ। যে কোনও একটী ক্ষুদ্র সত্য সাধককে সর্ব্ব সত্যে বা পূর্ণ সত্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

"এই ক্ষুদ্র কথাটী সাধকদের জীবনের আজন্ম আমৃত্যু পরীক্ষায় লব্ধ। দর্শন-শাস্ত্র ইহাকে সমর্থন মাত্র করিয়াছে। সাধনই কেন্দ্র। দর্শন-বিচার তার বৃত্তরেখা। বৃত্তরেখায় দৃষ্টি দিয়া একান্ত

এককেন্দ্রকে মন বহুমুখ হইয়া লক্ষ্য ভুলিয়াছে। এ জন্য একাগ্র সাধক দর্শন-বিচারকে সাধনের বিঘ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

"পথ ধরিবার জন্যই দর্শন। পথ পাইলে শুধু সাধন। দর্শন যুক্তি সাপেক্ষ। সাধন অনুভূতি-সাপেক্ষ। দর্শনে মস্তিষ্ক প্রধান, যুক্তি জাজ্জ্বল্যমানা। সাধনে হৃদয় প্রধান, উপলব্ধি আস্বাদ্যমানা। তাই, পথের সমর্থন দর্শনে আছে, পথের সন্ধান নাই।"

গুরু

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণির মৌনভঙ্গ হইলে একজন জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি 'গুরু' সম্পর্কিত যে সকল কথা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল :—

১। যার তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা কাজের কথা নয়। নিজ-জীবনে যিনি তত্ত্বকে আস্বাদন ক'রেছেন, তিনিই গুরু হ'তে পারেন। যতদিন প্রকৃত গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিজেদের মনোমত সাধনই অকপট-চিত্তে ক'রে যান। কারো কথায় টল্‌বেন না, কারো পরামর্শে পিছ-পা হবেন না। সদ্‌গুরুকে চেনা শক্ত, তিনি নিজে যদি ধরা দেন, তবেই তাঁকে চেনা যায়। আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, আর, ভগবানের একটী নাম নিজেই মনোনীত ক'রে নিয়ে তাই জপ ক'রে যান। আপনার যদি গুরুর প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি সময়মত

আস্‌বেনই, এসে আপনাকে যা' যা' জানাবার জানিয়ে যাবেনই। প্রকৃতই যখন তাঁর সাহায্যের আপনার দরকার হবে, তখন আর তিনি দূরেই বা থাক্‌বেন কি ক'রে, লুকিয়েই বা রইবেন কি ক'রে? আস্‌তে তাঁকে হবেই। জনমেজয় রাজার সর্প-যজ্ঞে যেমন ইন্দ্রকেও রথসহ ছুটে আস্‌তে হ'য়েছিল, সদ্‌গুরুকেও জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তেম্‌নি প্রাণের দায়ে ছুটে আস্‌তে হবেই। তিনি আপনাকে দুঃখ-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যেতে চাইবেন, কিন্তু পারের কড়ি চাইবেন না। তিনি মন্ত্র হয় ত' দেবেন, কিন্তু শুধু কাণেই কি দেবেন? প্রাণেও দেবেন!

২। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর আশীর্ব্বাদ কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই, তত্ত্বজ্ঞ গুরুর জন্যই উন্মুখ হ'য়ে থাক্‌বেন। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ নয়, ব্রহ্ম-রসাস্বাদনকারী নয়, এমন কত শত গুরুপদাভিলাষী ব্যক্তি হয় ত' আপনার কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হ'তে চাইবেন, আপনি তাঁদের অবমাননা না ক'রে তাঁদের প্রতি উদাসীন থাক্‌বেন। আসল গুরু কে? যিনি আপনার পরমোপাস্য, তিনিই আপনার গুরু অর্থাৎ পরব্রহ্মই গুরু। "গুরুগীতা" প'ড়ে দেখ্‌বেন, গুরুর যে সব লক্ষ্য ও নাম-নিরুক্তি করা হ'য়েছে, সব আপনার বেদান্তের ব্রহ্মেরই কথা। সেই পরমগুরুকে জান্‌বার জন্যে ব্রহ্মকৃপালব্ধ তত্ত্বদর্শী পুরুষকে পথ-প্রদর্শক ব'লে জান্‌তে হয়। কিন্তু ভগবানেকে যখন জানা যায়, তখন কোথায় বা আপনার লৌকিক-জগতের গুরু-আর কোথায় বা আপনার লৌকিক-জগতের শিষ্য! কে যে কোথায় থাকেন, তার খোঁজ নেবে

কে? রাজর্ষি জনক যখন শুকদেবকে ব্রহ্মবিদ্যা দান কর্ব্বেন, তখন বল্লেন,—শিষ্য, গুরু-দক্ষিণাটা দিয়ে নাও। শুকদেব বল্লেন,—সে কি! দীক্ষার আগেই দক্ষিণা? তাতে জনক বলেছিলেন,—"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই"। ব্রহ্মবিদ্যা যে লাভ করে, সে শুধু ব্রহ্মকেই গুরু ব'লে জানে।

৩। গুরু আপনার পথ-প্রদর্শক। কিন্তু পথটা দেখে নিতে হ'বে আপনার নিজের চোখের দৃষ্টি দিয়ে। যার স্বাধীন বিচার-শক্তি নেই, তেমন শিষ্য ঠিক্ ঠিক্ গুরুবাক্য পালন কত্তে পারে না।

৪। নিঃস্বার্থচেতা গুরু যদি কোনও শিষ্যকে জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্প দেন, তবে ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, তাকে জগৎ-কল্যাণ কত্তেই হবে। শত প্রলোভনও তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে না। গুরুবাক্য বিস্মৃত হ'য়ে যদি সে পাপের পঙ্কেও ডুব্‌তে থাকে, তবু একটা অব্যক্ত অন্তর্দ্দাহে অস্থির হ'য়ে তা'কে একদিন জগতের কাজে ছুটে আস্‌তেই হবে। এর অন্যথা হ'তে পারে না, এর অন্যথা কখনও হয় নি। সদ্‌গুরু কি শিষ্যকে শুধু মন্ত্র দিয়েই খালাস? তিনি জানেন, একই পরমগুরু একজনের মধ্যে বাস ক'রে শিষ্যকে উপদেশ দেওয়াচ্ছেন আবার তিনিই আর একজনের মধ্যে অবস্থান ক'রে সে-সব পালন কচ্ছেন। তাই, তিনি শিষ্যকেও ব্রহ্মবোধে পূজা করেন। লোক-শিক্ষার জন্যে তিনি বাইরে শিষ্যের পূজা নেন, আর, প্রাণের তৃপ্তির জন্য শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানে অর্চ্চনা করেন। এমন যে গুরু, ব্রহ্মদৃষ্টিই

যাঁর দৃষ্টি, তাঁর অভিপ্রায় কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে না।

৫। দেশ-প্রচলিত গুরুবাদের সাথে লড়াই দিয়ে শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন কি? যুগধর্ম্মের দাবীতে যেখানে যার যোগ্য স্থান হওয়া উচিত, সেখানেই তার স্থান হ'য়ে যাবে। এ জন্যে আপনার বা আমার চেষ্টার প্রয়োজন নেই। হৃদয়কে সত্যের জন্য অবারিত করুন, উন্মুক্ত করুন। কঠোর হোক্, অপ্রিয় হোক্ সত্য সর্ব্বাবস্থাতেই সত্য, সত্য সর্ব্বাবস্থাতেই পূজ্য। জীবনকে সত্যের পূজার জন্য প্রস্তুত করুন। এর ফলে আপনার পূর্ব্ব-সংস্কার বুঝে প্রচলিত গুরুবাদ দরকার মত রূপান্তর নেমে। মতামতের পরিবর্ত্তন অহরহ হয়, সত্যের পরিবর্ত্তন কখনো হয় না। একটী সত্যকে ধ'রে বহু পরস্পর-বিরোধী মতামত গঠিত হ'তে দেখা যায়। সত্যকে ধর্‌তে চেষ্টা করুন, মতামতের কোলাহলে পথচ্যুতির ভয় থাক্‌বে না।

হাবলাউচ্চ

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

যৌগিক পরিভ্রমণের প্রয়োজন

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—শরীরটার মধ্যে মনটাকে ভ্রমণশীল রাখায় লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর করিলেন,—মনের স্বভাবই হচ্ছে চঞ্চলতা। চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ ক'রে বেড়ানই তার নিত্যকার অভ্যাস। তাকে এক কথায় স্থির কত্তে গেলে তেমন হুকুম সে

মান্য ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তাকে ধীরে বিশ্রামের পথে আন্‌তে হয়। যে মনটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আগে তোমার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডটার মধ্যে ভ্রমণ কত্তে শেখাও। তাতে তার ভ্রমণের সখও মিটবে, অথচ একান্ত চঞ্চলতাটাও কম্‌বে। এইভাবে দেহের মধ্যে ভ্রমণ কত্তে কত্তে যখন তার কতকটা স্থির-ভাব এসেছে দেখ্‌বে, অম্‌নি লেগে যাও নাম-জপে।

সাধু-সঙ্গ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যার সঙ্গ পায়, সে তারই মত হ'য়ে যায়। তাই, সৎসঙ্গের আবশ্যকতা। কিন্তু শুধু সঙ্গ ক'রলেই হ'লো না, সাধু-সঙ্গের ফলটুকুকে ধারণ ক'রে রাখ্‌বারও যোগ্যতা চাই। যার সরলতা আছে, ভাল হবার জন্য ব্যাকুলতা আছে, আর, সকলের উপরে যার ইন্দ্রিয়-সংযম আছে, সৎ-সঙ্গের ষোল আনা ফল সে-ই পায়। কিন্তু সাধু চেনা ত' সহজ নয়। তাই, তিনটী পরীক্ষা মনে রাখ্‌বে। যিনি পরীক্ষায় পাশ ক'রে যান, নিশ্চিন্তে তার সঙ্গ কর্ব্বে। প্রথমতঃ তিনি সাধন-ভজন করেন, আর লোকমান্যে নয়, লোক-কল্যাণেই তাঁর দৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ তিনি কারো নিন্দা করেন না। তৃতীয়তঃ তাঁকে দেখ্‌লে বা তাঁর নিকটে অবস্থান কালে ভগবানের কথা মনে পড়ে, আপনা-আপনি ইষ্টনাম জাগে আস্‌তে থাকে, আপনা-আপনি উচ্চ-চিন্তা জাগ্‌তে থাকে।

সাধুর পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সাধুর প্রকৃত পরিচয় হ'চ্ছে অপরের ভিতরে মহচ্চিন্তার পরিস্ফুরণের ক্ষমতায়। তাঁকে দেখ্‌লে তাঁর সাথে কথা কইলে, তাঁর সঙ্গে অবস্থান কর্‌লে তোমার মনের পাপ, তাপ, গ্লানি, আসক্তি সব দূরে চ'লে যায় কি? যদি যায়, তবে জানবে, তিনি প্রকৃতই সাধু। তাঁর সংসর্গের ফলে তোমার প্রাণে ভগবৎপ্রীতি জাগে কি? দেশের জন্য বা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগে কি? যদি জাগে, জান্‌বে তিনি সাধু। তাঁর কাছে এলে কঠিন কর্ত্তব্যগুলিও তোমার নিকট সহজ ব'লে বিশ্বাস ও উৎসাহ জন্মে কি? যদি জন্মে, তবে তিনি সাধু।

গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বেড়াইতে নিকটবর্ত্তী শিলাউড় গ্রামে আসিয়াছেন। গ্রামস্থ প্রবীণদের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী অনুরোধ করিলেন,—অনুগ্রহ করিয়া গুরু ও দীক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদিগকে দু' একটী কথা বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এক চাষার বিশাল ঈক্ষু-ক্ষেত্র ছিল। একদিন তাঁর দুই ভাগ্নে বেড়াতে এলেন মামার বাড়ী। মাতুল ম'শায় ভাগ্নে দু'টীকে নিয়ে আখের ক্ষেতে প্রবেশ ক'রে তাদের বল্লেন,—দেখ ভাগ্নেরা, এই যে বিরাট আখের ক্ষেত, এর সবগুলো আখই তোমাদের জান্‌বে। যেটা ইচ্ছা,

সেটাই তোমরা খেয়ো, যতগুলি ইচ্ছা ততগুলিই খেয়ো। বড় ভাগ্নে ত' এই না শুনে বড় বড় দেখে এক একটা আখের কাছে যায়, আর, মিষ্টি কিনা পরীক্ষা কর্ব্বার জন্যে একটা ক'রে কামড় দেয়; কিন্তু এক কামড়ে ত' আর আখের রস বেরোয় না, সুতরাং ভাল ক'রে দেখে শুনে আর একটা আখে গিয়ে কামড়ায়। ছোট ভাগ্নে কিন্তু দাদার পথে গেল না। সে তার মামাকে বল্লে,—মামু, তুমি নিজের হাতে একখানা আখ কেটে দাও। মামা বল্লে,—তুমি নিজেই পছন্দমত আখ বেছে নাও। ছোট ভাগ্নে বল্লে,—না মামা, তোমার নিজ হাতে দেওয়া একটী আখ আমার চাই-ই। মামা তখন ছোট ভাগ্নের বিনয় ও আগ্রহে খুশী হ'য়ে নিজের হাতে একখানা আখ কেটে দিলেন। আখ কাটবার সময়ে তিনি বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে নিলেন, আখটা কেমন হবে, আর ছোট ভাগ্নের দাঁতের শক্তি কতটুকু। ছোট ভাগ্নে ত' মামার দেওয়া আখখানা নিয়ে প্রথমেই দিয়ে নিলে দু'-তিন চিবুনি, কিন্তু রস বেরুল না। তখন সে তার বড় দাদার মত নিজের পছন্দমত যে আখটাকে বড় ব'লে মনে হয়, সেটাকেই দেয় কামড়। কিন্তু এক কামড়ে কোনটাতেই রস বেরুল না। তখন সে আবার মামার দেওয়া আখটাতেই আর এক চিবুনি দেয়। তখনো আখের রস বেরোয় না দেখে সে পুনরায় কিছুকাল তার দাদার মত কত্তে লাগ্‌ল। কিন্তু মামার দেওয়া আখখানা তার হাতেই ছিল, মাঝে মাঝে ওটাকেই দু'এক চিবুনি সে অনিয়মিত ভাবে দিচ্ছে! হঠাৎ একটা কামড়ের

পর সে মামার দেওয়া আখখানার ভিতর থেকে কিঞ্চিৎ রসের আস্বাদ পেল। তখন সে কর্ল্লে কি, না, ক্ষেতজোড়া অন্যান্য আখের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে হাতের আখখানাকেই চিবুতে আরম্ভ কর্ল্লে। চিবুতে চিবুতে রসের উৎস খুলে গেল, সে সেই রসের আস্বাদনেই তন্ময় হ'য়ে রইল। এদিকে তার বড় ভাই হতাশ মনে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ছোট ভায়ার কাছে এসে হাজির। সে এসে দেখে অবাক্ কাণ্ড! ছোট ভাই প্রাণ ভ'রে আখের রস পান ক'চ্ছে, তার দুই গাল বেয়ে রসের ঝর্‌ণা ব'য়ে যাচ্ছে, তাতে বুক ভিজে যাচ্ছে, মাটী পর্য্যন্ত ভিজে কাদা হয় আর কি। বড় ভাই বল্লে,—'ওরে ধেমো, আখের রস তুই কি ক'রে পেলি? আমি ত' এতক্ষণ পণ্ডশ্রম ক'রেই মর্ল্লাম।' ছোট ভাই কোনো জবাব দিল না, আঙ্গুল দিয়ে মামাকে দেখিয়ে দিল। বড় ভাগ্নে তখন গিয়ে মামাকে ধর্ল্লে। মামা বল্লেন,—হাজার আখে কাম্‌ড়াতে গেলি কেন, একটা নিয়ে থাকলেই ত' এতক্ষণে কত রস আস্বাদন কত্তে পাত্তিস্। বড় ভাগ্নে আর দেরী কর্ল্লে না, মামাকেও আর কথাটী বল্লে না, হাতের কাছে যে আখ খানা পেল, সেই খানাই ভেঙ্গে নিয়ে সে চিবুতে আরম্ভ কর্ল্লে। কিছুক্ষণ পরে সেও রসের আস্বাদন পেল, সেও ডুব্‌ল!—গুরু, শিষ্য এবং দীক্ষার ব্যাপার এই প্রকার। সদ্‌গুরু হ'লেন চাষার মতন, তিনি কোনো ভাগ্নেকে নিজ হাতে একখানা আখ কেটে দেন, কাউকে বা শুধু ব'লে দেন যে, যেখানেই খাও, একটা নিয়ে লেগে থাক্‌তে হবে! আরো মজা হচ্ছে এই যে, দীক্ষা

দিয়ে প্রকৃত গুরু কখনো শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করেন না। সদ্‌গুরুর শিষ্যও অনেক হয় কিন্তু গুরু-দত্ত জিনিষের উপর পূর্ণ আস্থা আসে না ব'লে বার বার শত পথ ঘুরে ধীরে ধীরে গুরুদত্ত পথে একনিষ্ঠ হ'য়ে ব্রহ্মরস প্রাপ্ত হন। এরা সব ছোট ভাগ্নের মত। আবার কোনো সাধক আছেন, দীক্ষা তাঁরা নেন না, নিজেরাই একটার পর একটা ক'রে সাধন-পন্থা পরীক্ষা ক'রে ক'রে শেষটায় হতাশ হ'য়ে যান কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণ-বশতঃ পুনরায় তাঁদের উৎসাহ জেগে ওঠে এবং বিনা দীক্ষাতেই যে কোনও একটী মনোভিমতানুযায়ী সাধনে একনিষ্ঠ প্রযত্নে লেগে থেকে তাঁরা ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন। এঁরা সব বড় ভাগ্নের মত। ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে যে মৌনীবাবা ছিলেন, তিনি এই বড় ভাগ্নের দলের সাধক।

ময়মনসিংহ,

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের ক্রম

পাঁচ দিন হয় শ্রীশ্রীবাবামণি ময়মনসিংহ আসিয়াছেন।

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদের উপাসনা-প্রণালীতে স্তোত্রগুলি একটীর পর একটী যেভাবে সজ্জিত আছে, তার আগেরটা পরে এবং পরেরটা আগে পাঠ ক'রে নাম-জপ চলে কিনা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম-জপই উপাসনার প্রধান বস্তু।

সুতরাং নাম-জপটী যদি ঠিক্ ঠিক্ হয়, তাহ'লে অন্যান্য স্তোত্র-কীর্ত্তনাদির দিকে তেমন কড়া নজর না দিলেও চলে। কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিজ নিজ পন্থের নির্দ্দেশিত স্তোত্রাদির ক্রমলঙ্ঘন সঙ্গত নয়। দীক্ষা নেওয়ার মানেই একটা শৃঙ্খলায় আসা। দীক্ষা নেবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না, এটা একটা অসঙ্গত আব্‌দার।

ওঙ্কার-রূপী শ্রীভগবান্

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে ওঙ্কাররূপী ব'লে সর্ব্বক্ষণ মনন কর্ব্বে। ওঙ্কারমূর্ত্তিতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটী বস্তুতে, প্রত্যেকটী ধ্বনিতে, প্রত্যেকটী তত্ত্বে বিরাজমান আছেন, পুনঃ পুনঃ মননের দ্বারা এই বিশ্বাসকে একেবারে জাগ্রত, জ্বলন্ত, স্ফুরন্ত ক'রে তুলবে। মনে মনে জানবে, ওঙ্কার-রূপ স্মরণের দ্বারা স্মৃতিশক্তির সার্থকতা, অবিরাম অফুরন্ত ওঙ্কার-রূপ দর্শনের দ্বারাই দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা।

ওঙ্কার-বিগ্রহ স্থাপন ও ওঙ্কার-মূলক-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ থেকে সাধকের মনকে টেনে এনে একমাত্র ওঙ্কারেতে নিবদ্ধ করার সহায়ক উপায়-স্বরূপে স্থানে স্থানে ওঙ্কার-বিগ্রহ স্থাপন এবং

স্থানে স্থানে উদয়াস্ত ওঙ্কারমূলক-কীর্ত্তন কর্ব্বে। * ওঙ্কার-মন্তর সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ, সর্ব্বমন্ত্রের সমাহারস্বরূপ। তাই, এই মন্ত্র সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। কালীভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তের বিরোধ থাক্‌তে পারে, যদিও থাকা আদৌ উচিত নয়। তবু পরস্পরের বিরোধ একটা কুখ্যাত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু ওঙ্কারের সঙ্গে কারো কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ সম্ভব নয়। কেননা, ওঙ্কার হচ্ছেন সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি-মন্ত্র ওঁ কথাটীর সাহিত্যিক অর্থ হচ্ছে, হাঁ, Yes, এই জন্যই তোমাদের উচিত, যেখানে যেখানে সম্ভব, ওঙ্কার-বিগ্রহ স্থাপন করা এবং ওঙ্কার-মন্দিরে কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি আদৌ না রেখে, একমাত্র ওঙ্কার-মূর্ত্তিকেই রাখা। ওঙ্কারের ভিতরেই সব আছে, অতএব এর পাশে অন্য মূর্ত্তি বসান অনাবশ্যক ও অবান্তর। এতে ধর্ম্মের দিক্ দিয়েও তোমাদের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য ঐক্যের সৃষ্টি হবে।

ময়মন সিংহ
২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

স্ত্রী-শিক্ষা ও বাহুবল

শ্রীযুক্ত ব—বলিলেন,—স্ত্রীজাতির শিক্ষা চাই-ই। অবশ্য বি, এ, এম, এ'র কথা বল্‌ছি না। স্ত্রীলোকদের শিক্ষা হবে নিখুঁত গিন্নীপণা।

* এই কীর্ত্তন যে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইবে, তাহা শ্রীশ্রীবাবামণি ১৩৩৮-এর ৬ই বৈশাখ স্থির করিয়া দেন ; অখণ্ড-সংহিতা পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, শুধু ঐ টুকুতেই কুলুবে না। দুর্দ্দান্ত লম্পট যখন গায়ের জোরে তার সতীত্ব-নাশ কত্তে আস্‌বে, তখন কি ক'রে আত্মরক্ষা কত্তে হয়, শত্রু-দলন কত্তে হয়, তাও শিখ্‌তে হবে। শুধু গিন্নীপণাতে চল্‌বে না। বিনা দোষে নারী যখন সমাজের আশ্রয় হারায়, তখন তাকে কি ক'রে নারীত্বের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সেইটুকুও তাকে শিখ্‌তে হবে।

প্রশ্ন।—আপনি কি স্ত্রীগণের পক্ষে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক মনে করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই করি। কেননা, মেয়েদের গর্ভে আজ বীর পুত্রের জন্ম হওয়া চাই। মরার মত প'ড়ে থাকার দিন আর নেই।

প্রশ্ন।—কিন্তু লোকমত যে অত্যন্ত প্রতিকূল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দীর্ঘকাল এ প্রতিকূলতা থাক্‌বে না। নিদ্রিত বাসুকি জেগে উঠ্‌ল ব'লে! ইতিহাসে একবার যা' ঘটেছে, তা' আবার ঘট্‌বে। ভারতের ইতিহাসে স্ত্রীজাতির রণশিক্ষার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাও আবার যা' তা' বাজে দৃষ্টান্ত নয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আছে, মুদ্গলের পত্নী ইন্দ্রসেনা রথারোহণ ক'রে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। স্ত্রীদের যুদ্ধ করার এ রকম দৃষ্টান্ত বেদে আরও পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন সুভদ্রা-হরণ করেন, তখন সুভদ্রা সেই ঘোর যুদ্ধের মধ্যেও নিপুণ সারথির কাজ করেছিলেন। এটাও অস্ত্রবিদ্যারই মাস্‌তুত বোন। শিশুপাল-বধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে

বর্ণনা করা হ'য়েছে যে, রাজপত্নীগণ অশ্বারোহণে রাজসূয়-যজ্ঞ দেখ্‌তে এসেছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়-কালে তামিল দেশে একটী রাজ্য শুধু মহিলাদের দ্বারাই শাসিত হ'ত, এমনকি লড়াই ক'রে শত্রুর হাত থেকে নগর-রক্ষা পর্য্যন্ত মেয়েরাই কত্তেন। সংযুক্তা রণনিপুণা অশ্বারোহিণী ছিলেন। কর্ম্মদেবী দিগ্বিজয়ী বীর কুতুবুদ্দিন-কেও পরাজিত করেছিলেন। রাও শূরতনের কন্যা তারাবাঈ বিখ্যাত রণবীর ছিলেন। দুর্গাবতীর অসাধারণ রণ-নৈপুণ্যের এবং পরাক্রমের কথা কে না জানে? একশ' বছর আগে বিশ বছর বয়সের মেয়ে ভীমাভাঈ অশ্বারোহী-সহ মাহিদপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করেছিলেন। নূরজাহান যুদ্ধবিদ্যায় বিচক্ষণতা লাভ করে-ছিলেন। চাঁদবিবি দুই হাজার অশ্বরোহী স্ত্রী-সৈন্য নিয়ে দেড়শ' বছর আগে কুর্দ্দলা যুদ্ধে মারাঠাগণের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এসব ইতিহাসের কথা, কল্পনা নয়, উপন্যাস নয়। এসব আবার এদেশে হবে।

প্রশ্ন।—তাতে কি বিবাহিত-জীবনের সুখশান্তি কম্‌বে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই না। পুরুষরা যে বড় বড় বীর হচ্ছে, বড় বড় যোদ্ধা হচ্ছে, তাতে কি তাদের স্ত্রীরা তাদের প্রেম ও ভালবাসা কম ক'রে পাচ্ছে? মেয়েরা যখন বীর হবে, তখনও তারা তাদের স্বামীদের আগেরই মতনই ভালবাস্‌বে, আগের মতই অনুরাগিণী হবে। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই হবে যে, আজকালকার মেয়ে অত্যাচারী লম্পটের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা কত্তে পারে না, আর তখনকার মেয়েরা অপমানকারীর নাক-কাণ কেটে রেখে

লাথি মেরে শয়তানকে তাড়িয়ে দেবে। দাম্পত্য-জীবন তখন আরো সুখের হবে, কারণ, স্বামী জানবে যে, স্ত্রীকে নিয়ত পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে না রাখ্‌লেও তার সতীত্বের উপরে হাত দিয়ে মাথা নিয়ে বেঁচে যেতে পারে, এমন ভাগ্যবান্ জগতে কেউ নেই। স্ত্রীর প্রতি এই শ্রদ্ধাটাই তাকে গৃহিজীবনে যথার্থ সুখী করবে।

ময়মনসিংহ

২রা আষাঢ়, ১৩৩৪

বহুদেববাদের উৎপত্তি

শ্রীযুক্ত জ—জিজ্ঞাসা করিলেন,—হিন্দুধর্ম্ম নাকি একেশ্বর-বাদীর ধর্ম্ম। কিন্তু আমাদের এত হাজার হাজার দেবতা এলেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর্য্যেরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা আদিম অধিবাসীদিগকে জোর ক'রে নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তে বাধ্য করেন নি। যার যা' পূজা, উপাসনা বা আরাধনার পদ্ধতি তাকে তা' অব্যাহত রাখ্‌তে দিয়ে তাকে আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ক'রে তাঁরা নিয়েছিলেন। তোমাদের হাজার দেবদেবী এভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তোমরা যদি তখন অনার্য্যদের গলায় ছুরি বাগিয়ে ধ'রে বল্‌তে—"হয় তোদের এসব সীমাবদ্ধ উপাসনা ছেড়ে দে, নয় প্রাণের আশা ছাড়,"—তা'হলে তোমাদের ধর্ম্মে বহুদেববাদ প্রবেশ কত্তে পারে না। কিন্তু তার একটা সাংস্কৃতিক কুফল এই

ফ'লত যে, তোমাদের বংশধরেরা সব জন্মমাত্রেই নরহত্যার প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মাত, তোমরা একটা গুণ্ডার বা বর্ব্বরের সমাজে পরিণত হ'তে। অতীতে তোমরা আশ্চর্য্য মহত্ত্ব দেখিয়েছ। তোমাদের পরমতে সহিষ্ণুতা এবং পরমত-স্বীকরণের শক্তি অদ্ভুত। বহুদেববাদের উৎপত্তির মূল এইখানে। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদিগকে এমন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতে হবে, যেন বহুদেববাদে জর্জ্জরিত হিন্দু-সমাজ বিনা রক্তক্ষয়ে, বিনা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে, বিনা কলহে স্বভাবের পথে একেশ্বরবাদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।

ময়মনসিংহ

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৪

সংসার বা সন্ন্যাস নয়, চাই মনুষ্যত্ব

অদ্য বৈকালে শ্রীযুক্ত জ—গুরুপাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,——তোদের আজ প্রয়োজন মনুষ্যত্বের, সন্ন্যাসের বা সংসারীর নয়। সন্ন্যাস ও সংসারীর মধ্যে যেটি তোদের মনুষ্যত্বলাভে সহায়তা কর্ব্বে, তোরা তাকে গ্রহণের জন্যই তৈয়ার থাক্। সংসারীর শত প্রকারের সুখের চিত্র দেখে তোরা আকৃষ্ট হ'স্‌নে। গৈরিকের সহজ আরাম দেখেও তোরা মুগ্ধ হ'স্‌নে। আকৃষ্ট হ', মনুষ্যত্বের পানে; মুগ্ধ হ', মনুষ্যত্ব দেখে। চাই মনুষ্যত্ব, আর চাই মনুষ্যত্বের পূজারী।

ময়মনসিংহ

৭ই আষাঢ়, ১৩৩৪

সাংসারিক উন্নতির জন্য নাম-জপ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাম জপ করা যায় কিনা এবং তাতে ফল হয় কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যায় এবং হয়। যার সাংসারিক উন্নতি নেই, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক সময় অর্থহীন। ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ উন্নতিই তোমার লক্ষ্য হবে এবং যুগপৎ দুটীরই অনুশীলনের জন্য ভগবানের নামের শরণাপন্ন হবে। তবে, একথা নিশ্চিত জেনো, ভগবানে অচলা ভক্তি এবং সত্যিকারের বিশ্বাস এলে ঐহিক উন্নতির জন্য নাম-জপের রুচি বা প্রয়োজন থাকে না।

ময়মনসিংহ

৯ই আষাঢ়, ১৩৩৪

প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি

প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের চিত্ত প্রেম দিতে চায়, তাই প্রেমকে ঢাল্‌বার আধার সে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যে পাত্রেই সে প্রেম ঢালে, দু'দিন পরেই দেখ্‌তে পায়, প্রেম উপ্‌ছে পড়ে যাচ্ছে; তার সবখানি প্রেমকে বুকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে, এমন পাত্র জগতে মিল্‌ছে না। তখন সে

ভগবানের দিকে তাকায়। ভগবান্ তাঁর অসীম প্রেমাধার খুলে দেন; মানুষ তার সবখানি প্রেম, সবখানি ব্যাকুলতা সেই অন্তরের বুকে ঢেলে দিয়ে শেষে নিজেকে পর্য্যন্ত প্রেমময় ভগবানের মাঝে হারিয়ে ফেলে এবং মনুষ্য জীবনের সার্থকতা লাভ করে।

ময়মনসিংহ

১৩ই আষাঢ়,১৩৩৪

গায়ত্রী-মহিমা

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের এ কথা বিশ্বাস করা উচিত যে, ব্রহ্ম-গায়ত্রী-মন্ত্রের পাবনী শক্তিতে যে কোনও পতিতের শুদ্ধি হ'তে পারে। বিশ্বাস করা উচিত, ব্রহ্ম-গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা যে-কোনও ধর্ম্মচ্যুতের পুনরায় হিন্দুরূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা জন্মে। বিশ্বাস করা উচিত যে, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর স্মরণ-মাত্র অতীত যুগের লক্ষ কোটি ঋষি-মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হয়।

গায়ত্রীতে সর্ব্বজনের অধিকার

প্রশ্ন।—যে কোনও ব্যক্তিই কি ব্রহ্ম-গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রত্যেকে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অধিকারী। প্রত্যেককে এই মন্ত্র উচ্চারণে স্বাধীনতা দেবে, উৎসাহ দেবে। স্ত্রী,

শূদ্র, ডোম, পতিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কাউকে এই পাবন-মন্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা চল্‌বে না। অনাগত যুগে ব্রাহ্মণ-শক্তির এক অভাবনীয় পুনরভ্যুদয় হবে এবং শত শত শূদ্র, শত শত অনার্য্য, শত শত বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন ক'রে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে, ব্রাহ্মণ্য-সাধনাকে পরম গৌরব ও মহতী শক্তি দান কর্ব্বে।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী-জপকালীন মনোভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্ম-গায়ত্রী-মন্ত্র ব্রাহ্মণত্ব স্ফুরণের মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ বা উচ্চারণের কালে মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখ্‌বে যে, তুমি স্ত্রী বা পুরুষ যাই হও না কেন এবং উচ্চ বা নীচ যে বংশেই জন্মে থাক না কেন, গায়ত্রী-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ কচ্ছ, ব্রহ্মতেজ তোমার ভিতরে স্ফুরিত হচ্ছে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকি ও বিশ্বামিত্রাদি তপঃসিদ্ধ ঋষিদের অতুলনীয় সামর্থ্য তোমার মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। মনে মনে ভাব্‌বে যে, তুমি ব্রাহ্মণ হচ্ছ এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহ, মন, প্রাণ ব্রাহ্মণোচিত ত্যাগ, নির্লোভতা, নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণে বিমণ্ডিত হচ্ছে।

সমগ্র জগৎকে ব্রাহ্মণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীত ভারতের লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীতে সকলে ব্রাহ্মণ হবে। তাই, তাঁরা শত শত অনার্য্য-

জাতিকে আর্য্যজাতির অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছেন এবং যারা ব্রাহ্মণরূপে গৃহীত না হ'য়ে কর্ম্ম ও গুণের পার্থক্য-বশাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে গৃহীত হয়েছে, তাদের ব্রাহ্মণত্বে উৎক্রমণের পথ খোলা রেখেছেন। কত শূদ্র, কত চণ্ডাল তপস্যা ক'রে ব্রাহ্মণ হ'লেন। এতে শূদ্র বা চণ্ডাল জাতির কোনো লাভ নেই, লাভ সমগ্র আর্য্যজাতির। কেননা, সমগ্র জগৎকে ব্রাহ্মণত্বে উৎক্রান্ত করাই ছিল তাঁদের সভ্যতার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য মধ্য-পথে স্খলিত হ'য়ে গিয়েছিল। তোমরা পুনরায় সেই লক্ষ্য ভেদ করার জন্য ব্রতী হবে। তোমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ হবে এবং সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী ব্রাহ্মণত্বের সম্প্রসারণ ঘটাবে। নিখিল মানব-সমাজকে তোমরা ব্রাহ্মণের সমাজে পরিণত কর্ব্বে। শূদ্রত্ব দূর কর্ব্বে, মানব-জন্মের শাপ-মোচন ঘটাবে।

ময়মনসিংহ,
১১ই আষাঢ়, ১৩৩৪

হতাশের আশা

বৈকাল বেলা একটী সঙ্গীকে নিয়া জ—আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে লইয়া পল্লীগ্রামের রাস্তা ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। পথ চলিতে চলিতে বলিলেন,—একেবারে সম্যক্ বিশুদ্ধ জীবন শ্লাঘার বস্তু, কিন্তু একবার যিনি গর্ত্তে প'ড়ে তারপরে উঠে এসেছেন, তাঁরও গৌরবটা বড় কম নয়। ভগবানের কৃপায় জগতে কত জগাই-মাধাই উদ্ধার হ'য়েছেন, তার সীমা-সংখ্যা

নেই। এঁদের জীবনের পানে তাকিয়ে হতাশা বর্জ্জন কত্তে শিক্ষা কর। নিজ জীবনের সহস্র অসম্পূর্ণ দে'খে এলিয়ে প'ড়ো না, সাহস সঞ্চয় কর, ভগবানের কৃপাপেক্ষী হও, শরণাগত হও। পাপপঙ্কে ডুবে গিয়েও যাঁরা পুনরুত্থান লাভ করেছেন, তাঁদের চরণে বারংবার শ্রদ্ধায় শির লুটাও। এঁরা তোমার পক্ষে টনিক স্বরূপ। এই জীবন দেখে হতাশের প্রাণে আশা জাগে; মহাপাপীও আশ্বাস পায় যে, উদ্ধারের পথ এখনো আছে।

ভাব ও ভাষা

রামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌছিলে আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজ বলিলেন,—এই দেখুন স্বামীজী, আমরা হাতে-লেখা পত্রিকা বে'র করেছি, নাম রেখেছি, "অঞ্জলি", স্কুল-কলেজের ছেলেরা প্রবন্ধ দিচ্ছে।

অতঃপর আশ্রমের মহারাজ শ্রীযুক্ত জ—কে 'অঞ্জলি'র জন্য প্রবন্ধ দিতে অনুরোধ করিলেন। আরও বলিলেন,—কেবল ভাষার ছড়াছড়ি ক'রো না, অল্প কথায় বেশী ভাব থাকে, এমন প্রবন্ধ লিখ্‌বে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রবর্ত্তক লেখকদের পক্ষে এই উপদেশ পালন বড় কঠিন। যতক্ষণ ভাষার উপর বিলক্ষণ অধিকার না জন্মাচ্ছে, ততক্ষণ ভাষা নিয়েই কসরৎ কত্তে হবে বৈ কি? ভাষার সাধন কত্তে কত্তে ভাষার ভিতর দিয়ে ভাব বেরুবে। বীজ-মন্ত্রগুলির যেমন সাধন কত্তে কত্তে তবে রসের

নাগাল পাওয়া যায়, ভাষার চর্চ্চাও তেমনি। শব্দব্রহ্মের সাধন কত্তে কত্তে তবে রসস্বরূপ ব্রহ্মের নাগাল পাওয়া যায়।

সাম্যবাদের বাস্তবতা ও কবিত্ব

ফিরিবার পথে জ—জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোনো কোনো মতাবলম্বীরা বল্‌ছেন, সকল মানুষ সমান এবং তাঁরা সকল মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও কচ্ছেন। তাঁদের এই চেষ্টা কি সাফল্য পাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আংশিক সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাম্যবাদের মধ্যে বাস্তবতা এবং কবিত্ব সমভাবে মিশ্রিত। বাস্তববাদী প্রত্যক্ষ সত্যকে দর্শন করেন, তার অতিরঞ্জন করেন না, কল্পনার পথে চলেন না। কবি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, অতিরঞ্জন করেন, বাস্তবে যা' নাই, কল্পনায় তাকে স্পর্শ করেন, অনুভব করেন। সাম্যবাদের মধ্যে বাস্তবপন্থীর অনুভূতি যেটুকু, সেটুকু বাস্তব-জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে। যেটুকু কবির অনুভূতি, সেটুকু বাস্তব-জগতে প্রতিষ্ঠা পাবে না, মানুষের চির-তরুণ কল্পনাকে আশ্রয় ক'রেই বেঁচে থাক্‌বে। সকল মানুষের সমান শিক্ষার, সমান বিকাশের, সমান উন্নতির, সমান স্বাধীনতার অধিকার থাকা দারকার, এটা বাস্তবপন্থীর অনুভূতি। আর, সকল মানুষই সমান, সবারই স্বাভাবিক সামর্থ্য এক,—এসব হ'ল কল্পনার কথা। এই কল্পনাটুকুর জয় বাস্তব-জগতে হবে না, কিন্তু এই কবি-সুলভ কল্পনাটুকুই নানা রূপ ধারণ ক'রে জগতে

শত শত বার শত শত দুর্নীতিকে, শত শত অবিচারকে, শত শত দুঃখকে ধ্বংস করার আয়োজন যোগাবে।

মনময়সিংহ

১২ই আষাঢ়, ১৩৩৪

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীযুক্ত জ—র বাসায় গেলেন। শ্রীযুক্ত জ—ব্যায়াম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার কাজ তুমি কর, আমরা একটু বসি।

পুরুষানুক্রমিকতার প্রয়োজন

কিছুক্ষণ পরে জ—ব্যায়াম সমাপন করিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকে সবার প্রাণেই এই একটী কথা জাগ্ছে, Superman চাই, অতিমানুষ চাই। কিন্তু এই আকঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত হবে কিসে? উন্নততম দেহ, উন্নততম মন, উন্নততম হৃদয়—এই সব নিয়ে যাঁরা এই জগতে আবির্ভূত হবেন, তাঁরা ত' বর্ত্তমান পিতামাতাদের ঘরেই আস্‌বেন! আজ গৃহীর ঘরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার না হ'লে তাঁরা কি ক'রে আস্‌বেন? পুরুষানুক্রমিক-ভাবে অতি-মানুষত্বকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা না চল্‌লে অতিমানুষদের আবির্ভাব কি ক'রে হবে?

বিবেকানন্দের কৃতিত্ব

কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠিল। জ—

বলিলেন,—বিবেকানন্দ অত অল্প বয়সেই দেহত্যাগ ক'র্‌লেন, নইলে কি-ই জানি ক'রে যেতেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যতটা ক'রে গেছেন, তা-ই আশ্চর্য্য! সেটুকুই এত অদ্ভুত যে, মনে মনে বিস্ময় মানি।

মহাপুরুষের দান

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অনেক মহাপুরুষই দান করেন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সত্য, কিন্তু তাঁদের যে সর্ব্বস্ব-উৎসর্গ, তা' ঐ প্রতিষ্ঠানকে নয়, উৎসর্গটা হচ্ছে জগৎকে। প্রতিষ্ঠানটা তাঁদের কর্ম্ম করবার machine (যন্ত্র) মাত্র। প্রতিষ্ঠানটা দিয়ে অনেক সময়ই তাঁদের যথার্থ পরিচয়ের শতাংশের একাংশও জানা যায় না। তাঁরা নিজেদিগকে জানান, জাতির বা জগতের স্বাধীন চিন্তার শক্তিকে স্ফুরিত করে। জগতের প্রতি তাঁদের প্রকৃত দান হচ্ছে, স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠভাবে চিন্তা করার রুচি, পুরাতনকে নূতন ক'রে ভাব্‌বার প্রেরণা।

গুরু ও গুরুবাদ

গুরু সম্বন্ধে আলোচনা আসিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'গুরু' অমর, তাঁর মৃত্যু নেই। কিন্তু 'গুরুবাদে'র মর্‌বার দিন এসেছে। 'গুরু' থাক্‌বেনই কিন্তু 'বাদ' টুকুকে বাদ দিয়ে। গুরু শাশ্বত সনাতন, কিন্তু 'বাদ' টুকুকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে।

বৈরাগী-সন্ন্যাসী ও অনুরাগী-সন্ন্যাসী

তারপর সন্ন্যাসের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৈরাগী আর অনুরাগী দুই দল আছেন। বৈরাগী বলা হয় তাঁ'দিগকে, যাঁরা জগৎটা মিথ্যা, কামিনীকাঞ্চন বিষ, সংসারটা বন্ধন,—এই সব ব'লে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন। আর, অনুরাগী বলা হয় তাঁ'দিগকে, যাঁরা জগৎটাকে মিথ্যা ব'লে মনে ক'রলেন না, কামিনী-কাঞ্চনকে ভয় করা দরকার ব'লে ভাব্‌লেন না, সংসারকে বন্ধন ব'লে গালি দিলেন না, এদের সবাইকেই ভালবাসলেন, কিন্তু এর চাইতে অনেক বড় একটা ভালবাসার টানে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন। লোককে বল্‌তে শুনেছি যে, শঙ্করাচার্য্য বৈরাগী সন্ন্যাসীদের রাজা, আর শ্রীচৈতন্য অনুরাগী-সন্ন্যাসীদের রাজা। বৈরাগী-সন্ন্যাসী সংসারকে স্বীকার কত্তে ভয় পান, সংসারকে মোক্ষের বিঘ্ন ব'লে মনে করেন, তাই তাকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁর জন্য সংসারটা তোলা থাকে, পরে যে কোনো একটা উপলক্ষ্য ক'রে হোক্ সংসার আবার তাঁকে টান্‌তে চায়, শঙ্করকে কামশাস্ত্র-চর্চ্চার জন্যে রাজদেহে প্রবেশ ক'রে স্থূলভাবে না হোক্, সূক্ষ্মভাবে সংসারের আস্বাদ নিতে হ'য়েছিল ব'লে একটী কাহিনী আছে। অনুরাগী-সন্ন্যাসী সংসারকে সত্য ব'লে মানেন সংসারের সুখগুলিকে সুখ ব'লেই স্বীকার করেন, কিন্তু বৃহত্তর সত্য এবং বৃহত্তর সুখ

তাঁকে আকর্ষণ ক'রেছে ব'লে ছোট সুখ আর তাঁকে টানতে পারে না।

কে বড়—শঙ্কর, না চৈতন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য শ্রীশঙ্কর আর শ্রীচৈতন্য এ দু'জনের মধ্যে কোনো তুলনা করা চলে না। শঙ্কর সূক্ষ্মভাবে সংসারকে আস্বাদন ক'রেছিলেন ব'লেই তিনি চৈতন্যের চেয়ে ছোট নন্ অথবা চৈতন্য প্রথম জীবনে দুইটী পত্নীর পাণি-পীড়ন করেছিলেন ব'লেই তিনি শঙ্করের চেয়ে ছোট নন। নিজ নিজ স্থানে তাঁরা উভয়েই তুলনা-রহিত অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ইনি ছোট, ইনি বড়,—এই জাতীয় তুলনার প্রবৃত্তিও সুন্দর নয়।

অনুরাগী-সন্ন্যাসী ও বৈরাগী-সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—প্রকৃত সংসার-বৈরাগ্য ভগবৎ-প্রেমেই প্রতিষ্ঠিত। ভগবানে প্রেম আছে ব'লেই সাধক সংসারের প্রতি বৈরাগ্য-সম্পন্ন হন। এই সীমাবদ্ধ সংসারের মায়া ও ছলনা বারংবার ভগবানের কাছ থেকে মনকে টেনে এনে ক্ষুদ্রের ভিতর আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চায় ব'লেই তিনি বৈরাগী হন। শুধু বৈরাগ্যের জন্যই কেহ বৈরাগী হন না। বৈরাগ্যটা তাঁর ভগবৎ-প্রেমেরই সুনিশ্চিত এক ফল। বাইরের লোকে তাঁর অন্তরের প্রেমটার অনুধাবন কত্তে পারে না, তাঁর

বৈরাগ্যটাই চ'খে পড়ে। তাই তাঁর নাম বৈরাগী-সন্ন্যাসী। আবার যিনি ক্ষুদ্রের ভিতরে প্রেমকে সমর্পণ ক'রে প্রাণের প্রকৃষ্ট পরিতুষ্টি পান না, ফলে ভূমার ভিতরে প্রেমকে ডোবান, প্রাণকে ডোবান, নিজেকে ডোবান, ক্ষুদ্র সুখের প্রতি তাঁর এমন বৈরাগ্য এসে যায় যে, কিছুতেই তিনি আর ক্ষুদ্র সুখে নিজেকে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন না। ফলে অপরে যে কাম কাঞ্চনকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, ইনিও সেই কামকাঞ্চনকে অনিচ্ছায় ত্যাগ ক'রে আস্‌তে বাধ্য হন। কিন্তু এঁর এই বৈরাগ্য লোকের চ'খে প'ড়ে না, তাই এঁর নাম অনুরাগী-সন্ন্যাসী। দু'জনের ভিতরে পার্থক্যটা এত অল্প যে, এঁদের মাঝে একজনকে শ্রেষ্ঠ, অপরকে নিকৃষ্ট বল্‌বার আমি কারণ খুঁজে পাই না।

শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে কি নারী-সম্ভোগ সম্ভব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুরাগের পথেই চল, আর বৈরাগ্যের পথেই চল, সত্যে পৌঁছুবার পরে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা নাশ পাবেই পাবে। শঙ্কর ব্রহ্ম-দর্শী পুরুষ, তবু তাঁকে মৃত রাজদেহে প্রবেশ ক'রে রাজ-ললনাদের সম্ভোগ কত্তে হ'য়েছিল, এর কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না । যিনি পূর্ণ সত্য দর্শন ক'রে সর্ব্বসংস্কারের ক্ষয় করেছেন, রাজান্তঃপুরিকাদের সাথে রতি-শাস্ত্রানুশীলন ক'রে তাঁর ভোগ-সংস্কার ক্ষয়ের কোনো প্রশ্নই উঠে না। আচার্য্য শঙ্কর সম্পর্কে এই কাহিনী তাঁর অসিদ্ধ

অবস্থায় নয়। পূর্ণ সিদ্ধ-তাপস যোগীশ্বর আত্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ শঙ্করের মনে কোনও পূর্ব্বসংস্কারেরই প্রভাব থাক্‌তে পারে না। জগতে সর্ব্বসংস্কারপ্রমুক্ত ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ নিখিল-ভুবন-কল্যাণ সন্তানের জন্মদানের জন্য রমণীসঙ্গ কত্তে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ প্রয়োজনের অভাব। তবে শঙ্করের এ কাণ্ড করা কেন? আমার মত এই যে, শঙ্কর এরূপ কোন কাজই করেন নাই। গ্রাম্য-মনোভাবসম্পন্ন সাধারণ লোকদের কাছে শঙ্করের যোগমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে অল্পবুদ্ধি লোক এ কাহিনী কল্পনা থেকে রচনা করেছে মাত্র। পরে অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও গল্পটা মেনে নিয়েছেন। সত্যে পৌঁছুবার পরে ইন্দ্রিয়ের ভোগ-প্রয়োজন থাকে না। শঙ্করেরও সে প্রয়োজন ছিল না। নিস্প্রয়োজনীয় কাজ করার অবসর সেই অসামান্য ব্যক্তির থাক্‌তে পারে না, যিনি পদব্রজে নিখিল ভারতের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ ক'রে অতি অল্প কয়েকটী বৎসর বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ও বৌদ্ধধর্ম্ম নির্জ্জিত করেছিলেন।

রাগমার্গেও বৈরাগ্য আছে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, রাগমার্গেও বৈরাগ্য আছে। শ্রীচৈতন্য রাগমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধক। ভগবৎপ্রেমে ব্যাকুল হ'য়ে তিনি যুবতী পত্নীর গভীর প্রণয়, বৃদ্ধা মাতার অসীম স্নেহ উপেক্ষা ক'রে "হা-কৃষ্ণ" "হা-কৃষ্ণ" কত্তে কত্তে বেরিয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু জীবনে আর দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখদর্শন কর্ল্লেন না কেন, বলত?

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে বুক ভাসালেন, কিন্তু জগতের সকলের অশ্রু যিনি প্রেমস্পর্শে মুছাবেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার চ'খের জল মুছান তিনি কর্ত্তব্য ব'লে জ্ঞান কর্‌লেন না। শত অনুরোধ, শত উপরোধ, শত অনুনয়, শত বিনয় এক্ষেত্রে নিষ্ফল। কুসুমকোমল গৌরাঙ্গ কেন এত কুলিশ-কাঠোর? কারণ, রাগমার্গও বৈরাগ্যেই ভিত্তিমান্।

ময়মনসিংহ

১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৪

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিকাল বেলা দুইটী সঙ্গীসহ শ্রীযুক্ত জ—আসিলেন। সঙ্গীদ্বয় পথে পথে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে আসিতেছিলেন। প্রথম সঙ্গী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক্তা প্রমাণ করিতেছিলেন, দ্বিতীয় সঙ্গী স্ত্রীশিক্ষার কুফলগুলি প্রদর্শন করিতেছিলেন।

উভয়ের যুক্তিসমূহ শ্রবণান্তর শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বিতীয় সঙ্গীকে বলিলেন,—তুমি যে দোষ দেখাচ্ছ, ওটা হচ্ছে, বর্ত্তমান শিক্ষা-রীতির এবং শিক্ষা যে পাত্রে পড়্‌ছে, সেই পাত্রের। কু-রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাই সুফল দেখ্‌তে পাচ্ছ না। আর, যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছেন, সে সব মেয়েরাও সবাই খুব উৎকৃষ্ট আধার নয়। জন্ম থেকেই উৎকৃষ্ট আধার না নিয়ে এলে, শিক্ষার সুফলকে এঁরা ধারণ কর্ব্বেন কি ক'রে? খবরদার বাপু, শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রো না। স্ত্রীশিক্ষা নেই ব'লেই আজ ভারতবর্ষ কোনো

সত্যিকার আন্দোলনেই ষোল আনা জয়ী হ'তে পাচ্ছে না। অশিক্ষিতা নারীদের পিছন-টানে যুদ্ধে পরাজয় হচ্ছে। নারী যখন যথার্থ শিক্ষা পাবে, তখন দেখো, সে তার পুরুষ-সঙ্গীকে সত্যের অভিযানে কত উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে দেয়। তখন দেখো, স্ত্রীজাতি তার নিজের হৃদয়ের সাহস দিয়ে, দৃঢ়তা দিয়ে কেমন ক'রে পুরুষ-জাতির কর্ত্তব্যে উপেক্ষা ও কাপুরুষতা দূর ক'রে দেয়। স্ত্রীশিক্ষা আজ খুবই দরকার, তবে বর্ত্তমান শিক্ষার কু-রীতি ও অসম্পূর্ণতা দূর ক'রে নিতে হবে।

স্বাধীন মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—স্ত্রীশিক্ষার অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য শাসক-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ প্রার্থনার আমাদের কোনো দরকার প'ড়বে না। নিজেদের শক্তিতেই এ কাজটী আমাদের কত্তে হবে এবং এ কাজ আমরা পার্‌বও। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অনাদৃতা, অবজ্ঞাতা বাল-বিধবাদের খুঁজে বের কত্তে হবে, তাঁদের এনে সুশিক্ষিতা ক'রে নিয়ে গ্রামে গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে। ত্যাগ বৈরাগ্য ও পরার্থ এই তিনটী স্তম্ভের উপরে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে এবং আক্ষরিক শিক্ষা, সাহিত্যিক শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছু এই আদর্শেরই অনুগত ক'রে চালাতে হবে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য

কতক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত জ—র সঙ্গীদ্বয় চলিয়া গেলেন,

জ—রহিলেন এবং বাঁশাটী-নিবাসী একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিলেন। নানা ধর্ম্মকথার আলোচনার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন,—দেখুন, ইক্ষু এত মিষ্টি, তার যদি ফল হ'ত, তাহ'লে আরো জানি কতই মিষ্টি হ'ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইক্ষুর ফল হ'লে ইক্ষু আর এত মিষ্টি থাক্‌ত না, যেমন ডিম হ'লে আর ইলিশ মাছে স্বাদ থাকে না, কেননা আত্মদানকারী ব্যক্তি জগতের সেবায় নিজেকেই বিলিয়ে দেয় ব'লে সমগ্র মিষ্টত্ব তাকেই আশ্রয় করে; আর যারা জগৎকে তাদের সন্তান দান করে, তাদের নিজেদের ভিতরে মিষ্টত্ব থাকে না, মিষ্টত্ব গিয়ে আশ্রয় নেয় সন্তানে। আম গাছটা মিষ্ট নয়, কেননা, সে দান কচ্ছে তার সন্তানকে, নিজেকে নয়। ইক্ষুটা এত মিষ্টি সেই জন্যে যে, নিজের মাথাটা বাঁচিয়ে সে দান কর্ব্বে না, সে দান কর্ব্বে তার নিজের দেহ, নিজের প্রাণ। আর, আমগাছটা মিষ্টি নয়, কেননা, হোক্ না সে দাতা, কিন্তু আত্মদাতা নয়,—ফলদাতা, সে দান করে আত্মরক্ষা ক'রে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে।

ময়মনসিংহ

১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৪

কতিপয় স্কুল-কলেজের ছাত্রের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মপুত্র-তীরে ঘাসের উপরে এক জায়গায় বসিলেন। যশোদল-নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ-যুবক পথে পথে তাঁহার উপদেশ শুনিতে শুনিতে আসিতেছিলেন।

মমত্ববোধের অভাব ও জাতীয় অবনতি

যশোদল-নিবাসী যুবকটীকে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের গ্রামে কি কি লোকের বাস?

যুবক।—এই আমরা কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছি, আর কয়েক ঘর নমঃশূদ্র ও মুসলমান আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমরা ক'ঘর উঁচু জাত 'আছি', আর ওরা ক'ঘর ছোট জাত 'আছে'! কেমন, এই না? এই দেখ, একটা 'আছি', আর একটা 'আছে'-র তফাতে সমস্ত গ্রামটা কেমন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল! জোড়া অখণ্ড একটা গ্রাম, শুধু একটু মমত্ববোধের অভাবে আধখানা হ'য়ে গেল, দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে গেল। নমঃশূদ্রের আর মুসলমানদের তোমরা 'আমি'র গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনতে পার্‌লে না, 'ভাই' ব'লে, 'আপন' ব'লে ভাবতে পারলে না, 'পর' ব'লে দূর ক'রে দিলে, 'ছোট' ব'লে আলাদা ক'রে রাখলে। আমাদের জাতীয় দুর্গতির এইটেই হচ্ছে সব চাইতে বড় কারণ।

যথার্থ মানুষ

যুবক অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার মন হইতে লজ্জার গ্লানিটুকু দূর করিবার জন্য দু-একটী আদরের কথা কহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—দেখ, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি বড় জাতগুলি নিজেরা নিজেদিগকে যতই বড় মনে করুক না কেন, মনুষ্যত্বে যারা খাটো, তাদের আমি বড় ব'লে

কিছুতেই মানি না। মনুষ্যত্বের সাধনায় তোমরা পিছিয়ে যাচ্ছ, তবু কি বড়াই ক'রে বেড়াবে যে, তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা কায়স্থ? মেথ্‌রাণীর ঘরের জারজ ছেলেটাকে যখন দেখি, দুঃখীর দুঃখে অধীর হ'য়ে ছুটে আসে, দেব-বিগ্রহের সামনে দাঁড়াতেই ভাবে-ভক্তিতে দরবিগলিত-ধারে অশ্রুবর্ষণ করে, নিজের কাজে ক্ষতি ক'রেও পরের কাজটুকু নিঃস্বার্থভাবে ক'রে দিয়ে যায়, তখন আমি তাকে সমস্ত দেশের সকল ব্রাহ্মণের চেয়ে ঢের বড়-মানুষ ব'লে মানি। আমরা ঋষি-মহর্ষির বংশেই জন্মেছি বটে, কিন্তু এই সব উচ্চ বংশে জন্মালে সেই জন্মটার দাবীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য যা' দরকার, তার ত' কিছুই কচ্ছিনে!

ত্রুটীহীন কর্ত্তব্যপালন

নানা প্রশ্নোত্তরের পর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের চাই ত্রুটীহীন কর্ত্তব্যপালন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আমাদের এক এক জনের এক এক প্রকার হ'তে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চাই সমান গভীর, সমান একাগ্র। আমি যাকে ভাল ব'লে বুঝ্‌তে পাচ্ছি তা-ই আমাকে কত্তে হবে ষোল আনা প্রাণ দিয়ে। তুমি যাকে ভাল ব'লে বুঝতে পাচ্ছ, তা-ই তোমাকে কত্তে হবে একেবারে কায়মনোবাক্যে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির তফাৎ হোক্ তাতে কিছু যায়-আসে না, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই চাই সমান দৃঢ়। বিভিন্ন জনের সংস্কার, শিক্ষা ও সামর্থ্যের বিভিন্নতা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকেও বিভিন্নতা দেবে। কিন্তু প্রত্যেকে যখন আমরা

কর্ত্তব্যপরায়ণ হব, তখনই আমাদের মনুষ্য-জন্ম সার্থক হবে, আমাদের দ্বারা জগৎ কল্যাণবন্ত এবং জন্মভূমি লাভবতী হবেন।

ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ

ইহার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দেবের বাসায় আগমন করিলেন। সুরেশবাবু উকিল শ্রীযুক্ত তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশ্রীবাবামণিকে পরস্পরের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

তারাপদ বাবু বলিলেন,—আপনারা আলোক লাভ করেছেন, আমরা অন্ধকারে ডুবে আছি, আপনাদের উচিত আমাদের ভিতরের অন্ধকার দূর ক'রে দেওয়া।

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়মেব সুপ্রকাশ। সে জ্ঞান সর্ব্বত্র রয়েছে, সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ আলো আপ্‌নি জ্বল্‌ছে, কাউকে এসে জ্বালিয়ে দিতে হয় না। আপ্‌নি, আমি, সুরোশবাবু প্রভৃতি জীবমাত্রেই প্রত্যেকে self-contained (নিজেতেই নিজে পূর্ণ)। পাথরকুচি গাছ দেখেছেন? পাতা খ'সে মাটিতে পড়্‌ল, আর অম্‌নি তাই থেকে নূতন গাছ গজাল। গাছ গজাবার যা-কিছু সব ঐ পাতাটার ভিতরে ছিল। পাতাটার শুধু প্রয়োজন ছিল মাটীর কোলে আশ্রয় লওয়া, মায়ের বুক জড়িয়ে থাকা। আমাদেরও ঠিক্ তাই। পূর্ণতার সব কিছু সরঞ্জাম আমাদের ভিতরেই রয়েছে কিন্তু নিজেকে পূর্ণরূপে বিকশিত ক'রে তোলার জন্য আবশ্যক আছে শুধু মাটিতে পড়া, মায়ের কোলে আশ্রয় নেওয়া, ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ

করা। যে ভাবেই হোক্ না কেন, ষোল আনা আত্মসমর্পণ হ'লেই হ'লো।

ময়মনসিংহ
১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৪

স্ত্রী-বর্জ্জনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

বৈকাল বেলা শেকন্দরনগর-নিবাসী জনৈক যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিত একখানা ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক গ্রন্থের প্রুফের কাগজগুলি দেখিতে লাগিলেন।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে উপদেষ্টারা স্ত্রী-বর্জ্জন সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসাহ দেখিয়েছেন। এই উৎসাহের মধ্যে কি কিছুটা কাল্পনিকতা নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর করিলেন,—প্রচুর আছে। নারীমাত্রেই কল্যাণঘাতিনী, এটা হ'ল তাঁদের এক কল্পনা, দ্বিতীয় কল্পনা এই যে, পুরুষ-মাত্রেই নারী-জাতির প্রতি ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁদের এ দুটো ধারণায় কিছু সত্য আছে, কিন্তু অতিরঞ্জন আছে। এই অতিরঞ্জন থেকেই উপদেশের বেলা অত বাড়াবাড়ি হয়েছে। নির্জ্জনে মায়ের কাছেও থাক্‌তে পার্‌বে না, এমন উপদেশ বিভীষিকাগ্রস্তের মুখেই শোভা পায়। মাতা ও পুত্রের মধ্যে সম্বন্ধের যে পবিত্রতা রয়েছে, সেইটুকু যাঁর মনে আছে, তাঁর মুখে এমন উদ্ভট উপদেশ বের হ'তে পারে না। * * * আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষের পানে। স্ত্রীজাতি

যদি এতদিন পুরুষজাতির শুধু পতনেরই কারণ হ'য়ে থাকেন, তবে আজ সেই পন্থাটা বে'র ক'রে নিতে হবে, যাতে তাঁরা পুরুষের উন্নতির কারণ হ'তে পারেন। চিরকাল তাঁরা শুধু পুরুষজাতির পতনই ঘটাবেন, আর ব্যাস-বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে শঙ্কর-তুলসীদাস প্রভৃতির নিন্দাভাজনই হবেন,—এই ধারাটা বদ্‌লে নিতে হবে। স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই পুরুষদের চিত্তবিকার শুরু হবে, এই দুঃখজনক অবস্থাটারও পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য বা তুলসীদাস প্রভৃতি কোনো মহাপুরুষই নিজ পারিপার্শ্বিককে ষোল আনা অস্বীকার কত্তে পারেন নি, ভবিষ্যতেও কেউ পার্‌বেন না। তাই তাঁরা সাধারণ গ্রাম্য লোকদের ধারণার সাথে মিল রেখে সংযম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ব'সেই স্ত্রীজাতিকে হেয় কত্তে বাধ্য হয়েছেন। তারই জন্যে আজকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লোকমতকে এতটা উন্নত করা, যেন ভবিষ্যতের সংযমোপদেষ্টারা পুরুষকে উপদেশ দিতে গিয়ে স্ত্রীজাতিকে গাল দিতে বাধ্য না হন। কারণ, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে অতীতের ভারতবর্ষের চাইতে ঢের বড় হ'তে হবে এবং ভবিষ্যতের মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বর্ণনা হবে, তাতে কর্ণার্জ্জুনাদি বীর-পুরুষদের পাশেই থাক্‌বেন তাঁদের বীরাঙ্গনা সমধর্ম্মিণীরা। আর, ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ-চরিত, চৈতন্য-চরিতামৃত বা শঙ্কর-বিজয় লিখিত হবে, তাতে বুদ্ধদেব গোপাকে সঙ্গে নিয়েই বোধিদ্রুমমূলে তপস্যায় বস্‌বেন, শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধ'রেই ঘর ছেড়ে পাগল হ'য়ে বের হবেন,

আর শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রকে সংসারে রেখেই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়ে জ্ঞান-সাধনায় প্রবর্ত্তন দেবেন।

ময়মনসিংহ

১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪

অভয়দাতা গুরু

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক সমাগত ভক্তকে বলিলেন,—যখন গুরু তাঁর ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান রাখতে অক্ষম হন, তখন তিনি নিজ গুরুত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন। অভয় বিতরণই গুরুর কাজ, শুধু বিতরণ নয়, heart (হৃৎপিণ্ডের) মধ্যে অভয় একেবারে inject ক'রে (ঢুকিয়ে) দিতে হবে যেন প্রত্যেকটা রক্তস্পন্দনের মাঝে অভয়ের নাচন চল্‌তে থাকে। হতাশকে তিনি আশা দিতে জানেন, অবসাদ-গ্রস্তকে তিনি উৎসাহ দিতে পারেন, অক্ষমকে তিনি বলদান কত্তে পারেন,—তাই তিনি গুরু। শুধু মন্ত্র দিলেই গুরু হয়? শিষ্যের প্রাণের নূতন সজীবতা তিনি এনে দেবেন,—"এই দেখ্ তোর ভবিষ্যৎ, কত উজ্জ্বল, কত মহান্"—তবে ত' তিনি গুরু।

আসক্তি ও নাম-সেবা

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসক্তি দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নামের সেবাতে প্রাণময় সমর্পণ করা। নামের কোলে আশ্রয় নিলে, যে আসক্তি তোমার পক্ষে

অহিতকর, তা' আপনি দূর হবে। আসক্তি দূর করার জন্যে আর নূতন তপস্যা কত্তে হয় না,—নামের সেবাই পরম তপস্যা। এ তপস্যা যে করে, সে সকল তপস্যার ফল পায়।

ভবিষ্যতের মহাজাতি

দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীযুক্ত জ— ও শ্রীযুক্ত ব—আসিলেন। নানা হিত প্রসঙ্গে কালাতিপাত হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভবিষ্যৎকেই আমি ধ্যান কচ্ছি। স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি, এক নূতন দুর্দ্ধর্ষ জাতি এক অভিনব মহাশক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি ক'রে ভারতবর্ষকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে, স্পষ্ট যেন মনে হচ্ছে, সংযম-শুদ্ধ এক মহাবীর জাতি, তপঃপবিত্র এক অকুতোভয় জাতি নূতন চিন্তা, নূতন সাহিত্য, নূতন দর্শন, নূতন চেষ্টা ও নূতন মনুষ্যত্ব দিয়ে সমগ্র দেশটা নবযৌবনশ্রীতে মণ্ডিত ক'রে তুলেছে। নূতন চন্দ্র, নূতন সূর্য্য আকাশে যেন ঝক্‌ঝক্ কচ্ছে। নর-নারীর শিরায় শিরায় যেন নব-বিদ্যুৎ-প্রবাহ বইছে, তাদের দেহের অস্থি ত' দূরের খথা, এক এক বিন্দু রক্তের মধ্যেই যেন হাজার হাজার বজ্রের উপাদান সঞ্চিত রয়েছে।

ময়মনসিংহ

১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৪

সকলের গুরু এক

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হইলেন। ট্রেণে

বসিয়াই বলিলেন,—

"আমার গুরু, তোমার গুরু,
রামের গুরু, শ্যামের গুরু,
সবার গুরু, একই গুরু,
এই বোধেতেই সাধন সুরু।"

আত্মনিষ্ঠা

ট্রেণে বসিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্র লিখিলেন,—

"গুরু-উপদেশ লভি' মনে মনে ভাব যদি
তাঁরই হাতে রহিয়াছে মোক্ষের চাবি,
জানিও, পড়িয়া পথে কেবলি কাঁদিতে হবে
অসহায়,—চিৎপাত, খাবে শুধু খাবি।"

কাম-চিন্তার প্রতীকার

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শায়িত অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে তৎক্ষণাৎ উঠে ব'সে পড়্‌বে। উপবিষ্ট অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যাবে। দণ্ডায়মান অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে ছুটাছুটি লাফালাফি আরম্ভ কর্‌বে। ছুটাছুটি অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে স্থিরাসনে ব'সে নাম-জপ করবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ধীর অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে জোর ক'রে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ফেল্‌তে আরম্ভ করবে, শ্বাস-প্রশ্বাসের চঞ্চল অবস্থায় কাম-চিন্তা এলে ধীর-মন্থর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস

নেবে। কথা কইবার সময়ে কাম-চিন্তা এলে তৎক্ষণাৎ মৌনী হ'য়ে পড়বে, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য দিয়ে নাম-জপ কর্‌বে। আবার কথা না কইবার সময় কাম-চিন্তা এলে সৎকথা কইতে আরম্ভ করবে; ভগবৎ-সঙ্গীত করবে।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধ্যান করার সময়ে যদি কাম-চিন্তা আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাহ'লে পৃথক্ ব্যবস্থা। ধ্যান জপের সময়ে যিনিই আসুন, ছোট-লাট, বড়-লাট কারো পানেই তাকানো হবে না, আসল কাজে শৈথিল্য করা চল্‌বে না। কামই আসুন আর ক্রোধই আসুন, তাঁদের মনে তাঁরা যা' খুশী তাই করুন, ধ্যান জপে দৃঢ়তা কমান হবে না। কাম যদি প্রবলও হয়, হোক্, নামের বলে কাম আপনি পদানত হবে, এইটী দৃঢ়রূপে বিশ্বাস ক'রে আত্মকর্ম্মেই লেগে থাকতে হবে।

জাতিভেদ

ট্রেণ কিশোরগঞ্জ ষ্টেশানে পৌঁছিলে স্থানীয় কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি যে এই ট্রেণে যাইতেছেন, এই সংবাদ তাঁহারা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ব—কে বলিলেন,—তোরা আমায় ডেকেছিলি জাতিভেদের কুল-কিনারা কত্তে! দেখ্‌ত', কি বিপদেই না ফেলেছিলি। মেডিকেল স্কুলের মরা-কাটা আর জাতিবিচারের মীমাংসা করা, সমান কথা।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—বর্ণভেদ কি আর বেঁচে আছে রে? যে দিন থেকে হিন্দুর রাজত্ব গিয়েছে, সেদিন থেকে জাতিভেদ গিয়েছে। হিন্দু যদি আবার ফিরে রাজা না হয়, তা' হ'লে জাতি-বিচারও আর ফিরে আসবে না। হিন্দু যে ভবিষ্যতে আবার ভারতের রাজতক্তে বস্‌বে তেমন দুরাকাঙ্ক্ষা কেউ ক'রো না, করা উচিতও হবে না। কারণ, বর্ত্তমান ভারত শুধু হিন্দুর ভারত নয়, এ ভারত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের। সুতরাং জাতিসংস্কারের ঐ মৃতদেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা বৃথা। ওটাকে ওটার পথ দেখ্‌তে দিয়ে তোরা আগে সব মানুষ হ', তোরা আগে নিজেদের চিনে নে, তোরা আগে আপন আপন পূর্ণতার সাধন ক'রে নে। জাতিভেদ থাকুক আর যাক্, সে চিন্তা না ক'রে তোরা আগে মনুষ্যত্ব লাভ কর্, পরার্থে স্বার্থত্যাগ করতে শিক্ষা কর, তোদের ভিতরে শ্রেষ্ঠতালাভের যতগুলি সম্ভাবনা আছে, সবগুলিকে অনুশীলনের দ্বারা প্রস্ফুটিত ক'রে তোল্। একটা প্রকৃত মানুষের দাম এক লাখ ব্রাহ্মণের চাইতে বেশী, এক লাখ ক্ষত্রিয়ের চাইতে বেশী, এক লাখ বৈশ্যের চাইতে বেশী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব'লে পরিচয় দেবার জন্য বৃথা আন্দোলন না ক'রে, মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হবার জন্য আন্দোলন কর্। ব্রাহ্মণগুলি তাঁদের লক্ষ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ সভ্যতার মৃত কঙ্কাল নিয়ে আফ্‌শোষ মিটাতে থাকুন, আর তোরা নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন ক'রে ভারতে এক নূতন জাতীয়তা, নূতন সভ্যতা, নূতন যুগ সৃষ্টি

ক'রে নে। ব্রাহ্মণদের মুখপানে তাকিয়ে থেকে কি হবে?

এইটুকু বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুই কি জাত রে?

ব—বলিলেনঃ—কপালী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে দেখ্‌ছিস্ আমার ব্রাহ্মণবংশজাত দেহ, আর ঐ যে তোর কপালী-বংশজাত দেহ, এ দু'টোকে কেটেকুটে দেখ্‌ত দেখি, পার্থক্য কিছু মিলে কিনা? তোর প্লীহাটা তোর পেটে, আর আমার প্লীহাটা আমার পিঠে পাওয়া যায় কিনা?

আদি ব্রাহ্মণের তিন জাতিতে পরিণতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একদা আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতি ছিলেন না। ক্রমশঃ যখন সমাজটা জন-সংখ্যায় বেড়ে গেল, যুদ্ধের নিয়ত প্রয়োজন এসে গেল, প্রচুর অন্ন উৎপাদনের জন্য বৈদিক ঋষিকে বল্‌তে হ'তে লাগল,—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতম্", তখন গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতির সৃষ্টি হ'ল। আর্য্য মানে পূজনীয়। আর্য্যের মধ্যে শূদ্র ছিল না বা থাক্‌লেও অতি অল্প থাকার কথা।

শূদ্র সৃষ্টির ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শূদ্র জাতির বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি

হ'তে লাগল অনার্য্য জাতিগুলিকে জয় করার পরে। অনার্য্য জাতির মধ্য হ'তে যারা গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণরূপে, ক্ষত্রিয়রূপে বা বৈশ্যরূপে আর্য্যজাতির অঙ্গীভূত হ'তে পার্লেন না, তাঁরা শূদ্র হ'য়েই আর্য্য হ'লেন। কিন্তু তাঁদের ব্রাহ্মণ হবার পথ রুদ্ধ করা হ'ল না। শাস্ত্রে বারংবার বলা হ'ল, শূদ্র যদি শুদ্ধাচারী হয়, তবে তাঁর উপনয়ন হবে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হবে। আজ যদি তোমরা মানুষ হও, তবে এ কথাগুলি বুঝতে পার্‌বে। নইলে শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রেই থাক্‌বে, মুখের কথা মুখে খৈয়ের মত কেবল ফুট্‌বে কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কেউ হবে না।

ব্রাহ্মণত্বের আকাঙ্ক্ষী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা নিদারুণ বৈশ্য, কিছুতেই শূদ্র নও, অমুক শাস্ত্রে, অমুক সংহিতায় তোমাদের নাম বৈশ্য-তালিকাভুক্ত, এসব কথা নিয়ে আন্দোলন ক'রে কোনো লাভ নেই বাবা। আন্দোলন কর, ব্রাহ্মণত্ব তোমাদের লক্ষ্য। তপস্যা দ্বারা, সাধনা দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোপলব্ধির দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হবে। সবাই মিলে তোমরা ব্রাহ্মণ হও, ব্রাহ্মণ্যের বলে পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে এক জাতিতে পরিণত কর। ব্রাহ্মণত্বের তোমরা আকাঙ্ক্ষী হও।

জাতীয় পরাধীনতা ও সন্ন্যাস

রাত্রি আটটায় শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছিলেন এবং

মেড্ডাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-সংবাদে গ্রামবাসী অনেকে আসিয়া বসিলেন, স্থানীয় সদনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন:—সম্প্রতি কোন বিবাহিত দেশকর্ম্মী এ অঞ্চলে সন্ন্যাসের আদর্শটাকে হেয় ও নিকৃষ্ট ব'লে প্রমাণ কর্‌বার জন্যে একেবারে আদা-নূন খেয়ে লেগেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' লাগুন, কারণ গৃহীর পক্ষে গার্হস্থ্য-প্রীতি স্বাভাবিক। আর, সন্ন্যাস ত' সকলের জন্য নয়ও, সুতরাং সর্ব্বজনীন ভাবে সন্ন্যাসের ব্যাপ্তির সম্ভাবনা দেখ্‌লে দেশের চিন্তাশীল লোকদের সতর্ক হওয়া বড় আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সন্ন্যাসের মধ্যে যে সত্যটুকু আছে, কোনও যুক্তি বা কোনও তর্কেই তাকে পরাজিত কত্তে পার্‌বে না।

কুমুদবাবু।—এঁরা বল্‌ছেন যে, শঙ্করাচার্য্য আর বুদ্ধদেব, এই দুজনেই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করেছেন। শঙ্কর ও বুদ্ধ যদি সন্ন্যাস প্রচার না কত্তেন, তা' হ'লে ভারতবর্ষ সাতশত বছর মুসলমানের পদতলে আর দেড়শত বছর ইংরাজের অধীন থাক্‌ত না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওটা ভিত্তিহীন কথা। জয়চাঁদ যে পৃথ্বীরাজকে সহায়তা কর্‌লেন না, ওটা বুদ্ধ-শঙ্করের শিক্ষার ফল নয়। মীরজাফর যে দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌লেন, তার জন্যও বুদ্ধ-

শঙ্করকে দায়ী করা চলে না। জাতির মনুষ্যত্বহীনতাই পরাধীনতাকে ডেকে এনেছে, শঙ্কর-বুদ্ধের উপদেশ নয়। ভুলে গেলে চল্‌বে না যে, পুরুরাজকে অপদস্থ করার জন্যে তক্ষশিলার রাজা যে আলেকজাণ্ডারকে সহায়তা করেছিলেন, জয়পুর ও যোধপুরের মহারাজেরা যে চিতোর ধ্বংস কর্ব্বার নিমিত্ত আকবরের উত্তর-সাধক হয়েছিলেন, তার মধ্যে বুদ্ধের অহিংসা বাদ বা শঙ্করের মায়াবাদ কোনো বলসঞ্চয় করে নি।

সংসার ও সন্ন্যাস

কুমুদবাবু।—এঁদের মত এই যে, বিবাহিত জীবনই প্রত্যেককে গ্রহণ কত্তে হবে। যারা তা' করবে না, তারা যতই মহৎ হোক্, প্রকৃত দেশসেবী হ'তে পার্ব্বে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ মতটা হচ্ছে, দুইদিক্ না দেখার ফল। সবাইকে একই খোঁয়াড়ে যে ঢুকাতে যাবে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। যার যেমন যোগ্যতা, তাকে তেমন পথ ধর্‌তে হবে। যে নিজের যোগ্যতা ও রুচি না বুঝে পথ ধরে, সে শেষে ঠকে। কতগুলি লোক সংসারী জীবনের যোগ্যতা নিয়ে আসেন,—তাঁরা সংসারীই করুন, সংসারের ভিতর দিয়েই দেশ, সমাজ ও জগতের সেবা করুন। আবার কতগুলি লোক সন্ন্যাসের যোগ্যতা নিয়ে আসেন,—তাঁরা সন্ন্যাসীই হোন, সেই দিক্ দিয়েই দেশ, সমাজ ও জগৎকে লাভবান কত্তে চেষ্টা করুন। আমি ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি, সংসারী ও সন্ন্যাসী উভয়ের

জীবনেই সত্য আছে, উভয়ের জীবনেই গৌরব আছে, উভয়ের জীবনেই সৌন্দর্য্য, মঙ্গল ও বীরত্ব আছে। সুতরাং এর একটারও বিনাশ নাই। সংসারও চিরস্থায়ী, সন্ন্যাসও চিরস্থায়ী। সংসারাশ্রম আর সন্ন্যাসাশ্রম পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। সংসার যখন পাপ-পঙ্কে ডুবে যায়, সন্ন্যাস তখন তাকে প্রাণপণ-বলে টেনে তুলে আনে, আর, সন্ন্যাস যখন আদর্শভ্রষ্ট হয়, সংসার তখন তাকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়ে তার কালিমাকে দূর ক'রে দেয়। কখনো সন্ন্যাস সংসারের গুরু হচ্ছে, কখনো সংসার সন্ন্যাসের গুরু হচ্ছে। এরা ত' প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এরা সহযোগী। এদের মধ্যে বিরোধ নাই,—বৈচিত্র্য আছে মাত্র। এইটুকু বুঝ্‌তে না পেরেই গৃহিরা কচ্ছেন সন্ন্যাসীর নিন্দা, আর সন্ন্যাসীরা দিচ্ছেন গৃহীকে গাল।

গৃহী ও সন্ন্যাসীর পারস্পরিক ঋণ

কুমুদবাবু।—সন্ন্যাসীরা গৃহীদের দু'টো গাল দিলে দিন, তা' বরং সহ্য করা যেতে পারে। কারণ, সন্ন্যাসীরা গৃহীদের কাছে খুব অল্পই ঋণী। দু'মুঠো চাল ভিক্ষা দিয়ে গৃহীরা এমন একটা বিরাট কাজ কিছু ক'রে ফেলে নি, যাতে সন্ন্যাসীদের মাথা কিনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দিক্ বিচার কত্তে গেলে, বল্‌তেই হবে যে, গৃহীরা সন্ন্যাসীদের কাছে যে পরিমাণ ঋণী, তাতে সন্ন্যাসীদিগকে গাল দিতে যাওয়া একটা বিরাট রকমের অকৃতজ্ঞতা।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, সন্ন্যাসী যদি গৃহীকে গাল দেন, তাবে তাও সমর্থন কর্‌বার উপায় নেই। কেন না, সন্ন্যাসী দু'মুঠো ভিক্ষান্ন ছাড়া আরো একটা বড় ধার গৃহীর কাছেই ধারেন। সেটা হচ্ছে তাঁর দেহ। তিনি যত ভাবেই এড়িয়ে চলুন না কেন, মনুষ্যদেহটার জন্য তাকে গৃহীর ঋণ স্বীকার কর্ত্তেই হবে। এ ঋণ অপরিশোধ্য। তাই, সন্ন্যাসীরও উচিত নয় গৃহীকে গাল দেওয়া। গৃহী যদি নিজ জীবনে উন্নতিকে লাভ করার জন্য যত্নবান্ না থাকেন, তবে যে ভাবী সন্ন্যাসীর ভারী বিপদ। যার তার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে ত' আর বুদ্ধ-চৈতন্য হওয়া যায় না। যার বাপ-মা শূকর-শূকরীর জীবন যাপন করে, সে যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'তে পারে, তবে তা' নিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাত্র। তাই, সন্ন্যাসী তাঁর শুদ্ধচেতা পিতা-মাতার নিকট চিরঋণী হ'য়ে থাকেন।

সবাই কি সন্ন্যাসী হইবে

কুমুদবাবু।—কিন্তু এই যে সন্ন্যাসাতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভাব্‌ছে সবাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে, স্বরূপানন্দের উপদেশ পাওয়ার পর আর কেউ ঘরে থাক্‌বে না, এটার কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার আর কি হবে? তাঁদের যা' ভাব্‌বার ভাবুন। কিন্তু স্বর্ণমৃগের জন্ম কি অসম্ভব নয়? সবাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে, এটা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? স্বরূপানন্দ উপদেশ দিন আর না দিন, সন্ন্যাসের যোগ্যতা নিয়ে যারা

জন্মেছে, তারা ত' বেরিয়ে পড়্‌বেই, তাতে বাধা দিতে কে পার্‌বে? আবার ঘরে থাক্‌বার যোগ্যতাই যাদের আছে, তাদেরই বা বাইরে টেনে আন্‌তে পার্‌বে কে? আচার্য্য শঙ্করের "মোহমুদ্গার" সত্ত্বেও দেখুন দেখি কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক চুটিয়ে সংসার ক'রে যাচ্ছে! অর্থাৎ সংসার করার যার যোগ্যতা, "মোহমুদ্গারের" শত আঘাতও তার সংসারীত্বকে ঘুচাতে পারবে না। আবার, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতির শক্তি ও দাবী নিয়ে যারা এসেছে, তাদের সংসারে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বে না, সপ্তসমুদ্রের জলস্রোতও একত্র হ'য়ে। বাপের শাসন, মায়ের কান্না, বন্ধুর অনুযোগ, ভ্রাতার ম্লান মুখ, ভগ্নীর অভিমান, পত্নীর শোক,—এসকল যদি হিমালয়ের মতন স্তূপায়মান হ'য়ে আসে, তবু সব ঝড়ের বাতাসের কাছে ছাতুর মুষ্টির মত উড়ে যাবে। সন্ন্যাসের প্রকৃত যোগ্যতা নিমন্ত্রণেরও অপেক্ষা রাখে না, উদ্দীপনেরও অপেক্ষা রাখে না। নিজ প্রয়োজনে সে নিজেই দীপ্ত হয়। কিন্তু আমার কথাটা কি জানেন? যুবক-ভাইদের কাছে আমার শুধু একটী কথা,—"যে ভাবে যে পার, মানুষ হও; যে পথে যে পার, পূর্ণ হও। যে ভাবে যে পার, জয়লক্ষ্মীরে আপন অঙ্কে তুলিয়া লও।" পথ দেখাবার জন্যে আমি আসি নি, যার যার পথের খোঁজ তারা নিজেরাই ক'রে নিক্ এইটেই আমি চাই। আমি চাই যুবক-মনের স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, যার যে রুচি, সে সেই রুচিকে অনুসরণ ক'রেই জীবনের পূর্ণতাকে

আয়ত্ত করুক ; পরের বুদ্ধি, পরের পরামর্শ যেন তার তরুণ মাথাকে সহজ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত না কত্তে পারে।

কুমিল্লা
১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৪

শ্রীশ্রীবাবামণি জামতলাতে উকিল শ্রীযুক্ত অবনীকুমার গুপ্তের বাসায় আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি অগন্তুক যুবকগণের প্রত্যেকের পরিচয় লইলেন এবং প্রত্যেককেই দুই একটী করিয়া মধুর উপদেশ-বাক্য কহিলেন।

কর্ম্মীর চাতুর্ব্বর্ণ্য

কর্ম্মীর প্রকারভেদ সম্বন্ধে উপদেশ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণবৃত্ত কর্ম্মী কি করেন জানিস? তিনি আগে ভাবের পূঁজি বাড়িয়ে নেন। কর্ম্মে হাত দেবার আগে কর্ম্মের কোটিগুণ উচ্চ চিন্তার তিনি সাধনা করেন। তিনি কর্ম্ম হয়ত অল্পই করেন, কিন্তু যেটুকু তিনি করেন, সবটুকুই ভাবময়, সবটুকুরই পশ্চাতে থাকে হিমাচল-প্রমাণ মহাভাব-সমষ্টি। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৃত্ত কর্ম্মীর প্রকৃতি পৃথক্। ভাবের অসামান্য সঞ্চয় হয়ত বা তাঁর না-ও থাক্‌তে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র সঞ্চয় তাঁর যা' আছে সেইটুকু নিয়েই কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে তিনি অণুমাত্র ভয় পান না। কতখানি সামার্থ্য তাঁর আছে, আর কতখানি তাঁর নেই, সে-বিচারের ধারও তিনি ধারেন না। যা' কত্তে যাচ্ছেন, প্রাণ দিয়েও তা' ক'রে উঠ্‌তে পারবেন কি, না পারবেন, সে কথা ভাববার তাঁর অবসর নাই। প্রেরণা তিনি পেয়েছেন কাজ কর্‌বার,—এমন মরণ বাঁচন যা-ই হোক্, কাজ তাঁকে কত্তেই হবে। জীবন তিনি হাসিমুখে দিয়ে দিবেন, কিন্তু পরাঙ্মুখ হবেন না, নিজের খুঁটি ছাড়বেন না। বৈশ্যবৃত্ত কর্ম্মী কি করেন? তিনি পূঁজি বুঝে কাজ কত্তে চান, কাজের দিকে না তাকিয়ে বারংবার পূঁজির দিকেই তাকান, আর মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবেন,—"তাই ত' শেষটায় লোকসানই হ'য়ে যায় কিনা, তাই ত' শেষটায় মূলধনই মারা পড়ে কিনা—ইত্যাদি।" শূদ্রবৃত্ত কর্ম্মীর সাথে ভাবটাবের সম্পর্ক নাই। তিনি পরের কথায় কাজ করেন, পরের পরামর্শে চলেন, আর একজন কেউ হুকুমদাতা না থাক্‌লে তিনি কাজ কত্তে পারবেন না, কর্ম্মী তিনি যত বড়ই হউন, তিনি অন্যের বুদ্ধির অধীন, তাঁর মস্তিষ্কটা তাঁর নিজের মাথার ভিতরে নয়, সেটা অন্য কারো মাথার মধ্যে।

কিম্বিধ কর্ম্মী প্রার্থনীয়

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্মীর মধ্যে ব্রাহ্মণবৃত্ত আর ক্ষত্রিয়বৃত্ত কর্ম্মীরই আজ প্রকৃত প্রায়োজন। স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণবৃত্ত কর্ম্মীর ভিতরে ক্ষত্রোচিত রীতি এবং ক্ষত্রিয়বৃত্ত কর্ম্মীর ভিতরে ব্রাহ্মণোচিত রীতি আবঞ্ছনীয় নয়। ব্রাহ্মণবৃত্ত কর্ম্মী জ্ঞানবলে বলীয়ান্, ক্ষত্রিয়বৃত্ত কর্ম্মী বাহুবলে বলীয়ান, পরন্তু বৈশ্যবৃত্ত নিতান্ত হিসাবী ব'লে নিয়ত

সংশয়-কাতর, আর শূদ্রবৃত্ত জ্ঞানের অভাবে পরবুদ্ধি-চালিত পুত্তলিকা মাত্র।

কুমিল্লা
২০শে আষাঢ়, ১৩৩৪

সকল পথেরই লক্ষ্য এক

অদ্য বৈকালে শ্রীযুক্ত সু—এবং শ্রীযুক্ত স—শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ-প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—বিচারের পথও পথ, বিশ্বাসের পথও পথ। উভয়ই সুপথ। যে পথ ধ'রেই চল, শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুলে দেখ্‌তে পাবে, উভয় পথ একই জায়গায় গিয়ে মিশেছে, উভয়ের একই পরিণতি। শ্রীরাধা কৃষ্ণ-নাম শুনেই অধীর হ'লেন,—এমন সুন্দর যাঁর নাম তাঁকে ত' না পেলেই চল্‌বে না! আবার, বনের মাঝে কার এক বাঁশী বেজে উঠল,—আর অম্‌নি রাধার প্রাণ বিহ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—এমন যাঁর বাঁশী, তাঁকে ত' আর না পেলেই চল্‌বে না! আবার যমুনায় জল আনতে গিয়ে কদম্বের মূলে অপরূপ-কান্তি এক কিশোরকে দেখে তাঁর চিত্ত আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল,—এমন যাঁর রূপ তাঁকেও ত' না পেলেই চলে না! যাঁর নাম কৃষ্ণ, তাঁকেও চাই; যে বাজায় বাঁশী, তাঁকেও চাই, কদমতলায় অপূর্ব্ব রূপরাশি ছড়িয়ে যে থাকে দাঁড়িয়ে, তাঁকেও চাই! তিন জনের জন্যেই হৃদয় সমান ব্যাকুল,—এ যে এক মহাবিপদ রে। শ্রীরাধা

সংশয়ের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু যে দিন পাগল হ'য়ে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন, সেদিন কিন্তু তাঁর আর জান্‌তে বাকী রইল না যে, যাঁর নাম কৃষ্ণ, বাঁশীও সে-ই বাজায়, যমুনার কূলে নীপতরু মূলে সে-ই থাকে ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠামে ত্রিভুবন আলো ক'রে দাঁড়িয়ে। তখন শ্রীরাধা বুঝলেন, তিনজনই একজন। ঠিক্ তেম্‌নি পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছুলে দেখ্‌তে পাবে, জ্ঞান, কর্ম্ম আর প্রেম,—এই তিনটীই এক, একটীই তিনি। যতক্ষণ তুমি পথ থেকে দূরে, ততক্ষণ জ্ঞান, কর্ম্ম আর প্রেমে দুস্তর সমুদ্রবৎ ব্যবধান। পথ চলা যখন সুরু হ'ল, তখন এই তিনটী যেন সমান্তরাল তিনটী আলাদা পথ। যখন পথ শেষ হ'য়ে এসেছে, তখন এই তিন মিলে এক, একই তখন তিনি।

তর্কে সাধকের অনবসর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞান, কর্ম্ম আর ভক্তি নিয়ে আমরা বড় অনাবশ্যক লড়াই ক'রে থাকি। একদিকের লাভ কুতর্ক, অপর দিকের লাভ সময়-নাশ। দু'টারই মানে আয়ুঃক্ষয়। প্রাণের গতি বুঝে জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ বা ভক্তিপথ আশ্রয় কর এবং তর্ক পরিহার ক'রে নিষ্ঠা নিয়ে পথ চল। চল্‌তে চল্‌তে পথের শেষে এসে দেখ্‌বে, সকল পথেরই গন্তব্য এক। কলহে আর তর্কে অসাধকেরই আনন্দ, ওতে অসাধকেরই উৎসাহ। সাধক ব্যক্তির তর্কের অবসর নেই।

মাতৃভক্তি ও স্বদেশপ্রেম

অদ্য কথা-প্রসঙ্গে অনেক দেশহিতমূলক প্রতিষ্ঠান ও বহু স্বদেশসেবকদের বিষয়ে আলোচনা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়ের আঁচল ধ'রেই বাল্যকালে ভালবাসার অনুশীলন হয়েছে, তবেই না আজ ভালবাসা দেশের পানে ছুটেছে। জন্মভূমিকে আমরা "জননী" ব'লে ডাকি, কিন্তু এই ডাকাটা শিখেছিলাম কাকে অবলম্বন ক'রে? মাকে যে ভালবাসতে পারে নি, দেশকে ভালবাসার বেলা সে যে তার পঙ্গু, আড়ষ্ট, অক্ষম মন নিয়েই ভালবাসবে। তার পক্ষে দেশকে 'মা' ব'লে ডাকা, তার পক্ষে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিয়ে জাতীয়তার জয় ঘোষণা করা যে কত বড় অভিনয় আর কত বড় আত্মবঞ্চনা, তা' বলাই বিড়ম্বনা। দেশকে সেবা দেবার জন্য স্নেহময়ী মায়ের আঁচল ছেড়ে বাইরে ছুটে আসবার অধিকার সেবকের পক্ষে শতবার আছে, কিন্তু মায়ের স্নেহের মহিমাকে সে অগ্রাহ্য করবে কোন্ অধিকারে? আদর্শের আহ্বানে সন্তান মায়ের বুকে শেলও বিদ্ধ কত্তে পারে, কিন্তু মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে না, মায়ের আশীর্ব্বাদকে অস্বীকার কত্তে পারে না।

ধৈর্য্য ও ভগবৎ-সাধনা

দ্বিপ্রহরে চুণ্টা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্ত শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অশ্বিনীবাবু।—আমার মন সামান্য বিপদের সম্ভাবনা দেখ্‌লেই অধীর হ'য়ে উঠে, এর প্রতিকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর প্রতিকার ভগবৎ-সাধনা। ভগবানকে বিশ্বাস করি না ব'লেই আমাদের আত্ম-অবিশ্বাস আসে। আর, আত্ম-অবিশ্বাস আসে ব'লেই বিপদে আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌লে আর ভয়-ভাবনা কিছুই থাকে না, তিনিই তখন সব দুঃখ-কষ্টের দায়িত্ব নেন।

অশ্বিনীবাবু।—ভগবানকে ডাক্‌লে কি দুঃখ-কষ্ট কমে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কমে বৈ কি! আর দুঃখ-কষ্টের পরিমাণ কমুক আর না কমুক, দুঃখের অনুভূতিটা কমে। মনে করুন, আমার হাত কেটে গেছে কিন্তু ব্যাথা-বেদনা আমার অনুভূতিতে আস্‌ছে না, এ অবস্থায় হাত কাটা আর না-কাটায় তফাৎ কি? ভগবানকে ডাক্‌লে দুঃখবোধটা ক'মে যায়, এইটেই ভগবানের এক মস্ত বড় দান। ভগবানকে দয়াময় বলি কেন? যেহেতু, তিনি আমাদের দুঃখ দূর করুন আর না করুন, দুঃখ সইবার ক্ষমতাটা দেন।

শুচিবায়ু দূর করিবার উপায়

অশ্বিনীবাবু।—আচ্ছা, শুচিবায়ু কি কর্‌লে দূর হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমি যে নিত্যপবিত্র, কোন কিছুতেই যে আমার পবিত্রতা নষ্ট কত্তে পারে না, আমার স্বভাবই যে নির্ম্মলতা, একথা জান্‌লে অর শুচিবায়ু থাক্‌তে পারে না। আর ভগবান্ যে সর্ব্বত্র আছেন, তিনি যে সর্ব্বভূতে বিরাজমান,

বিষ্ঠা-চন্দনে সমভাবেই যে তাঁর অস্তিত্ব, এই কথা জান্‌লেও শুচি-বায়ু থাকে না।

অশ্বিনীবাবু।—কিন্তু মন একথা না মানলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মনকে মান্‌তেই হবে,—আপনি শুধু সাধন ক'রে যান। সাধনের বলে নিজে থেকেই সঙ্কীর্ণতা দূর হবে। যে যাঁর সাধন করে, সে তাই হ'য়ে যায়। যে যাঁর সাধন করে, সে তাঁকেই বিশ্বময় অনুভব কত্তে পারে। কিন্তু সাধন বল্‌তে নিয়মরক্ষা বুঝ্‌বেন না। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক দিনই ঠাকুর-ঘরে ব'সে চক্ষু বুজে বাজে চিন্তা করার নাম সাধন নয়। একাগ্রচিত্তে আকুল প্রাণে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের নাম সাধন।

কুমিল্লা

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৪

প্রাতঃকালে পিতৃমাতৃচরণ-বন্দনা

জনৈক উপদেশ-প্রার্থী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে মাতৃপিতৃচরণ বন্দনা কর্ব্বে। তোমার মাতা এবং পিতা তোমার মাতামহের এবং পিতামহের বংশের গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা ঋষিদের আশীর্ব্বাদ নিজেদের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে এসেছেন। এই দুই জনের চরণ ভক্তিভাবে বন্দনার ফলে এই দুই বংশে জাত সকল মহাপুরুষদের তপস্যার শক্তি ও আশীর্ব্বাদের বল তোমাদের মধ্যে এসে বর্ষিত হবে। পিতা এবং মাতা প্রসন্ন থাকলে জীবনের অধিকাংশ দুর্গম পথ

সুগম হ'য়ে যায়। আর, তাঁরা প্রতিকূলে থাক্‌লে প্রচণ্ড উদ্যম, প্রবল উৎসাহ, বিপুল অধ্যবসায় বারংবার মাঝপথে থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়ায়। এই কারণেই নিজ নিজ পিতা এবং মাতাকে অকপট ভক্তিসহকারে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রণাম ক'রে তাঁদের আন্তরিক স্নেহকে আকর্ষণ করা এবং তাঁদের সৎকার্য্যে বিরুদ্ধতাকে জয় করা কর্ত্তব্য।

প্রহ্লাদের পিতৃভক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন:—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতে ঈশ্বরদ্রোহী পিতার নির্দ্দেশ পালন করেন নি, কিন্তু পিতার প্রতি ভক্তিভাব তাঁর ছিল সুগভীর, বিনয় নম্রতা তাঁর ছিল অতুলন, পিতৃ-সম্মান রক্ষা ক'রে চলার অভ্যাস ছিল তাঁর অত্যাশ্চর্য্য। এইরূপ পবিত্র দৃষ্টান্ত-সমূহের অনুসরণ হবে তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

পিতৃমাতৃভক্তি কি অসভ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতামাতাকে ভক্তি করা, তাঁর চরণ বন্দনা করা, তাঁদের প্রতি বিনম্র-স্বভাব হওয়া অসভ্যতা মনে কর্ব্বে তারা, যাদের সমাজে পিতৃ-পরিচয়, গোত্র-পরিচয় একটা অনাবশ্যক ব্যাপার। কিন্তু তোমরা একে অসভ্যতা ব'লে জ্ঞান ক'রো না। তাতে তোমাদের গুরুতর অপরাধ হবে। পিতামাতাকে ভক্তি করার মানেই হচ্ছে অনন্ত অতীত কালের

প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করা। দুনিয়াতে বেইমানের স্থান হয়, পশুরা পশু-বলের প্রতাপে থাক্‌তে পারে, কিন্তু বেইমানকে সুসভ্য বলা ভুল, অকৃতজ্ঞই প্রকৃত বর্ব্বর।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গুরুজনে অসম্মান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নাম ক'রে পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা এবং অবমাননা প্রকাশ করার একটা রেওয়াজ আজকাল দেখা যাচ্ছে। এটা অসভ্যতারই রকমফের মাত্র। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মাতুল শল্য প্রভৃতির সাথে যুধিষ্ঠির-অর্জ্জুনাদির যুদ্ধ পর্য্যন্ত কত্তে হয়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা গুরুজনদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা তাঁদের অসম্মান করেন নি। প্রহ্লাদের কথা ত' আগেই বলেছি। ভারতীয় সভ্যতার শিক্ষাই হচ্ছে এই। আজকাল তোমরা দিনের পর দিন হয়ত সভ্যতর হ'চ্ছ, কিন্তু সাবধান, তোমরা এই ব্যাপারে অভারতীয় হ'য়ো না।

কুমিল্লা

২১শে আষাঢ়, ১৩৩৪

অখণ্ড-মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার হচ্ছেন সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়। জগতে যত মন্ত্র আছে, সব মন্ত্র একত্র কর্ল্লে যে মহাধ্বনি হয়, তাই হচ্ছে ওঙ্কার। এজন্য ওঙ্কার মন্ত্রের নাম হচ্ছে

অখণ্ড-মন্ত্র। অখণ্ড-মন্ত্র যে জপ করে, জগতের সকল মন্ত্র তার জপ করা হ'য়ে যায়, কোনো মন্ত্রই জপ করার তার বাকী থাকে না। অতএব অখণ্ড-মন্ত্রের যিনি সাধক, তিনি অন্য কোনও মন্ত্রের দিকে মন দেবেন না, কাণ দেবেন না। একলক্ষ্য হ'য়ে একমনা হ'য়ে, একব্রত হ'য়ে তিনি শুধু অখণ্ড-নামেরই সেবা কর্ব্বেন।

অখণ্ড-বিগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার-মন্ত্র কাগজে, ধাতুতে, কাষ্ঠফলকে বা কাচে অঙ্কন বা খোদাই ক'রে পূজার আসনে বসালেই ইনি হ'লেন অখণ্ড-বিগ্রহ। অখণ্ড-বিগ্রহের বর্ণ হবে শুভ্র। কারণ, শ্বেতবর্ণ যেমন সকল বর্ণেরই সমন্বয়, অখণ্ড-বিগ্রহ তেমন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিগ্রহের সমন্বয়। একমাত্র অখণ্ড-বিগ্রহের পূজা হ'লে সকল বিগ্রহের পূজা হ'ল, কোনো বিগ্রহেরই পূজা করা আর বাকী রইল না। অতএব, অখণ্ড-বিগ্রহের যিনি পূজক, তিনি অন্য কোনও বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেবেন না, লক্ষ্য দেবেন না। একচিত্ত, একপ্রাণ, একনিষ্ঠ হ'য়ে তিনি শুধু অখণ্ড-বিগ্রহেরই পূজা কর্ব্বেন। জান্‌বে, জপের শত্রু বহুমন্ত্র ধ্যানের শত্রু বহুপ্রতীক।

অখণ্ড-বিগ্রহের মানস-পূজা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। শাস্ত্রে

বাহ্য-পূজাকে সর্ব্বদাই পূজা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নীরবে অখণ্ডনাম জপই তাঁর মানস-পূজা। কারণ, নাম ত' অবিরাম আপনা আপনি তোমাতে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু অখণ্ড-বিগ্রহের বাহ্য পূজাও তাৎপর্য্য-বোধযুক্ত পূজা। এই কারণেই অখণ্ড-বিগ্রহের বাহ্য-পূজাকে কখনও তোমরা অধম ব'লে মনে কর্ব্বে না।

অখণ্ড-বিগ্রহের বাহ্য-পূজা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন:—অখণ্ড-বিগ্রহের বাহ্য-পূজাও অখণ্ড-নামের নিত্য স্মারক। এজন্যই অখণ্ড-বিগ্রহের বাহ্য-পূজাও এত প্রশস্য। বিল্বপত্র, তুলসী-পত্র ও দুর্ব্বাচন্দনাদিসহ পুষ্পাঞ্জলি দিলেই অখণ্ড-বিগ্রহের পূজা হ'ল। এক পূজক সহস্র পূজককে প্রাণের আকর্ষণে টেনে সন্নিধিস্থ কর্ব্বে। দূরদূরান্তরের বিচ্ছিন্ন প্রাণগুলিকে হৃদয়ের টানে এনে একত্র কর্ব্বে। যত স্থানে যত খণ্ড, যত বিচ্ছিন্ন, যত বিভিন্ন নরনারী আছে, অখণ্ড-বিগ্রহের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার কালে সবাইকে এনে জড় কর্ব্বে। প্রত্যেকে শুচি ও স্নাত হ'লেই হ'ল। কে ডোম, কে চাঁড়াল, কে মুচি, কে মেথর, এই বিচার কর্ব্বে না। অখণ্ড-মন্ত্র যেমন সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, অখণ্ড-বিগ্রহ যেমন সর্ব্ববিগ্রহের সমন্বয়, অখণ্ডের পূজক নিজে তেমন সর্ব্বজাতিরই পূর্ণ সমন্বয়,—এই কথাটী মনে ভাল ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে। তবে, ব্যক্তিগত নীরব পূজা একাই করবে। সাপ্তাহিক উপাসনা বা বিশেষ

তিথির বিশেষ উপাসনা ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে নিয়ে কর্ব্বে। যে-কেহ ভক্তিভরে অঞ্জলি দেবে, তোমার পূজা-মণ্ডপে তারই প্রবেশাধিকার থাকবে,—সে এখন তোমার চিরশত্রুই হোক্ কিম্বা কোনও বিধর্ম্মীই হোক্। তবে শুচি দেহে ও ভক্তিভাব নিয়ে আসা প্রয়োজন, এই কথাটীও মনে রেখো।

কুমিল্লা
২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৪

অদ্য জনৈকা পুরবাসিনী সম্ভ্রান্তা মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণিকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পত্র যোগে সদুপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার যে উত্তর লিখিলেন, নিম্নে তাহা অনুলিখিত হইল।

মন্ত্রার্থ স্মরণ

"মা, কুলগুরু হইতে প্রাপ্ত মহামন্ত্রের মধ্য দিয়াই চিত্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তি আসিবে ; হিংসা, দ্বেষ, ভয় ও ক্রোধ জয় হইবে। কিন্তু মন্ত্র জপকালে মনকে মন্ত্রের অর্থের প্রতি উন্মুখ করিতে হইবে। জগতে প্রত্যেকটী শব্দেরই একটী অর্থ থাকে, গুরুদত্ত মন্ত্রেরও অবশ্যই একটা অর্থ আছে। সেই অর্থটীকে ভাবনাপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিলেই চেতনা সঞ্চারিত হইবে এবং জপের অবশ্যম্ভাবী সুফল-সমূহ উপলব্ধিতে আসিতে আরম্ভ করিবে। মন্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া জপ করিলে জপের দ্বারা সুফল লাভ অতিশয় সুদূর-পরাহত হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই এই

অভ্যাসটীকে সুদৃঢ়রূপে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে যেন, মন্ত্র জপ করিলে কিম্বা এমন কি অজ্ঞাতসারে কখনও ইষ্টমন্ত্র মনে আসিলে, তৎক্ষণাৎ সঙ্গে-সঙ্গেই মন্ত্রের অর্থটীও মানসপটে জাগ্রত হয়। এমন অভ্যাস করিতে হইবে যেন, কোন ক্রমে মন্ত্রটী একবার মনে পড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থটীও না আসিয়াই না-পারে। এইরূপ অভ্যাস হহজেই হয় না, কিন্তু চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমতঃ বার বার ভুল হইতে চাহিবে কিন্তু তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই এই অভ্যাস অতিশয় বলবান্ হইবে। সেই সময় হইতেই মন্ত্র-জপের ফল বিশেষ-ভাবে অনুভব করা যাইবে। কারণ, অর্থ না বুঝিয়া শতবার জপে যে ফল হয় না, অর্থ বুঝিয়া তিনবার জপিলেও তাহার দশগুণ ফল হইবে। প্রত্যহ যে সময়টা জপের জন্য ব্যয়িত হয়, সেই সময়টার সবটুকুই যদি মন্ত্রার্থ-বোধ পূর্ব্বক জপ করা যায়, তবে আর ভাবনার কি আছে মা? সিদ্ধি যে তাহা হইলে অনায়াসেই আপনার করতলগতা হইয়া পড়িবে।

উপাসনার মুখ্য অংশ

"গুরুদেব যে ভাবে বলিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবেই কাজ করিয়া যাইতে হইবে,—ইহাই মহাজনসম্মত সাধুপন্থা। কিন্তু সাধন-ভজনের প্রণালীর মধ্যে কতক অংশ মুখ্য এবং কতক অংশ গৌণ থাকে। মুখ্য অংশেই জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভে অধিকতর প্রয়োজনীয়, গৌণ অংশ শুধু অনুরাগ বর্দ্ধনেরই

জন্য। যেমন স্তোত্রাদি উপাসনার গৌণ অংশ, আর, নাম-জপ উপাসনার মুখ্য অংশ। স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা নাম-জপে অনুরক্তি বর্দ্ধিত হয়। যেমন ডাল, তরকারী প্রভৃতি সঙ্গে থাকিলে ভাত সহজে খাওয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে খাওয়ার রুচি হয়, তেমন স্তোত্র-পাঠাদির ফলে মন সহজে ঈশ্বরের অভিমুখী হয় এবং অধিক পরিমাণে ইষ্টনাম জপিবার রুচি জন্মে। ভাতই যেমন আমদের প্রধান খাদ্য, নামই তেমন উপাসনার প্রধান উপাদান। ভাত না খাইয়া শুধু ডাল ও তরকারী খাইয়া যেমন চলে না, ঠিক তেমনি নাম জপ বাদ দিয়া শুধু স্তোত্রাদি লইয়া থাকিলে চলে না। তরকারী বাদেও যেন ভাত খাওয়া যায় এবং তাহাতে শরীরের পুষ্টিও সাধিত হয়, ঠিক্ তেমনি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান এবং স্তোত্রপাঠাদি ছাড়াও উপাসনা চলে এবং একমাত্র নামজপের দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করা যায়। কিন্তু ডাল-তরকারী ছাড়া যেমন সকলে উপযুক্ত পরিমাণ ভাত খাইয়া উঠিতে পারে না, অরুচি অনুভব করে, ঠিক তেমনি শুধু নাম-জপ লইয়া অনেকে দীর্ঘকাল সাধন করিতে পারে না, নাম-জপে রুচি বর্দ্ধনের জন্য বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান এবং স্তোত্র-পাঠের প্রয়োজন তাহাদের হয়। কিন্তু নাম-জপ সাধন-ভজনের প্রধান জিনিষ, নাম-জপ ছাড়া সাধন-ভজন-প্রণালীর আর বাকী সবটুকুই অপ্রধান।

"এই কথাটুকু মনে রাখিয়া সাধনে বসিলেই মা, আপনার জন্য আপনার ইষ্টদেবতার শুভাশিস অবতীর্ণ হইতেছে। স্তোত্রাদি

পাঠ নাম জপে অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য, কিন্তু স্তোত্রপাঠকালে স্তোত্রের অর্থের দিকেও মন দিতে হইবে। তাহা হইলেই স্তোত্রপাঠের ষোল আনা ফল পাওয়া যাইবে।

উপাসনায় চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ

"শাস্ত্রে উপদেশ আছে, মনকে স্থির করিয়া ভগবানকে ডাকিতে বসিতে হয়। কিন্তু মনকে স্থির করা ত' বড় সহজ কথাটী নয় মা। নিয়তই মন নানা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে, সততই সে চঞ্চল হইতেছে, তাহার বিক্ষিপ্ততার অবধি নাই। এমতাবস্থায় মানুষ কি করিবে? এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াও মানুষের কর্ত্তব্য—হতাশ না হওয়া এবং মন যতই চঞ্চল বা অস্থির থাকুক না কেন, তৎসত্ত্বেও নাম-জপে নিরত হওয়া, মন অধীর বলিয়া নাম-জপে বিরত হইলে চলিবে না। মন যতই অধীর হইবে, নাম-জপেও ততই অধিক উৎসাহের সহিত লাগিতে হইবে। নাম-জপ করিতে করিতে কত জায়গায় কত বৃথা চিন্তা আসিয়া উৎপাত করিবে, কত অপ্রত্যাশিত কামনা-বাসনা আসিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিবে, কত লালসার মরীচিকাময়ী মোহিনী-মূর্ত্তি চিত্তকে আকর্ষণ করিতে চাহিবে, কিন্তু কোনও দিকে চাহিবেন না। নাম-জপ করিতে বসিয়া কত অবান্তর ভাবনা আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিতে চাহিবে, কত স্বার্থলিপ্সা পথভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইবে, কত অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের পোষাক পরিয়া আসিয়া আপনাকে ত্বরায় উপাসনা সমাপন

করিতে তাড়া দিবে, কিন্তু কোনও দিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিবেন না। মনের মধ্যে যতপ্রকার বিষম ভাবেরই উদয় হউক না কেন, প্রাণপণ যত্নে নামকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন। বাজে চিন্তা যত পারে আসুক গিয়া, তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা দেখাইয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে আপনি নামেরই সেবা করিতে থাকিবেন। ভগবানের নাম সর্ব্ব-বিপদ-ভঞ্জন, ভগবানের নাম সর্ব্ববিঘ্ন-জয়ী। নামেই যদি লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তানিচয় আপনা আপনি পদানত হইবে। কোনও ভাবনা করিবেন না মা, মহানামে বিশ্বাস করুন, নামের বলে অবহেলে আপনার মন স্থির হইবে, অধীর মন ধীর হইবে, বিদ্বিষ্ট মন প্রেমিক হইবে, অসহিষ্ণু মন সহিষ্ণু হইবে, বিষণ্ণ মন আনন্দিত হইবে, বিরক্ত মন প্রশান্তি লাভ করিবে। সমগ্র চিত্তখানাকে ইষ্টদেবতার পদতলে সমর্পণ করিয়া সাধন-পরায়ণা হউন, দেখিবেন, অতি অল্পসময়মধ্যে উন্নতির কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেছেন, ভগবানের নামের অপার কৃপায় এবং অনন্ত মহিমায় মনুষ্য জন্মকে চির সার্থক করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ভগবানের নামে সংসার-জয়

"সংসার থাকিলেই ঝঞ্ঝাট থাকে, কোলাহল থাকে, অশান্তি থাকে। কিন্তু ভগবানের নামেতে যাঁহার পরম নির্ভর, কোন কোলাহল, কোনও অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া কুস্তি লড়িতে গেলে যেমন কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভগবানের নামকে অবলম্বন করিয়া চলিলে তেমনি সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটই আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ভগবানের নামেরই প্রতাপে এই দুঃখময় সংসারের মধ্যে থাকিয়াও আপনি পরমানন্দ সম্ভোগ করিবেন। গায়ে হলুদ মাখিয়া নদীতে নামিলে যেমন কুমীরে স্পর্শও করে না, ঠিক তেমনি ভগবানের নামে দেহপ্রাণ মাখিয়া সংসার নদীতে অবতরণ করিলেও দুঃখ, শোক, তাপ, অশান্তি, অবসাদ প্রভৃতি কুম্ভীর নিচয় আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভগবানের নামই আপনাকে অপরের দোষের প্রতি উপেক্ষাশীল এবং নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি সতর্ক করিয়া দিবে। ভগবানের নামই আপনাকে অপরের অপরাধ ক্ষমা করিতে শিক্ষা দিবে এবং নিজের আচরণকে ত্রুটিহীন ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া দিবে। ভগবানের নামই মা আপনার জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক, ভগবানের নামই আপনার গুরু, ভগবানের নামই আপনার পিতামাতা ভগবানের নামই আপনার বান্ধব, ভগবানের নামই আপনার ইহপর জীবনের একমাত্র সঙ্গী। প্রার্থনা করি, ইঁহার প্রতি আপনার অচলা নিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তি উপজাত হউক।"

শারীরিক পীড়ায় মানসিক পরিভ্রমণ

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

শরীরের যে কোনও প্রকার পীড়া হোক্, রোগের বিষয়ে চিন্তায় চিন্তায় উদ্বিগ্ন না হ'য়ে মনটাকে শরীরটার মধ্যে অবিরাম পরিভ্রমণ-রত রাখ্‌বে। গাছে, মাছে, আকাশে, বাতাসে মনটাকে ঘুরতে না দিয়ে তোমার শরীরটার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকে অবিরত ভ্রাম্যমাণ করবে। কোথাও সে গিয়ে থাম্‌বে না, শরীরের এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে সে যাবে এবং পৌঁছার সাথে সাথেই অন্যতর অঙ্গের প্রতি ধাবিত হবে। এই ভ্রমণের একটা যৌগিক শৃঙ্খলা বা পারম্পর্য্য আছে। কোন্ অঙ্গের পর মনটাকে কোন্ অঙ্গে ধাবিত কত্তে হবে, তা' তোমরা পরে * জেনে নিও। কিন্তু যতদিন সেই শৃঙ্খলা না জান্‌তে পাচ্ছ, ততদিন মস্তক থেকে হস্ত, হস্ত থেকে চরণ, চরণ থেকে মস্তক এ ভাবে আন্দাজী ভ্রমণও চালাতে পার। তাতে আধ্যাত্মিক বা শারীরিক কোন ক্ষতি নেই।

পরিভ্রমণ ও জগতের মঙ্গল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই পরিভ্রমণের কালে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প কত্তে থাকা আমার প্রত্যেক সন্তানের জন্য বাধ্যকর বিধি। শারীরিক পীড়া-প্রশমনও তুমি জগতের মঙ্গলকামনা থেকে দূরে যেয়ে কত্তে পাবে না। জগতের মঙ্গলে তোমার মঙ্গল, এই কথাটী যে স্মরণে রাখবে না, তাকে আমি সন্তান ব'লে স্বীকার

---

* "সংযম-সাধনা" এবং "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থদ্বয়ে ইহা বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

করি না। তোমার দেহ জগতের জন্য, তোমার মন জগতের জন্য, তোমার প্রাণ জগতের জন্য, তোমার আত্মা জগতের জন্য, তোমার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, জীবন-মরণ, উত্থান-পতন, ভোগ-ত্যাগ, আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিলোপ সবই জগতের সঙ্গলের জন্য, একা তোমর কুশলের জন্য নয়।

কুমিল্লা

২৪শে আষাঢ়,১৩৩৪

প্রার্থনা ও নামজপ

দিগম্বরীতলা হইতে দুইটী যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সমীপে আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—জপ-করার সুযোগ, সঙ্গতি ও রুচি যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভগবানের কাছে তেজ, বল, বীর্য্য, চরিত্র, সৎসাহস, পরার্থপরতা, নির্ভীকতা, প্রভৃতি প্রার্থনা কর্‌বে। আপ্রাণ আকুলতায় সেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়ে বল্‌বে,—"হে ভগবান্, আমাকে মনুষ্যত্ব দাও, আত্মস্থতা দাও, আমার পশুত্ব দূর কর, আমার অসংযম বিনাশ কর, আমার দুর্ব্বলতাকে দূর কর, আমার জীবনের মিথ্যাকে নাশ কর, আমার চিন্তা ও চরিত্রের মধ্যে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।" কিন্তু নাম-জপে যখন রুচি আসবে, তখন জানবে, স্থিরচিত্তে নামজপ প্রার্থনার চাইতে ঢের বেশী বড় কাজ। আমাদের কখন কি দরকার, ভগবান তা' জানেন, সুতরাং "এটা

দাও, ওটা দাও" ব'লে তাঁকে ব্যস্ত কত্তে যাওয়ার ত' কোনো প্রয়োজনই নেই! ছেলে যখন বিছানায় প'ড়ে ঘুমুতে থাকে, সেই সময়ে শয্যা ছেড়ে এসে মা ছেলের খাবার তৈরী করার জন্যে উনুন ধরাণ। "মা খেতে দাও, মা খেতে দাও"—ব'লে চীৎকার করা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক, কারণ, ছেলের ক্ষিদের চিন্তা ছেলের চাইতে মায়ের বেশী। তেমনি আমাদের পূর্ণতা লাভের চিন্তাও আমাদের চাইতে ভগবানেরই বেশী। সুতরাং "হে ভগবান্, বল দাও, বীর্য্য দাও, ত্যাগ দাও, বৈরাগ্য দাও",—প্রভৃতি ব'লে ডাকাডাকি করার মুখ্য আবশ্যকতা কিছুই নেই। তবে, মা খেতে দেবেন, এইটী ঠিক্ জেনেও তাঁর উপরে মর্জ্জি-আব্‌দার করায় যেমন ভালবাসার একটা অনুশীলন হয়, সব দিবেন দিচ্ছেন এই কথা জেনে-শুনেও ভগবানের কাছে বলবীর্য্য, সাহস-উদ্যম, ত্যাগ-বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রার্থনা করলে তেমনি ভগবৎ-প্রেমের একটা অনুশীলন হয়। কিন্তু প্রার্থনা না ক'রে নাম-জপ কর্‌লেও ভালবাসার সে অনুশীলনটুকু হ'তে পারে। ভগবানের নামেরই স্বভাব এই যে, তাতে প্রেম আসবেই। প্রার্থনার ফলে প্রেমের যে উৎকর্ষ হয়, নাপ-জপের ফলে প্রেমের উৎকর্ষ হয় তার বেশী। কারণ, প্রার্থনায় আছে "চাই, চাই" রব, আর নাম-জপে কামনা নাই, আছে সম্পূর্ণ নির্ভর। নাম-জপের Spirit (অন্তর্নিহিত ভাব) টা হ'ল—'যা' তুমি ভাল বোঝ, তা' ত' তুমি কচ্ছই, তবু যে আমি ডাকি, সেটা শুধু ডাকতে আমার ভাল লাগে ব'লেই। তুমি আমাকে কিছু দান কর, তা' আমার

অভিপ্রায় নয় গো, তবু যে তোমার নাম জপি, তা' শুধু জপ্‌তে সুখ পাই ব'লেই!'' নাম-জপের সাথে নিষ্কাম ভাবটা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত রয়েছে। ভগবানের দান ত' অফুরন্ত, কিন্তু যার আধার যত বড়, তাঁর অফুরন্ত দানের মধ্যে ততটুকু সে ধ'রে রাখতে পারে। সুতরাং যত বড় আধার, তত বড় দান। সাধন-ভজন তোমার আধারকে বড় করে, তাই তুমি ভগবানের বড় দানগুলি গ্রহণের যোগ্য হও। ভগবানের সব চাইতে বড় দান শান্তি, তাই তোমার আধারটা সব চাইতে বড় হ'লেই শান্তি তোমার লভ্য হবে। এই জন্য চাই প্রাণপণ সাধন।

জিজ্ঞাসু।—প্রার্থনা ও নামজপ একসঙ্গে চল্‌তে পারে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব পারে। আগে প্রার্থনাটুকু ক'রে নিও, তারপরে নাম-জপ কর্‌বে।

স্তোত্রপাঠ, প্রার্থনা ও নাম-জপ

জিজ্ঞাসু।—যদি স্তোত্রাদি পাঠ কত্তেও ইচ্ছা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উত্তম। তা'হলে প্রথমেই স্তোত্রপাঠ ক'রে নিও। কিন্তু স্তোত্রের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থের প্রতি গভীর অভিনিবেশ দিয়ে তার পাঠ করবে। নইলে যন্ত্রের মত শুধু আউড়ে গেলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মন দিয়ে পড়্‌লে স্তোত্রপাঠের ফলে মনটা একটু শান্ত হবেই। তখন প্রার্থনা কর্‌লে মনটা আরো শান্ত হবে। তারপরে জপ কর্‌লে মনটা বাইরে ঘুরে বেড়াতে চাইবে না।

কীর্ত্তন ও নামজপ

জিজ্ঞাসু।—কীর্ত্তনাদিতে ইচ্ছা হ'লে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা'তেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সাধারণতঃ কীর্ত্তনাদি হবে স্তোত্র-পাঠের আগে। যেখানে উচ্চ চিৎকার আর লাবনকুর্দ্দন যত বেশী, সেখানে মনটার স্থির হবার বাধাও তত বেশী। ধীর শান্তভাবে, স্নিগ্ধকণ্ঠে কীর্ত্তনাদি করলে তাতে নামে রুচি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অস্থির ভাবে, উদ্দণ্ডভাবে, প্রাণপণ চীৎকার ক'রে বা অতি দীর্ঘকাল কীর্ত্তনাদি ক'রে শ্রান্ত হ'লে নামে রুচি বৃদ্ধি ত' দূরের কথা, বরং ক'মেই যায়। একটা কথা মনে রাখবে,—যাতে মাথা গরম হয়, তাতে মন অস্থির হয়। সুতরাং কীর্ত্তন বড় জোর আধঘণ্টা, তিন পোয়া ঘণ্টা করবে,—এর বেশী করবে না। নাম-জপের পরে কীর্ত্তনাদি কত্তে ইচ্ছে হ'লে তাও কত্তে পার কিন্তু ধ্যানের আবেশটা যাতে পূর্ণভাবে থাকে, সেইভঅবে করবে। সাধনাঙ্গ-কীর্ত্তনে হৈ-চৈ ভাল নয়, প্রচারাঙ্গ কীর্ত্তনে আড়ম্বর বৈধ।

নাম-জপ ও গুরূপদেশ

জিজ্ঞাসু।—যদি নাম-জপ কত্তেই ইচ্ছা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাহ'লে গুরু-বাক্য অনুসারে চলবে। কারণ, নাম-সাধনের উপদেশ এক এক গুরু এক এক জনকে এক এক রকম দেন।

এক নামে কি সকলের ভবব্যাধি সারে

জিজ্ঞাসু।—এক নামে কি সকলের কাজ হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একটা মত আছে বটে যে, ভবব্যাধি পেটেন্ট ঔষধে সারে না, এক এক জনের এক এক ঔষধের দরকার হয়। আর, যদিও বা এক ঔষধেই সবার কাজ করে, তবু পাত্র বুঝে অনুপান-পরিবর্ত্তনও প্রয়োজন হয়। এই মতটা এক হিসাবে একেবারে মিথ্যা নয়। মন্ত্র-দাতারা সকলেই কোনও না কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এজন্য সাধনও করেন কোনও না কোনও এক সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের। যথা,—হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, হুং, ক্রী, ঐং ইত্যাদি। এ সব মন্ত্রের এক একটী গণ্ডী আছে। গণ্ডীবাঁধা মন্ত্র সকল ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে প্রযোজ্য হয় না। তাই, সকলের পক্ষে খাটে না। এজন্যই একই দীক্ষাদাতা এক দীক্ষার্থীকে যখন দিচ্ছেন ক্রীং মন্ত্র, অপর দীক্ষার্থীকে তার পাঁচ মিনিট পরেই দিচ্ছেন হ্রীং মন্ত্র। মুখে বল্‌তে হচ্ছে যে, স্বরূপতঃ সব মন্ত্রই এক, কিন্তু দেবার সময়ে সবাইকে এক মন্ত্র দিতে পাচ্ছেন না। কারণ, তাতে বিধিভঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু যে মন্ত্র কোনো গণ্ডীর বাঁধন মানে না, যে মন্ত্র সকল খণ্ডকে নিজের ভিতরে এনে সমাহৃত করেছে, সেই মন্ত্র সম্পর্কে গণ্ডীবাঁধা কোনো মন্ত্রেরই আইন খাটে না। সুতরাং অখণ্ড-মন্ত্র প্রণবে সকলেরই ভবব্যাধি সারে। অখণ্ড-মন্ত্র সর্ব্বজন-ব্যাধি-বিনাশক মহৌষধ। এতে অনুপানের পার্থক্যে ফলের পার্থক্য হয় না। মালায় জপ, শ্বাসে জপ, মনে জপ, সব জপেরই ফল ভবব্যাধি-

নাশ। হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং প্রভৃতি যে সহপানের সাথেই এই মহৌষধকে যুক্ত কর, সাধন কত্তে কত্তে সব অনুপান ঔষধের মাঝেই জীর্ণ হ'য়ে যাবে, একমাত্র ওঙ্কার ছাড়া আর কোনো মন্ত্রের পৃথক্ অস্তিত্বই থাক্‌বে না।

শূদ্র কি ওঙ্কার-জপে অধিকারী

জিজ্ঞাসু।—শূদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে কি ওঙ্কার জপ করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভবব্যাধি বিনাশের জন্য যদি তুমি ওঙ্কাররূপী পরম মহৌষধ সেবন কর, তবে তেমাকে বাধা দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌বে কে? অনার্য্য দাসী ইলুষের পুত্র শূদ্র কবষ যখন ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন, ব্রাহ্মণদের বাধা কি তাঁকে আট্‌কে রাখতে পেরেছিল? পরে বরং ব্রাহ্মণেরা আদর ক'রে ব্রাহ্মণ ব'লে, ঋষি ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন। পরশুরাম যখন কেরল-দেশীয় ধীবরদিগের গলদেশে যজ্ঞসূত্র দিয়ে তা'দিগকে ব্রাহ্মণ করেছিলেন, তখন তাদের প্রণবাধিকার কি কেউ রুখ্‌তে পেরেছিল? সমাজ তাদের ব্রাহ্মণ ব'লেই মেনে নিয়েছিল।

শূদ্রের প্রণব-জপ ও প্রণবের অসম্মান

জিজ্ঞাসু।—তাই শুধু নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমরা শূদ্রেরা এত অধম, এত পতিত যে, মন্ত্ররাজ প্রণব-জপ

কর্ল্লে মন্ত্রকে অপমান করা হয় না কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অর্থাৎ মাতা যখন পরমপূজ্যা এবং শিশুর যখন গায়ে মলমূত্র লেগেছে, তখন শিশু ভাবছে যে, এই মলমূত্র নিয়ে মায়ের কোলে উঠি কি ক'রে! এই ত'? ওঙ্কার সর্ব্বপাপের বিনাশক, তিনি মাতৃস্বরূপ স্নেহময়, তুমি যত পতিত আর অধম হও, তাঁর স্নেহময় কোলে তোমার উঠবার অধিকার শাশ্বত। অধম পতিত ব'লেই ত' ঐ ক্রোড়ের বেশী প্রয়োজন। সঙ্কোচ নিরর্থক। শিশু তার মায়ের কোলে উঠেছে, এতে মায়ের আবার অপমান কিসের?

দীক্ষা ও নাম-জপ

জিজ্ঞাসু।—দীক্ষা না নিলে কি নাম-জপ করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব যায়।

জিজ্ঞাসু।—তাতে ফলের পার্থক্য হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একনিষ্ঠ ভাবে যদি কত্তে পার, তবে কেন পার্থক্য হবে? একই নাম, একই উদ্যমে, একই ভাবে, অবিরত সাধন কত্তে হবে, এইটীই হ'ল মুখ্য প্রয়োজন। দীক্ষা ছাড়া যদি এভাবে জপ-কত্তে পার, তবেই হ'ল। তবে গুরুরও প্রয়োজন আছে। লোক-দেখান একটা দীক্ষা নেবার জন্যে নয়, দীক্ষা গ্রহণের উপলক্ষ্যে গুরুকে কতকগুলি দ্রব্যসম্ভার ও বার্ষিক দেবার জন্যে নয়, "আমি দশ হাজারী স্বামীজীর শিষ্য, অমুক বিশহাজারী দণ্ডীর শিষ্য, অমুক পঞ্চাশ হাজারী পরমহংসের

শিষ্য"—প্রভৃতি ব'লে লোক-সমাজে নিজের আধ্যাত্মিক কৌলীন্য-জাহির করার জন্যে নয়, পরন্তু সাধন-পথে প্রকৃত সহায়তা পাবার জন্য গুরুরও আবশ্যকতা আছে। খুব শক্ত রকমের ছেলে ছাড়া প্রায় সকলেরই গুরূকরণ দরকার হ'য়ে পড়ে। তার একটী কারণ এই হচ্ছে যে, করিৎ-কর্ম্মা ব্যক্তির সহায়তা না পেলে অনেক সময় সাধক নিজের ব'লে সাধন-সম্পর্কিত সংশয়-সমূহ ছেদন করতে পারে না কিম্বা জপ-তপের প্রকৃষ্টতম প্রণালীগুলিও সহজে আবিষ্কার ক'রে নিতে পারে না।

জিজ্ঞাসু।—দীক্ষাপ্রাপ্ত নামে আর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নামে ফলের পার্থক্য নেই। একথা কি প্রকৃতই ঠিক্?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, ঠিক্। কিন্তু দীক্ষাপ্রাপ্ত নামে আর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নামে, তোমার মনের গঠন-অনুসারে, অভিনিবেশের পার্থক্য হ'তে পারে। অভিনিবেশের ঐকান্তিকতাই আসল কথা, মন্ত্র কোথায় পেয়েছ, সেটা বিচার্য্য নয়। ঐকান্তিক অভিনিবেশে দীক্ষাহীন সাধকও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, অভিনিবেশের অভাবে দীক্ষিত সাধকও ব্রহ্মপদলাভে চিরবঞ্চিত থাকেন।

গুরু করিবার আবশ্যকতা

জিজ্ঞাসু।—তবে আর গুরু কর্‌বার আবশ্যকতা কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্থল-বিশেষে আবশ্যকতা আছে। শক্তিমান্ গুরুর মুখোচ্চারিত মন্ত্রে শিষ্যের অভিনিবেশ হয় স্বাভাবিক,

আর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত মন্ত্রে অভিনিবেশ হয় চেষ্টা-প্রসূত। স্বভাবের পথে সাধনই নিশ্চিত সাধন, সিদ্ধি তাতে সহজে করতলগতা হয়।

গুরুর লক্ষণ

জিজ্ঞাসু।—কিন্তু গুরু চিনিব কি করিয়া?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরু কেউ চিন্‌তে পারে না, তিনি নিজে চেনা দেন। তাঁর মুখোচ্চারিত নাম যেন বজ্রের শক্তি নিয়ে আসে, সে-শক্তিকে কেউ আগ্রাহ্য কত্তে পারে না। এতেই গুরু চেনা যায়। শক্তিমান্ গুরুর নিরভিমান প্রতিনিধিরূপে যদি কোনো সাধক-পুরুষ দীক্ষা দেন, তবে তাতেও এ ফলই হয়।

গুরুহীন সাধকের জপ-ফল

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু সদ্‌গুরু যে সুদুর্ল্লভ। তাই, যার তার কাছে মাথা নত না ক'রে প্রত্যেক সাধকের উচিত, প্রাণের আবেগ বুঝে তদনুযায়ী ভগবানের নাম জপ করা। গুরুহীন জাপকের জপে ফল হয় না ব'লে যে কথাটা সর্ব্বত্র শুনতে পাও, তার যাথার্থ্য এইটুকু যে, অদীক্ষিতের পক্ষে একটা নামে লেগে থাকার দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়। নতুবা তুমি গুরুহীনই হও আর গুরুবন্তই হও, জপ কর্‌লেই ফল আছে। একবার জপ কর ত' একবারের ফল পাবে, দশবার জপ কর ত' দশবারের ফল পাবে। কাজ কর্‌লে তার ফল হবেই,—এ থেকে তোমাকে বঞ্চিত কত্তে পারে, এমন সাধ্য শাস্ত্রেরও নেই, শাস্ত্রকারেরও নেই। তবে যে দীক্ষা নেওয়ার সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার কারণ, দীক্ষিতের পক্ষে একটা নামে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা সহজ হয়। সংশয়ের সময়ে সে আদর্শবান্ সাধননিষ্ঠ উপলব্ধিসম্পন্ন গুরুর স্মৃতিকে বিশ্বাসের খুঁটি ক'রে নিতে পারে। এটা একটা কম কথা নয়।

গুরু ও নাম

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্যকার ট্রেণেই ময়মনসিংহে ফিরিবেন। সুতরাং বেলা দশটাতেই কুমিল্লা ষ্টেশনে আসিলেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীযুক্ত স—কে বলিলেন,—যতক্ষণ চিনির খোঁজ না পাও, ততক্ষণ চিনির ব্যাপারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা। কিন্তু যেই চিনির বস্তা পেয়ে গেলে, যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে চুপ মেরে খালি চিনিই খাও, ব্যাপারীর সাথে আর তোমার দরকার কি? চিনির বস্তা খোলা পেয়েও ব্যাপারীর সঙ্গে কথায় কাল কাটায়, তার মত আর মূর্খ দুনিয়ায় কে আছে? তবে যখন চিনির চিনিত্বে সন্দেহ আসবে, চিনির সঙ্গে তুষ, লবণ বা বালি মিশ্রিত ব'লে সন্দেহ হবে, তখন ব্যাপারীকে জিজ্ঞেস ক'রে আসল কথা জেনে নিতে হবে।

ময়মনসিংহ,
২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৪

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

বৈকালে শ্রীযুক্ত খ—র সহিত শ্রীশ্রীবাবামণি মেডিকেল স্কুলের ঘাট্‌লায় গিয়া বসিলেন। খ—জিজ্ঞাসা করিলেন,—দ্বৈতবাদ সত্য, না অদ্বৈতবাদ সত্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উভয়ই সত্য। ইহারা অংশ-সত্য মাত্র, পূর্ণ সত্য দ্বৈত-অদ্বৈতের অতীত! অংশ-সত্যের ধর্ম্মই এই যে, সে একজনের পক্ষে সত্য, অপরের পক্ষে অসত্য। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ যেন দুই মাপের দুইখানা জামা। যার যেমন গায়ের মাপ, তেমন মাপের জামাটাই তার গায়ে লাগে। কারো পক্ষে দ্বৈতবাদ খাটে ভালো, কারো পক্ষে অদ্বৈতবাদ খাটে ভালো, কিন্তু কোনো জামাটাই একেবারে অকর্ম্মণ্য নয়। চেষ্টা কর্‌লে একজন আর একজনের মাপের জামা গায়ে কাজ চালাতে পারে। কিন্তু যার গায়ে যেটা লাগে, তার পক্ষে সেটার প্রয়োজন ও প্রভাব অপরিসীম।

নিষ্কপটতা ও দেশোদ্ধার

খ।—কিন্তু সোঽহং ব'লে ভাব্‌লে মনের ভিতরে যে সাহস জাগে, দাসোঽহং ব'লে ভাব্‌লে তা' জাগে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, তা' নয়। একজন নিজেকে ব্রহ্ম ব'লে

অভিমান ক'রে যা' লাভ করেন, আর একজন নিজেকে সর্ব্বশক্তিমানের দাস ব'লে মনে ক'রে ঠিক্ তাই লাভ করেন। প্রাপ্তি দুই জনেরই সমান, প্রাপ্তির ভঙ্গীটুকু মাত্র পৃথক্।

খ।—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'দাসোঽহং বল্‌তে বল্‌তে দেশটা উচ্ছন্নে গেল।'

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ, মুখে দাসোঽহং বল্‌লেই হয় না, অন্তরেও তা' জান্‌তে হয়! নিজেকে যে ভগবানের দাস ব'লে জানে, সে আর কারো দাসত্ব স্বীকার করে না, ভগবানকে ছাড়া কাউকে প্রভু ব'লে মানে না, আর কারো রক্ত-চক্ষুকে ভয় করে না, কারো উৎপীড়ন অত্যাচারকে, ধর্ম্মের উপর আঘাতকে, সত্যের অপচয়কে নীরবে সহ্য করে না। ভগবানের দাসত্ব তাকে আর সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়,—স্বার্থের দাসত্ব থেকে, মিথ্যার দাসত্ব থেকে, ভয়ের দাসত্ব থেকে সে মুক্ত হয়। সুতরাং খাঁটি যদি কারো ভগবানে দাসোঽহং ভাব জন্মে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি হ'তে পারে না। কিন্তু ভিতরে নিজেকে ভগবানের দাস ব'লে জান্‌ছি নে, দাসত্ব কচ্ছি কামের, ক্রোধের, লোভের, মোহের, দাসত্ব কচ্ছি ভোগের, বিলাসিতার আর সুবিধাবাদের, আর মুখে বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছি, আমি ভগবানের দাস—এ রকম দাসোঽহং বল্‌লে কেন উচ্ছন্নে যাব না? কপটতার চাইতে উচ্ছন্নে যাবার বড় পথ আর কি আছে? বিবেকানন্দ যে বলেছেন,—সোঽহংবাদ দিয়ে দেশকে আজ উন্নত কত্তে হবে, তাঁর সে

কথায়ও সত্য আছে। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্ম ব'লে জান্‌বে, তখনই সে হবে পাপ-তাপের অতীত। কিন্তু খাঁটি খাঁটি নিজেকে ব্রহ্ম ব'লেই জানা চাই। ভিতরে অদ্বৈত-ব্রহ্মকে উপলব্ধি কর্‌ব না, মুখে শুধু আওড়াব—"সোঽহং, সোঽহং", এতে দেশের কোনও কল্যাণ হবে না। কারণ, কপটতা দিয়ে কখনো কল্যাণ হয় না। আমার ত' নিশ্চিত ধারণা, অধঃপতিত ভারতবর্ষকে টেনে তোল্‌বার শক্তি শুধু দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের নাই,—ভারতকে যদি কেউ উদ্ধার করে, তবে তার নাম নিষ্কপটতা। কপটতাকে যদি বর্জ্জন কত্তে পার, তাহ'লে জেনো, দ্বৈতবাদীই হও আর অদ্বৈতবাদীই হও, তোমার বাহুতে শক্তি আস্‌বেই আস্‌বে। অকপট দ্বৈতবাদী মরণকে ভয় করে না, কারণ সে জানে, সে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর দাস, সর্ব্বশক্তিমানের দাস, প্রভুর আদেশ পালনই তার পরম-পুরুষার্থ। অকপট অদ্বৈতবাদীও মরণকে ভয় করে না, কারণ, সে জানে, সে ব্রহ্ম, সে অজর, অমর, অক্ষয়, নিজেই সে শাশ্বত, সনাতন ও সর্ব্বশক্তিমান্।

কপট অদ্বৈতবাদের কুফল

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অনুভূতি অন্তরে জাগাবার চেষ্টায় শৈথিল্য ক'রে যদি কেউ কেবল বেদান্তের দোহাই দিয়েই বেড়ান, তবে জেনো, তিনি জাতির মধ্যে দৌর্ব্বল্যের বীজ বপন কচ্ছেন। আমাদের দেশে অনেক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় রয়েছেন, যাঁরা দাবী

করেন যে, তাঁরা জাতীয় শক্তির সমৃদ্ধি যোগাচ্ছেন কিন্তু গৈরিকের অন্তরালে শুধু ভোগ-চর্চ্চাটাকেই সার করেছেন। এঁদের অদ্বৈতবাদ কখনো এ জাতিকে বলবীর্য্যসম্পন্ন, পৌরুষসম্পন্ন বা মনুষ্যত্বসম্পন্ন কর্‌বে না। যে অদ্বৈতবাদী নিজেকে ব্রহ্ম ব'লেই জানেন, যাঁর জগন্ময় ব্রহ্মানুভূতি দীন-দরিদ্রের নিরন্ন জঠরেও গিয়ে পৌঁছে, নিজ দেহকে তৃপ্তিমান্ কর্‌বার জন্য যাঁর ব্যস্ততা নেই বিন্দুমাত্র, এই অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধার কর্‌বে তাঁরই অদ্বৈতবাদ। পরন্তু আত্মসুখের বেলায়ই যিনি অদ্বৈতবাদী, লোক-সংগ্রহের বেলায়ই যিনি অদ্বৈতবাদী, অন্তরে যাঁর অদ্বৈতানুভূতি জাগে নাই, তাঁর অদ্বৈতবাদে এ জাতির উন্নতির হবে শুধু মূলোচ্ছেদ।

স্বাধীনতাই ধর্ম্ম

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে একস্থানে কীর্ত্তন হইতেছে শুনিয়া উভয়ে সেখানে গিয়া বসিলেন। কিছুকাল কীর্ত্তন শ্রবণের পরে উভয়েই গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এঁরা সব প্রাণের আনন্দে কীর্ত্তন কচ্ছেন। সৌন্দর্য্যবোধের মাপকাঠি যাঁদের এর চাইতে উঁচু, তাঁরা এই কীর্ত্তনকে যা-খুশী তা-ই ভাব্‌তে পারেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই স্বাধীনতাকে মান্‌তে হবে। এঁদের চিত্ত যাতে স্থির হয়, এঁদের প্রাণ যাতে আনন্দ পায়, এঁদের ধর্ম্মবুদ্ধি যাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই পথে চল্‌তে এঁদের দিতেই হবে। যে এঁদের এই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ কত্তে যাবে, সে মানব-সমাজের শত্রু, সে সভ্যতার বৈরী।

খ।—একজন অদ্বৈতবাদী লেখক শ্রীগৌরাঙ্গকে বদ্ধ-পাগল বলেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওতে লেখকের মর্য্যাদা একটুকুও বাড়ে নি; অপরের স্বাধীনতাকে যিনি স্বীকার কর্‌বেন না, তিনি লোক-শিক্ষক হবার যোগ্য নন। অপরের আচরণের স্বাধীনতা মেনে তারপরে যিনি নিজের মতকে প্রচার কত্তে পার্‌বেন, তিনি বেদান্ত মার্গীই হৌন, আর কৃষ্ণভজাই হৌন, তিনিই এই ধ্বংসোন্মুখ ভারতবর্ষকে রক্ষা কত্তে পার্‌বেন। দেখ খ—, If I have got any religion at all, it is the Religion of Freedom (আমার যদি কোন ধর্ম্ম থেকে থাকে, তবে তার নাম স্বাধীনতা)। দ্বৈতবাদই বল আর অদ্বৈতাবাদই বল, আমার কাছে স্বাধীনতার চেয়ে তারা ঢের ছোট জিনিষ।

ময়মনসিংহ,

২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৪

আত্মস্থ হও, নিজেকে চেন

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"আমার আবাল্য সাধনার অমূল্যনিধি মহামন্ত্র পাইয়া অবধি তোমরা তোমাদের অতীতের অবসাদ, জড়তা, দুর্ব্বলতা এবং আত্মাবজ্ঞা ঝাড়িয়া-মুছিয়া ফেলিয়াছ। ইহা আমার পরম আনন্দ, পরম গৌরব। কিন্তু তোমরা যে অনেকেই নিজেদিগকে অত তাড়াতাড়ি এক এক জন পরমশক্তিমান্

মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া নিজেদের মতে, নিজেদের পথে, অঙ্গুলী, হেলনে, ভ্রূকুটি-কুঞ্চনে সমগ্র পৃথিবীকে চালাইবার দর্প লইয়া পৃথিবী চরিতেছ, ইহা ত' বাছা আমার পক্ষে পরম লজ্জার, পরম গ্লানির ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। নিঃশক্তি তোমরা পাবন-মন্ত্রের স্পর্শ পাইয়া শক্তিধর হইতে চলিয়াছ। সেই শক্তিকে কি এইভাবে তোমরা অপব্যায়িত করিয়া দিবে? আমি কি তোমাদিগকে বলিতে পারিব না যে, তোমরা আত্মস্থ হও, তোমরা তোমাদের দর্প, দম্ভ, ও দুঃশীলতা পরিহার করিয়া বিনীত হও, নম্র হও, মিতভাষী হও, হিতভাষী হও? আমি কি তোমাদের বলিতে পারিব না যে, জনে জনে এক একটা করিয়া দল গড়িয়া তাহাতে মোড়লী করিবার যে প্ররোচনা তোমরা দল-গঠনে পটু ব্যক্তিদের নিকটে পাইতেছ, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া আত্মস্থ হইয়া তপস্যার বলে নিজের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত শক্তির খনি তোমরা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া অমূল্য হীরা, অতুল্য মাণিক আগে উদ্ধার কর, লাভ কর? যে আশীর্ব্বাদের বলে স্বল্পেই তোমরা ঐরাবত-কল্প হইয়াছ, আমি কি বলিতে পারিব না যে, সেই আশীর্ব্বাদটুকুকে পূর্ণরূপে নিজেদের জীবনের উপরে কার্য্যকর হইতে দাও? মাতৃবক্ষ হইতে দুগ্ধ পান করিয়া সেই মাতারই স্তনদংশন কি তোমাদের কুশল আনয়ন করিবে? পুত্রগণ, আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি তোমাদের স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী নহি। আমি তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিভার বিশিষ্ট-বিকাশের পরিপন্থী নহি। ভাবিলে বুঝিতে পারিবে আমার

অপেক্ষা উদারচেতা, স্বাধীনতা-প্রদাতা জগতে আর কেহ নাই। কিন্তু তোমরা যে নিজেদের স্পর্দ্ধায় নিজেদের শিরে কুঠার হানিতেছ, সেই দৃশ্য দেখিয়াও কি আমি নির্ব্বাক্ দর্শকমাত্রই থাকিব? তোমাদের উদ্ধত ব্যক্তিত্ব গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন দল গড়িতেছে, কিন্তু মিলনের ত' কোনও সেতু কোথাও নাই! মিলন আসে আত্মবিসর্জ্জনের, আত্মনিমজ্জনের ভিতর দিয়া,—ব্যক্তিত্বের অহমিকার সাথে ব্যক্তিত্বের অহমিকার সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নয়। দিকে দিকে নানা দল গড়িয়া কি যে আত্মকলহের হানাহানি তোমরা সৃষ্টি করিতেছ, তাহা তোমরা জান না। একটীমাত্র আদর্শের অনুগত হইয়া সহস্র সহস্র শক্তিমানের একত্র মিলনকে তোমরা কল্পনার জগৎ হইতে কেন নির্ব্বাসিত করিতেছ? এখনো তোমরা আত্মস্থ হও, এখনো তোমরা নিজেদের চিনিতে চেষ্টা কর, নিজ নিজ প্রকৃত আত্ম-পরিচয়ের মধ্য দিয়া জগতের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য জানিয়া লও।"

ময়মনসিংহ

২৭শে আষাঢ়, ১৩৩৪

বিবাহিত-জীবন ও সাধন-ভজন

অদ্য দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত হ—আচার্য্য-দর্শনে আগমন করিলেন। হ—বিবাহিত যবুক।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিয়ে ক'রেছ কিন্তু সাধন ছেড় না। প্রাণপণে সাধন ক'রে যাও। বিয়ে ক'রে যারা সাধন-ভজনে

ঢিলে দেয়, তাদের মত দুর্ভাগা কিন্তু কেউ নেই। বিবাহিত জীবনে যদি সুখ চাও, তবে দুটী তরুণ-তরুণী যথাসাধ্য ভাইবোনের মত পবিত্রভাবে থেকে ভগবানের সেবা কর।

হ।—সব সময় পবিত্রতা রাখ্‌তে পারি না যে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না-ই বা পার্‌লে। ভাববার কি? প্রাণপণে সাধন কত্তে থাক। আপনি সংযম এসে যাবে। পদস্খলনে কি যায় আসে, যদি প'ড়ে প'ড়েও মানুষ পথ-চলা না বন্ধ করে? এগিয়ে যাও, পদস্খলন হ'লেই সাধন ছাড়্‌বে না। শেষে দেখ্‌তে পাবে, এগিয়ে যাবারই জয় হয়েছে, পদস্খলনের জয় হয় নি, সাধনেরই জয় হয়েছে, অসংযমের জয় হয় নি।

নামের শক্তি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত হ—কে দিয়া অপর এক ভক্তের নিকট একখানা পত্র লেখাইলেন। পত্রখানার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"পথ পাইয়াছ, চলিবার আলস্য এখন যেন আর না থাকে। পরম-কল্যানের ভাণ্ডার-ঘরের চাবিকাঠি পাইয়াছ, মণি-মুক্তা সব ত্বরিত-হস্তে অধিকার ও আহরণ করিতে আলস্য করিও না। নামের বলে সব দৈবী সম্পদ তোমার করায়ত্ত হইবে। নামের মহিমায় সকল পাপ-কালিমা হইতে তুমি মুক্ত হইবে। নামের জ্যোতি তোমাকে সুপবিত্র করিবে। নামের মধু তোমার জীবনকে মধুময় করিবে। নাম তোমাকে ভগবৎপ্রেম

দান করিবে এবং কামদগ্ধ চিত্তে শান্তি সুধা বর্ষণ করিবে। নামে একান্ত নির্ভর কর এবং নামের অমৃতরস প্রাণপণ সাধনের ব'লে আকণ্ঠ পূরিয়া পান কর। জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা সহায় তোমার কে? রিপুদমনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অস্ত্র কে? জীবনের পূর্ণতা-সাধনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপাদান কে? জানিও, উহা ভগবানের নাম। প্রবৃত্তির কোলাহল যখন তোমার বিরুদ্ধে প্রবলতম, তখন নামই তোমার সম্বল। কামক্রোধাদির পরাক্রম যখন তোমার উপরে অপরিসীম, তখন নাম তোমার অব্যর্থ পাশুপত অস্ত্র। জীবন-গঠনে যখন তুমি অক্ষম অসমর্থ, তখন নাম তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনুকূল্যদাতা। নামে বিশ্বাস রাখিও, নামকে পরম-পুরুষার্থ বলিয়া জানিও, নামের অপরিমেয় মহাশক্তি দ্বারা নিজেকে লাভবান্ করিয়া লইতে নিয়ত অবহিত থাকিও। লোকে তোমায় সাধু বলে বলুক, ভণ্ড বলে বলুক, ঠাট্টা-বিদ্রূপকে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিও। তোমার একনিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্যই শ্রীপ্রভু ঠাট্টা-বিদ্রূপের আয়োজন রাখিয়াছেন। লোক-মতের বিরুদ্ধতা দ্বারা তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠাই বর্দ্ধিত হইবে।"

ব্রাহ্মণ্যের পথে আত্মোৎসর্গ

উক্ত পত্রের উপসংহারীয় অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লেখাইলেন,—"দেখিতে চাই, ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য-মন্ত্রে সমগ্র দেশ জাগিয়া

উঠিয়াছে আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তাল তরঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলিত হইতেছে। দেখিতে চাই, দুর্ব্বলের বাহুতে বল আসিয়াছে, ভীরুর হৃদয়ে সাহস জাগিয়াছে, কামুকের প্রাণে অফুরন্ত প্রেমের অনাবিল নির্ঝর ছুটিয়াছে। দেখিতে চাই, পরপরীবাদী আত্মদোষ সংশোধন করিতেছে, পরানুকারী নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে, শৃঙ্খলিত মন মুক্তির জন্য ব্যাকুল অধীর হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখাইবার দাবী তোমাদেরই নিকটে। এই অধঃপতিত দেশকে পুনরভ্যুদয় দিতে হইলে যাহাদিগকে আত্মাহুতি দিতে হইবে, তুমিও তাহাদেরই একজন। তোমার এ আত্মদান ক্ষাত্রশক্তির পথে নহে, তোমাকে জীবনোৎসর্গ করিতে হইবে ব্রাহ্মণ্যের পথে। ব্রাহ্মণ জ্ঞানাজীব। জ্ঞানই তোমার বীর্য্য,—জ্ঞান তোমার অসি, জ্ঞানই তোমার বজ্র।

স্বাধীন বুদ্ধি চাই

ইহার পরে শ্রীযুক্ত নি—শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত এক সেট্ বই নিবার জন্য আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাকে পেয়ে তোরা লাভবান্ হচ্ছিস্ কি?

নি।—হচ্ছি বই কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেখ্ স্বাধীন বুদ্ধি নিয়ে বল্‌বি। যার সঙ্গ ক'রে লাভ হয় না, তাকে বর্জ্জন কর্‌বি। এর ভিতরে আর শিষ্টাচারের ধারাধারি নেই।

ময়মনসিংহ

২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৪

ভগবান্ শক্তের ভক্ত

মফঃস্বল হইতে একজন ভক্ত-যুবক আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধন-ভজন কেমন চল্‌ছে রে।

যুবক।—আপনার আশীর্ব্বাদে চল্‌ছে একরকম ভালই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মনপ্রাণ দিয়ে সাধন কর্‌বি। সাধন-ভজনহীন জীবনই বৃথা। যদি বেঁচেই থাক্‌বি, তবে ভগবানের রাজ্যের সবগুলি শ্রেষ্ঠ জিনিষ আগে অর্জ্জন ক'রে নে। শান্তি হচ্ছে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, সেইটী আগে তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে নে। অম্‌নি ত' আর দিতে যাচ্ছেন না তিনি। তুই যখন কেড়ে আদায় করবার চেষ্টা কর্‌বি, দেখ্‌তে পাবি, নিজে সেধে এসে তিনি দিচ্ছেন। রামপ্রসাদ বলেছেন,—'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি ছেলে হারে।' শক্তের ভক্ত কিনা। তিনি শক্তিমানকে ভালবাসেন, তাই শক্তিমানকেই সব দেন, তেজ দেন, বল দেন, কীর্ত্তি দেন, সৌভাগ্য দেন। এ যেন to carry coal to Newcastle (তেলা মাথায় তেল দেওয়া)। দুর্ব্বলকেও তিনি দিতে চান, কিন্তু দুর্ব্বল যে নিতে জানে না, নিতে পারে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' শক্তিমান্ হ, বীর্য্যশালী হ।

স্ত্রীগঠন

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আর দেখ, একলাটী কিন্তু শক্তিমান্ হ'তে পাচ্ছ না। স্ত্রী ব'লে যাঁকে আঁচলে বেঁধে নিয়েছ, তাঁকেও শক্তিমতী ক'রে তুল্‌তে হবে, তাঁর ভিতরেও ঐশী শক্তিকে বিকশিত ক'রে তুলতে হবে। এখন তিনি তোমার কাছে প্রাণহীন প্রস্তর, পথ চলার বাধা, বিশ্রামের বিঘ্ন, সংগ্রামের পিছন-টান। কিন্তু চৈতন্য যদি তার ভিতরে সঞ্চারিত ক'রে নিতে পার, তাহ'লে তিনি জ্বলন্ত কামানের গোলা, গতি তাঁর অপরিসীম, তোমার শত্রুর তিনি ধ্বংসকারিণী, পথের তিনি বাধা-বিনাশিনী।

বিবাহ ও চিরকৌমার্য্য

উক্ত ভক্তের সহিত বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগৎ-কল্যাণের বা জীবনাদর্শের বিরোধী ব'লে যারা বিবাহ-বর্জ্জন করে, তাদের চির-কৌমার্য্যকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। আর, ঝঞ্ঝাটের ভয়ে, দুঃখ-কষ্টের ভয়ে, পরিবার প্রতিপালনের ভয়ে যারা চির-কৌমার্য্যকে আশ্রয় কত্তে চায়, তাদের নিরুৎসাহ করা উচিত এবং যাতে তারা বিবাহিত জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলিকে জয় ক'রে আদর্শ সংসারীর জীবনযাপন কত্তে পারে, তার সুপন্থা দেখিয়ে দেওয়া উচিত।

গোপন-সাধন

বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মপুত্র-তীরে উপনীত হইলেন এবং খেলার মাঠের বিপরীতে নদীতটে বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিয়া তাঁহার এক যুবক-ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন।—দেখ্‌ত' দেখি, কেমন সুন্দর চাঁদ। কি সুন্দর আকণ্ঠপূর্ণ নদীর জল, আর কি সুন্দর এই মৃদু সমীরণ। এমন সময়ে ভগবানের প্রেমময় নাম ছাড়া আর কি ভাল লাগ্‌তে পারে রে! আয়, বোস, কতক্ষণ ব'সে তাঁর নাম করি।

পার্শ্বেই রাজপথ দিয়া শত শত লোক চলাচল করিতেছে। যুবকটী আড়ষ্টভাবে বসিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার পিঠে আস্তে এক কিল মারিয়া বলিলেন,—মেরুদণ্ড সোজা কর্ বাছা। আসন ক'রে ভাল হ'য়ে ব'সে নে! চোখ্ বুজ্‌তে হবে না, খোলাই রাখ্। লোকে দেখুক, তুই ব'সেই আছিস, আর মজা মেরে হাওয়া খাচ্ছিস, তুই জান্ যে, তুই সাধন কচ্ছিস্, আর মজা মেরে অমৃতের ভাণ্ডার লুটে নিচ্ছিস।

শরীর-স্পর্শের নিষিদ্ধতা

কিছুক্ষণ পরে আরও তিন চারিটী যুবক-ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন। পরস্পর ঘেঁষাঘেষি করিয়া বসিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কারো শরীর স্পর্শ ক'রো না।

সকলে আল্‌গা হইয়া বসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বিশেষ ভাবে একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—যখন দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার প্রতি বহু লোক আকৃষ্ট হচ্ছে তখন সাবধান হবে। পরকে

আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা যখন আস্‌তে থাকে, তখন যার তার দেহস্পর্শ করা ঠিক্ নয়। যে যত অকপট চিত্তে সাধন কর্ব্বে, তার ভিতরে এই চৌম্বক শক্তি তত বেশী বাড়তে থাক্‌বে। ততই নিজের নিজস্বতা অটুট রাখবার দিকে বেশী সতর্ক হবে।

তৎপরে সকলের প্রতি উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—দেহস্পর্শের মধ্য দিয়া দেহধারীর সূক্ষ্ম চিন্তার প্রভাবও আসে। যিনি নিয়ত সচ্চিন্তাতে মগ্ন আছেন, তাঁর দেহের প্রত্যেকটা পরমাণু সচ্চিন্তার প্রভাব পায়, সচ্চিন্তার গুণে দেহ পবিত্রতাসম্পন্ন হয়। এই জন্যেই লোকে পবিত্র ব্যক্তিকে প্রণাম করে। কিন্তু যার মন অপবিত্র তার দেহস্পর্শে অপবিত্রতা আস্‌তে পারে।

সাধুপুরুষের পাদস্পর্শ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সাধুজনের পাদস্পর্শ করার পূর্ব্বে তাঁদের অনুমতি নেওয়া উচিত, নতুবা তাঁদের অসন্তোষের ফলে মহান্ অনর্থ ঘট্‌তে পারে। যাঁরা কোনও মহৎ ব্রত বা সঙ্কল্প নিয়ে জীবন-যাপন করেন, বিরোধী চিন্তার লোক তাঁদের পাদস্পর্শ কর্‌লে তাঁদের মানসিক ক্লেশ জন্মে। এই জন্যেই সাধু, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পাদস্পর্শ সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকা ভাল।

প্রণাম

প্রণাম সম্বন্ধে বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

সাধু ব্যক্তিকে প্রণাম কর্‌লে অনেক লাভ, অবশ্য যদি তাঁর অনভিমত না হয়। তাঁর পাদস্পর্শে তাঁর সচ্চিন্তাগুলি সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। আর, শক্তিমানের আশীর্ব্বাদও অব্যর্থ। প্রণাম কত্তে ভ্রূমধ্যে মন রেখে করতে হয়।

ত্রাটক-যোগ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রাটক-যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—মন স্থির করার জন্যে ত্রাটক-যোগ বেশ একটা উপায়। যে কোন একটা সুন্দর জিনিষের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক্‌লে যখন তার চারিদিকের সব বস্তু আর কিছু দেখা যায় না, শুধু ঐ নির্দ্দিষ্ট বস্তুটাই দেখা যায়, তখনই ত্রাটক হ'ল। তাকাও দেখি ঐ নদীর পানে, যখন দেখ্‌বে এত বড় চাঁদটার এতগুলি প্রতিবিম্বের * মধ্যে একটারও অস্তিত্ববোধ নেই, তখন বুঝবে ত্রাটক হ'ল। এর পরে আরো সব সূক্ষ্ম রকমারি আছে। লক্ষ্যভেদ কালে পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে একমাত্র অর্জ্জুনেরই ত্রাটক হ'য়েছিল। কিন্তু ত্রাটকেও বিপদ আছে। ত্রাটকাভ্যাসকারীর সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য চাই, আর চক্ষুর হিতকর, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহার্য্য চাই। নইলে সূর্য্যাদিতে দৃষ্টি-সন্নিবেশকালে উন্মাদ-রোগ জন্মাতে কতক্ষণ? যারা খুব লেখাপড়া বা মাথার অন্য রকম পরিশ্রম করে, যাদের মন নিয়ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

* কথোপকথন-সময়ে ব্রহ্মপুত্র-নদে চতুর্দ্দশীর চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিতেছিল।

এবং যাদের শারীরিক স্বাস্থ্য অনিশ্চিত, তাদের পক্ষে ত্রাটক অভ্যাসের চেষ্টা আদৌ উচিত নয়। ওতে চক্ষুর জ্যোতি না বেড়ে বরং ক'মে যাবে। ত্রাটক অভ্যাসের কালে চক্ষু ও মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।

একজন ভক্ত বলিলেন,—তবে আমাদের দ্বারা ত্রাটক হবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি,—না-ই বা হ'ল, ক্ষতিটা কি? মন স্থির করার পক্ষে ত্রাটকই একমাত্র পথ নয়, আরো শত শত সুন্দর ও সহজ পথ আছে।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন,—কালকে পূর্ণিমা ও বৃহস্পতিবার। এমন সংযোগ বড় মেলে না। অমাবস্যার সাথে মঙ্গলবার যেমন একটা শুভ-সংযোগ। শাক্তদের কাছে অমাবস্যার বড় মান। বৈষ্ণবদের কাছে একাদশীর বড় মান। শৈব ও বৌদ্ধদের কাছে পূর্ণিমার বড় মান। আমরাও পূর্ণিমাটাকে খুব মানি। পূর্ণিমার সেরা হচ্ছে বৈশাখী-পূর্ণিমা। কিন্তু আমরা বৌদ্ধও নই, শৈবও নই। কিন্তু তবু আমরা পূর্ণিমাকে কেন মানি জানিস্? পূর্ণিমার রাতটা হচ্ছে বিশ্ববাসী সকলকে নিয়ে একযোগে সাধন করার জন্য, সবার সাথে ভাগ ক'রে আনন্দ ও প্রেম লুটে নেবার জন্য। আব্রহ্মস্তম্ব সবার সাথে এ দিন সাধকের যোগ, কেউ এ দিন পর নয়, এ দিন

কারো জন্য উপেক্ষা নেই, সবাই সবার আপন,—অবশ্য জাগতিক যোগে নয়, সাধন-যোগে। অমাবস্যাকেও আমরা মানি, কিন্তু সেটা একক সাধকের জন্য। জগজ্জোড়া অন্ধকার, কেউ কারো মুখ দেখ্‌তে পায় না, যার যার নিজের সাধন নিয়ে নিভৃতে থাকে। অমাবস্যার রাতে ছোটবড় সবাইকে প্রাণের প্রাণ ব'লে মনে হচ্ছে না, সম্পর্ক শুধু উত্তর-সাধকের সঙ্গে, আর যা-কিছু সবই সাধকের চক্ষে মৃত! পূর্ণিমার রাতের সাধন হচ্ছে সৃষ্টির বুকের উপরে ব'সে সাধন, সে সাধনের নাম জীবন-সাধনা। আর অমাবস্যা রাতের সাধন হচ্ছে শ্মশানের বুকে ব'সে সাধন, তার নাম হচ্ছে শব-সাধনা।

ময়মনসিংহ

২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৪

আজ বৃহস্পতিবার এবং পূর্ণিমা। সন্ধ্যা-সমাগমে শ্রীশ্রীবাবামণির ভক্তেরা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কারো দেহ স্পর্শ ক'রো না, স'রে স'রে বস।

তারপরে যার যার সাধন আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেই স্থিরাসনে বসিয়া যার যার গুরুদত্ত নামের সেবা এবং ধ্যান করিতে লাগিলেন। দুই একজন ছিলেন, যাঁহারা গুরূপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও নিজেদের রুচিমত জপ ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়াছিলেন, পূর্ণ চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তাঁহার মুখমণ্ডলে পতিত হইতেছিল। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্নিমেষ নয়নে পূর্ণচন্দ্রমার দিকে তাকাইয়া

রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে ধ্যানস্থ হইলেন।

একত্র-সাধন ও প্রেমের বিশুদ্ধি

ধ্যান ভঙ্গ হইলে কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক পূর্ণিমায় বা বৃহস্পতিবারে বা মঙ্গলবারে এইভাবে সব আপনার জনেরা নিভৃতে মিলিত হবে এবং সাধন করবে। এতে অনেক কল্যাণ হয়, পরস্পরের প্রেম বাড়ে। সাধন একত্র করার ফলে যে প্রেম জন্মে, সে প্রেমে ভেজাল থাকে না, অশুদ্ধতা আসে না। সমভাবের ভাবুকদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা বা দেখাশুনাই প্রেমলাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ওতে অশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চারে বাধা হয় না। কিন্তু একত্র সাধন করার ফলে যে প্রেম জন্মে, সে প্রেম একেবারে অনাবিল, সুবিশুদ্ধ। সুতরাং একত্র সাধনের এই সুযোগটীকে ছাড়্‌বে না। মাসের মধ্যে পূর্ণিমা, সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার, দিনের মধ্যে প্রাতঃ ও সায়ংকাল সমবেত সাধনের প্রকৃষ্ট সময়।

সাধনে নীরবতা

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—কিন্তু সমবেত সাধনে যে বস্‌বে, হট্টগোল করবে না। সাধনে বসবার আগে বা পরে কিম্বা সাধনের সময়ে কোন গোলমাল করবে না। সব আপনারজনদের না পাও, যে কয়েকজনকে সম্ভব, তাদের নিয়েই বস্‌বে। বস্‌বার আগে কোনও

শাস্ত্র বা সদ্‌গ্রন্থের এক আধটুকু পড়্‌তে পার, কিন্তু এতে যদি তোমাদের ভিতরে বাক্যালাপের রুচি-সৃষ্টির সম্ভাবনা হয়, তবে তারও দরকার নেই। বস্‌বার আগে ভগবৎ-সঙ্গীতও গাইতে পার কিন্তু সেটা যদি প্রাণের টানে না হয়, তবে তাও বর্জ্জনীয়। যদি কখনো দেখ যে, ব্যাপারটা হুজুগে দাঁড়াচ্ছে, তাহ'লে পূর্ণিমা মিলনটা তুলে দেবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে হুজুগের স্থান আছে, সাধন-ভজনের মধ্যে হুজুগের কোনো স্থান নেই, উপাসনার পরে হট্টগোল না ক'রে নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করবে। উপাসনার পরে বক্তৃতার বাতিকগ্রস্ত লোকদের প্রশ্রয় দিবে না।

ধর্ম্মসাধন ও হুজুগ

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুগ হচ্ছে, তা' বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যখন দেখ্‌বে সমবেত সাধনে বস্‌বার আগে আগন্তুকদের মধ্যে কথা কইবার প্রবৃত্তি খুব প্রবল, যখন দেখ্‌বে সাধনের সময় কারো মধ্যে গলাগলি ক'রে বসার ঝোঁক্ দেখা যাচ্ছে, যখন দেখ্‌বে সাধন হ'য়ে যাবার পরে সবাই সাধন-জগতের বাইরের যত সব বাজে কথা নিয়ে মত্ত হচ্ছে, তখনই জান্‌বে যে, হুজুগ হচ্ছে, কাজ কিছু হচ্ছে না। সুতরাং তখন বরং পূর্ণিমা-মিলন বা বৃহস্পতি সম্মিলনী বা মঙ্গলোৎসব বন্ধ করবে, তবু ধর্ম্ম-সাধনের ব্যাপারে হুজুগকে প্রশ্রয় দিবে না।

ময়মনসিংহ
১লা শ্রাবণ, ১৩৩৪

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-জপকে জান্‌বে আমৃত্যু সাধন। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসও আছে, যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ তোমার নামজপও আছে। যতবার শ্বাস টান্‌বে, ততবার মনে মনে নামজপ করবে। যতবার শ্বাস ছাড়বে, ততবার মনে মনে নামজপ করবে। প্রত্যেকটী শ্বাসের সঙ্গে নামকে অবশ্যই যুক্ত ক'রে দেবে। শ্বাস যেন রেলগাড়ী। একবার ময়মনসিংহ থেকে ভৈরববাজার যায়, আবার ভৈরববাজার থেকে ময়মনসিংহ আসে। যতবার যায়, ততবার ঐ গাড়ীতে একটী ক'রে নাম তুমি বোঝাই ক'রে দেবে। কিন্তু সব সময়ে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, শ্বাস-প্রশ্বাস হবে নিতান্ত স্বাভাবিক, ইচ্ছা ক'রে বা জোর ক'রে তাকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা চল্‌বে না।

কুম্ভকে নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ময়মনসিংহের ট্রেণ ভৈরব গিয়েই ফিরে এল, ভৈরবের ট্রেণ ময়মনসিংহ এসেই ফিরে চল্ল। এই হ'ল সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা। কিন্তু নামে যখন তোমার অভিনিবেশ তীব্র হবে, তখন টেণ নিজের মাল-খালাসী দেবার

জন্য একটু সময় একবার ময়মনসিংহেও জিরুবে, একবার ভৈরববাজারেও জিরুবে। এইটা হ'ল শ্বাস-প্রশ্বাসের কুম্ভক বা স্থিতির অবস্থা। এই কুম্ভক বা স্থিতিটা যখন স্বাভাবিক ভাবে হবে, তোমার তরফ থেকে কোনও প্রকার চেষ্টার প্রতীক্ষা না ক'রে আপনা আপনি হবে, তখন তুমি প্রত্যেকটী কুম্ভকেও একবার নাম-জপ কর্ব্বে। বাহিরের কুম্ভকেও করবে, ভিতরের কুম্ভকেও কর্ব্বে। তারপর ক্রমশঃ দেখ্তে পাবে যে, তোমার কোনও আয়াস বা যত্ন বা সঙ্কল্প ছাড়াই আপনা আপনি এই কুম্ভকের কাল-পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

বাহ্যবৃত্ত কুম্ভক ও আভ্যন্তর কুম্ভক

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাহিরের কুম্ভক আর ভিতরের কুম্ভক, ব্যাপারটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস তুমি নিয়েছ, প্রশ্বাস সঙ্গে সঙ্গেই আর বের হ'ল না, কতক্ষণ বা স্থির হ'য়ে রইল। একে ব'লে ভিতরের কুম্ভক বা আভ্যন্তর কুম্ভক। প্রশ্বাস তুমি ত্যাগ করেছ, শ্বাস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল না, কিছুক্ষণ বায়ু স্থির নিশ্চল হ'য়ে রইল। একেই ব'লে বাহ্যবৃত্ত কুম্ভক বা বাইরের কুম্ভক।

স্বাভাবিক কুম্ভকে ও চেষ্টিত কুম্ভকে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম কত্তে কত্তে আপনি তোমার

কুম্ভকের কাল বেড়ে যাবে। এর নাম স্বাভাবিক কুম্ভক। স্বাভাবিক কুম্ভকের কোনও অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু চেষ্টাকৃত কুম্ভক অনেক সময়েই গুরুতর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। তোমরা স্বাভাবিক কুম্ভকেরই আস্থা রাখ্বে।

ময়মনসিংহ

৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি বিক্রমপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখক যুবককে তাহার পত্রের যে উত্তর প্রদান করিলেন, নিম্নে তাহা অনুলিখিত হইল।

ভবিষ্যতের ভারত ও বিবাহিত জীবন

"তোমার পত্র পাইয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমি ভবিষ্যতের এক অভ্যুন্নত ভারতবর্ষের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছি। সেই ভারতবর্ষকে যাঁহারা গড়িবেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প যেরূপ পবিত্র হওয়া প্রয়োজন তোমার সঙ্কল্পে সেই পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিবাহিত জীবন যে ভোগতৃপ্তির জন্য নয়, এই কথা বহুকাল যাবৎ ভারত বিস্মৃত রহিয়াছে। এই জন্যই ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতি সকল দিক্ দিয়া ভারতের জাতীয় জীবনকে আক্রমণ করিয়াছে। বিবাহিত হইয়াও বিবাহিত-জন-সুলভ দৈহিক সম্বন্ধের প্রয়োজনকে উচ্চতর আদর্শের পায়ে বলি দিবার যে সাধু সঙ্কল্প তুমি করিয়াছ, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পত্নী ও পাপদৃষ্টি

"অনিচ্ছাসত্ত্বে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়াই বিবাহটাকে অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিবাহিত জীবনটা যে একটা ঘৃণ্য পশুর জীবন, একটা কামলুব্ধ লম্পটের জীবন, একটা অমানুষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবন, এই কথাটাকে অস্বীকার করিতে হইবে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে; স্ত্রী স্বামীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু এই কর্ত্তব্যের সীমা-রেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ কাহারও প্রতি ব্যবহারে বা মানসিকতায় ইতর জন্তুর ন্যায় হইবে না,—এটুকুই তোমাকে বুঝিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী-বর্জ্জন তোমার লক্ষ্য হইতে পারে না; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পুরুষজাতি নারীর সাহচর্য্যকে যে পঙ্কিল দৃষ্টিতে, মলিন বুদ্ধিতে ও পাপ-লালস-চিত্তে চাহিয়াছে, তাহা বর্জ্জনেই তোমার চিন্তা-চেষ্টা ধাবিত হইবে।

দেহ-সম্পর্ক-বিরহিত দাম্পত্য জীবন

"বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে দেহ-সম্পর্ক-বিরহিত ভাবে দাম্পত্য-জীবন পরিচালনার দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে আছে। শুধু আমাদের দেশে নহে, বিদেশেও আছে। সুতরাং যদি এই প্রেরণা নিজ অন্তর হইতে লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই মহতী চেষ্টায় সফল যে তুমি হইবেই, তাহা দৃঢ়রূপেই বিশ্বাস করিও। যে সকল লোক-পাবন মহাত্মা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন নাই, পরন্তু, আমৃত্যু কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া জীব

কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরও মধ্যে এমন শত শত বীর্য্যবান্ পুরুষ ছিলেন, যাঁহারা দার-পরিগ্রহের প্রয়োজন বোধ করিলে এবং দাম্পত্য-জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে দেহ-সম্পর্ক-বিরহিত রাখিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিতেন। তাঁহারা কোনও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব, তুমিও এই বিশ্বাস করিও যে, যত্নের মত যত্ন করিলে তুমিও পারিবে।

মহাপুরুষ বনাম সাধারণ মানুষ

"মহাপুরুষেরা তাঁহাদের তপস্যার বলে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উন্নত হন, সাধন-প্রভাবে তাঁহারা অভ্রভেদী উচ্চতা লাভ করেন। সাধারণ মানুষ যদি তাঁহাদের মত করিত, তবে ঠিক অমনি হইতে পারিত; তাঁহাদের অপেক্ষা একটুকুও ছোট হইত না। চরম উন্নতি লাভের সামর্থ্য লইয়া জগতে শুধু একটি মানুষই আসিবেন অথবা দুই চারি সহস্র বছর পরে পরে এক-আধ জন করিয়াই আসিবেন, এরূপ ধারণাকে মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও স্থান দিও না। একটী রামকৃষ্ণকে দিয়াই বিচিত্র জগতের অনির্ব্বচনীয় বিকাশ থামিয়া যাইবে, ইহা মনে করিও না। অতীতে যাঁহারা সহস্র বৎসর পরে পরে আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা এক এক দিনে শত সহস্র করিয়া আবির্ভূত হইবেন। আমি স্পষ্ট যেন দেখিতে পাইতেছি, একটী রামকৃষ্ণের পশ্চাতে

পশ্চাতে কোটি কোটি রামকৃষ্ণ নিত্য নবতর, সুন্দরতর, সুষ্ঠুতর সাজে সজ্জিত হইয়া আসিতেছেন, বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্র মহিমাকে অপূর্ব্বতর বৈচিত্রে বেড়িয়া ধরিতেছেন। বিশ্বাস কর,—কোটি কোটি রামকৃষ্ণের মধ্যে তুমিও একজন।

ভবিষ্যতের দিব্য গৃহিগণ

"উনবিংশ শতাব্দীর লোকত্রাতা রামকৃষ্ণ সংসার-বিমুখ পূজারী ছিলেন। তাই বলিয়া মনে করিও না, ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণেরা সকলেই কালীমাতারই পূজারী হইবেন বা দক্ষিণেশ্বরে গিয়াই সাধনার আসন পাতিবেন। উনবিংশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণকে বন্দী ও চারণেরা স্তুতি-গীতিতে অর্চ্চনা করিতেছে, তাই বলিয়া মনে করিও না, আগামী যুগের রামকৃষ্ণগণের জন্যও স্তুতি-গীতি অবশ্যই থাকিবে। ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণদের কত জন হয়ত বারুদের স্তূপের মধ্যে, কামানের গোলার মুখে, রণকোলাহল-মুখরিত মৃত্যুপ্রান্তরের মধ্যস্থলে তাঁহাদের সাধনার আসন রচিবেন। তাঁহাদের কত জন হয়ত সাঙ্গোপাঙ্গহীন, সঙ্গি-শিষ্যহীন, পার্ষদপরিজনহীন-ভাবে স্তুতি-বন্দনা উচ্চারণের সকল সম্ভাবনার অতীতে থাকিয়াই জীবনের সাধনাকে পূর্ণতা দান করিবেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পাষাণী জননীর উপাসনার মধ্য দিয়া যে পরম জ্ঞান ও যে কামগন্ধহীনতা ফুটিয়াছিল, ঠিক তাহাই অন্যতর প্রতীকের মধ্য দিয়া, অন্যতর ধারা অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। সেই দিন ভারতবর্ষের নেপোলিয়ান নিজ ললাটে রামকৃষ্ণত্বের ছাপ লইয়া

জয়যাত্রায় বহির্গত হইবেন, সেই দিন ভারতবর্ষের শ্রমজীবী নিজের হৃদয়ে নিত্য-রামকৃষ্ণত্বকে প্রত্যক্ষ জানিয়া গুরুভার শ্রমের দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইবে বা দুঃখভার লাঘব করিবার উপায় আবিষ্কার করিবে।

"তুমিও, তাহাদেরই অন্যতম। তুমি জীবিকার্জ্জনের জন্য শ্রম কর বলিয়া পরমজ্ঞানীর সংযম পাইবে না, ইহা হইতে পারে না। জীবিকার চেষ্টার মধ্য দিয়াও তোমার উহা লাভ হইতে পারে,—ইহা জানিও।

প্রকৃত সংযম

"তবে, এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখি যে, স্ত্রীর সহিত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই সংযমের চূড়ান্ত নহে। দৈহিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা সংযমের একটা বহির্লক্ষণ মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সংযম হইতেছে, মনের সকল স্পন্দনের উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা * * * শ্রীপ্রভু তোমার কল্যাণ করুন।"

অবতার রামকৃষ্ণ ও মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ

পূর্ব্বোক্ত পত্রখানা লিখিত হইলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক রামকৃষ্ণভক্তকে উহা দেখাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত ভক্ত একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবতার রামকৃষ্ণ শুধু

একটা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাক্‌বেন, একটা সম্প্রদায়-বিশেষই তাঁকে পূজা করবে, কিন্তু মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ হবেন সর্ব্বজনীন পূজার বস্তু, সমগ্র বিশ্ব করবে তাঁর উপাসনা। আমি সেই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণেরই ভক্ত।

ব্রহ্মচর্য্য-লিপ্সু শূদ্র-সন্তানের গায়ত্রী-জপ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ফেণী (নোয়াখালী)-নিবাসী জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন।

"বীর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যত্ব-লাভের উন্মাদনা,—ইহাই ত' চাই। যাহা তোমার এই সাত্ত্বিকী প্রার্থনার পূর্ণতা বিধান করে, তাহাই তোমাকে গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যে সঙ্কোচ, যে আত্মাবজ্ঞা, যে আত্মপ্রত্যয়হীনতা কিছুদিন পূর্ব্বেও একটা সদাচার বা সুশীলতা বলিয়া গণ্য ছিল, মনুষ্যত্বের দাবী পূর্ণ করিবার জন্য নিজের অনন্ত বিকাশকে উন্মেষিত করিবার জন্য আজ তাহা পরিহার করিতে হইবে এবং যাহা কিছু উন্নতি-পথের সহায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

"ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিবার তোমার অধিকার আছে। সত্য কাহারও পেটেন্ট-করা সামগ্রী নহে, উহা সকলের জন্য এবং সর্ব্বদার জন্য। বংশগরিমা কাহারও হস্তে ব্রহ্মসাধনার অধিকার অর্পণ করে না, প্রাণের আকুলতাই ইহার অধিকারদাতা। তোমার প্রাণ কি ব্রহ্মসাধনার্থ ব্যাকুল হইয়াছে? তোমার হৃদয় কি ভগবানের প্রতি অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণকে অনুভব করিতেছে?

তোমার চিত্তবৃত্তিগুলি কি তোমার প্রাণের ঠাকুরের পাদপদ্মের সুমধুর স্পর্শ পাইবার জন্য অধীরতা বোধ করিতেছে?

"গায়ত্রী মন্ত্র তোমার পক্ষে কল্যাণবাহী হইবে, এই বিশ্বাস যদি তোমার থাকে, তবে আর বৃথা সঙ্কোচ করিও না। ব্রাহ্মণের বংশজাত নহ বলিয়াই নিজেকে এই মহামন্ত্র সাধনের অযোগ্য মনে করিও না। উপবীত প্রাপ্ত হইয়া থাক আর না থাক, কিছু যায় আসে না। গায়ত্রী যোগে ভগবৎ-সাধনা করিতে করিতেই ক্রমে তোমার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিবে।

"সদা সৎসঙ্গে থাকিবে। কারণ,—

সংসর্গ করিবে যার, তার মত হবে মন,
সাধুসঙ্গে সুচিন্তায় উজ্জ্বল চরিত্র-ধন।

"শ্রীভগবান্ তোমার কুশল করুন।"

সাধক ও অসাধক ব্রাহ্মণ

একটী যুবক এই পত্রখানা নকল করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "এই পত্রখানা কোনো ব্রাহ্মণের চ'খে পড়্‌লে সে বড় চটবে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণ সাধন করে না, শুধু পৈতাই ঝুলিয়ে বেড়ায়, সে চট্‌বে। আর যিনি সাধন করেন, তিনি সাধন ক'রে শক্তি লাভ করেছেন, তিনি প্রীত হবেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ মহত্তর

বৈকালে ব্রহ্মপুত্র-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—কখনো তোমরা একথা মনে ক'রো না যে, অতীতের মহাপুরুষদের সমকক্ষ তোমরা হ'তে পার না। যাঁরা একবার আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা আরো শতবার আবির্ভূত হবেন। ধর্ম্মের দিক্ দিয়েই বল, আর রাষ্ট্রের দিক্ দিয়েই বল, পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন হবেই হবে। সৃষ্টিরও যোগ হবে, যা' আগে ছিল না। ভারতবর্ষের নরনারী সাতশ' বছর গণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সাধনা করেছে, ধর্ম্মের দিগ্বিজয়ও করেছে। ভারতবর্ষের মাটি অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধনকে জন্ম দিয়েছে, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানককে স্তন্য পান করিয়েছে। ভবিষ্যতে এ মাটিতে আরো অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষদের আবির্ভাব হবে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ আরো অনেক নূতন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্‌বে।

ময়মনসিংহ

৪ঠা শ্রাবণ, * ১৩৩৪

বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বর্জ্জন

জনৈক উপদেশপ্রার্থী যুবকের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য লাভ কত্তে হ'লে বৈরাগ্যের সাধনা কত্তে হয়। বৈরাগ্য কাকে বলে? সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি-বর্জ্জনই বৈরাগ্য। অন্ন, পানীয়, পরিচ্ছদ, শয্যা, ঐশ্বর্য্য এবং অপরাপর ভোগ-যোগ্য যাবতীয় বস্তুর প্রতি নির্লোভতাই

* ৪ঠা শ্রাবণ হইতে কতিপয় দিবসের কথোপকথনগুলির তারিখ সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই বলিয়া অনুমিত তারিখ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বৈরাগ্য। বিষয়-বর্জ্জনই বৈরাগ্য নয়। কেন না, বিষয় থেকে দূরে থেকেও মনে মনে ভোগলিপ্সা থাক্‌তে পারে। ভোগের লিপ্সা যদি থাকে, জান্‌বে বৈরাগ্য হয় নি। বৈরাগ্য বলতে বিষয়ের প্রতি আতঙ্ক বুঝ্‌বে না, বুঝতে হবে লিপ্সাহীনতা। তুমি ব্রহ্মচারী, স্ত্রীলোক দেখলেই তোমার আতঙ্ক হয়, 'এই বুঝি গেলাম, এই বুঝি মর্‌লাম',—অতএব তুমি স্ত্রীলোকদের সংশ্রব ছেড়ে পালালে।—এর নাম স্ত্রীজাতির প্রতি বৈরাগ্য নয়, এর নাম স্ত্রী-আতঙ্ক বা স্ত্রীভীতি। এটা জলাতঙ্কের মতন একটা রোগ-বিশেষ, এটা মনের স্বচ্ছন্দতার বা সুস্থতার লক্ষণ নয়। বৈরাগ্য বলতে বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষও বুঝবে না। কোনো কোনো স্ত্রীলোক হয়ত তোমার চরিত্র সম্পদ নষ্ট করেছে, তোমার রক্ত-শোষণ করেছে অথবা তোমার কোনো বন্ধু হয়ত কামিনীর মোহিনী মায়ায় ভুলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, অতএব তুমি স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'য়ে স্ত্রী বর্জ্জন কর্‌লে। এর নামও স্ত্রীজাতির প্রতি বৈরাগ্য নয়। এর নাম স্ত্রী-বিদ্বেষ। এটাও অনেক স্বদেশসেবকের ইংরেজ-বিদ্বেষের ন্যায় মনের একটা রোগ-বিশেষ, মনের সুস্থতার লক্ষণ নয়। পরন্তু, বৈরাগ্য হচ্ছে সুস্থ, সবল, স্বচ্ছন্দ মনের একটা অবস্থা। সুস্থ মন প্রত্যেক বস্তুর দোষ-ত্রুটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতে পারে, কিন্তু দোষীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয় না। সুস্থ মন অকল্যাণকারীর অনিষ্ট কর্‌বার ক্ষমতাটুকুর যথার্থ পরিমাণ নির্ণয় কত্তে পারে, কিন্তু তা' যদি অত্যন্ত ভয়ানকও হয়, তবু বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি

স্ত্রী-সম্পর্কে বর্জ্জন কত্তে পারে; কিন্তু তা' ঘৃণা, বিদ্বেষ বা ভয় থেকে নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি তৃষ্ণার অভাবই তাঁর এই সংস্পর্শ-বর্জ্জনের কারণ।

বৈরাগ্য ও গার্হস্থ্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—তাই ব'লে কি বল্‌তে হবে যে, বিষয়-বর্জ্জন বিষয়-বৈরাগ্যের নিত্য লক্ষণ? অর্থাৎ, যার স্ত্রীজাতিতে তৃষ্ণার অভাব, তাঁকে স্ত্রীদের সংশ্রব বর্জ্জন কত্তেই হবে? না, তা' নয়। যিনি স্ত্রীজাতিতে বৈরাগ্যযুক্ত, তিনি স্ত্রীলোকদের সংশ্রবেও আস্‌তে পারেন। অর্থাৎ, কেউ স্ত্রীলোকদের সংশ্রবে এসেছেন ব'লেই তিনি যে বৈরাগ্যযুক্ত নন, এমন কথা চট্ ক'রে ব'লে ফেলা যায় না। বৈরাগ্যবান্ গৃহীদের বিষয় এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যাক্। সাধনের ফলে তাঁরা স্ত্রী-জাতিতে ভোগ-লিপ্সাহীন হ'য়েছেন, তাই ব'লে কি সবাই যাঁর যাঁর স্ত্রীকে ঘরে ফেলে রেখে কৌপীন-কম্বল নিয়ে হিমালয়ে আর বিন্ধ্যাচলে চলে যাবেন? না, তা' নয়। স্ত্রী হ'তে ভোগ-লিপ্সা উঠে গিয়েছে, বহুৎ আচ্ছা, যাঁকে নিয়ে এতদিন ভোগময় জীবন-যাপন করা গিয়েছে, তাকে নিয়ে এখন থেকে ত্যাগময় জীবন-যাপন চল্‌তে থাকুক। তাহ'লেই গার্হস্থ্য ও বৈরাগ্যের সমন্বয় সাধিত হবে।

দেশসেবার্থে আত্মগঠন

দুই তিন দিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা চলিয়া

যাইবেন বলিয়া সম্প্রতি মুলতুবী পত্রসমূহের জবাব দিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল পত্রের দুই একখানা নিম্নে অনুলিখিত হইলঃ—

"* * * আমরা যখন ভবিষ্যৎকে অবিশ্বাস করি, তখনই আমাদের মরণ ডাকিয়া আনি। আকাশে মেঘসজ্জা দেখিয়া যখন নৌকার হাল ছাড়িয়া দেই, তখনই আমাদের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করি। বর্ত্তমানের দুঃখ দেখিয়া যখন যুদ্ধ করিতে অসম্মত হই, তখনই ভবিষ্যতের জন্য অনন্ত দুঃখপুঞ্জের সৃষ্টি করি।

"দর্শনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি না, তোমার বেদন-মথিত অবিচার পীড়িত চিত্তকে দুঃখজয়ের পথ দেখাইতেছি। বিশ্বাস কর, তুমি সকল দুঃখের অতীত, সকল দুঃখবোধের অতীত, সকল আর্ত্ততার অতীত। বিশ্বাস কর, তুমি দুঃখজয়ী মহাবীর, এই জগতের কোনও সুখ-দুঃখের এত ক্ষমতা নাই যে, তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।

"তোমার প্রাণ দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্য এবং যুবক-সুলভ উৎসাহ তোমাদিগকে বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল যে, জীবনকে জ্ঞানে ও গুণে গঠিত করিতে শিখিবার আগে সে জীবন দ্বারা দেশসেবা শুধু কৃপণের মতই হয়। দেশকে উদারতম সেবা দিবার জন্য তোমাকে আগে মহান্ হইবার প্রাথমিক যোগ্যতাগুলি সঞ্চয় করিয়া লইতে হইবে। তারপরে দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার

যোগ্যতাও বাড়িতে থাকিবে। দেশসেবা ব্যাপারটা Permanent apprenticeship (চিরস্থায়ী শিক্ষানবীশী)। যতই সেবা করিবে, ততই শিক্ষানবীশী পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে, কিন্তু শিক্ষানবীশীর আর শেষ ঘটিবে না। অথচ তোমার উন্নতহৃদয় তোমাকে প্রাথমিক যোগ্যতাগুলির প্রতি অমনোযোগী করিয়াছিল। এজন্য অবশ্য আমি তোমাকে তিরস্কার করিতে চাহি না। কারণ, দেশসেবার জন্য যে আগ্রহ মানুষকে তাহার ব্যক্তিগত সুখ ও প্রতিষ্ঠার কথা ভুলাইতে সমর্থ হয়, সে আগ্রহ কখনও নিন্দার্হ বস্তু নহে, বরঞ্চ চিরকাল উহা কবিকুল-কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। তবে এ বিষয় উল্লেখ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এখন তোমাকে সর্ব্বকর্ম্মের জন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা-সঞ্চয়ে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। যাহাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা নাই, তাহারা যদি কখনও কোনও সদুদ্দেশ্যেও সঙ্ঘ গড়ে, তাহা হইলেও ঐ সঙ্ঘ সবলতা-আহরণে অসমর্থ হইয়া বিফলতার সহিত মৈত্রী-বন্ধন রচনা করে।

"অতীতের এই ভুলের জন্য অনুতাপ করিয়া মুসড়িয়া পড়ারও কোনও প্রয়োজন নাই। ভুল সকলেই করে এবং সকল ভুলই সংশোধন করা সম্ভবপর। এমন ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধ নাই; সেইরূপ এমন ভ্রম-প্রমাদও নাই, যাহার সংশোধন নাই। সংশোধনে একটু বেগ পাইতে হইতে পারে, একটু খাটুনী বেশী হইতে পারে কিন্তু তার জন্য পশ্চাৎপদ তুমি কিছুতেই হইও না। তুমি তোমার মন হইতে সকল ব্যথার গ্লানি, সকল

অপমানের বেদন, সকল অবিচারের দুঃখ মুছিয়া ফেলিয়া সদ্যঃস্নাত ঋষি-বালকের ন্যায় নিরুদ্বেগ-চিত্ত হও এবং তোমার জীবন-দেবতার পূজার জন্য সর্ব্বাগ্রে সুরভি পারিজাতরাজি চয়ন কর।"

অখণ্ডের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনের যোগে সংযুক্ত, তাঁহারা নিজেদিগকে "অখণ্ড" আখ্যা দান করিয়া থাকেন। এই আখ্যা দিবার বিশেষ কারণ এই যে, ইঁহারা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত, নির্দ্দিষ্ট দর্শনশাস্ত্র, নির্দ্দিষ্ট দেবতা বা নির্দ্দিষ্ট অবতার মান্য করিয়া চলিতে বাধ্য হন না, পরন্তু শ্রীভগবানের অখণ্ড-নাম লইয়া উপদেশানুযায়ী সাধন করিতে করিতে নিজেদের সাধনলব্ধ অনুভূতির অনুযায়ী ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মমত বা দর্শনশাস্ত্রাদির অনুবর্ত্তন করেন। ধর্ম্মমতাদি বিষয়ে এই অবারিত স্বাধীনতা থাকায় শ্রীশ্রীবাবামণির অনুগৃহীতগণের মধ্যে তথাকথিত কোনও সাম্প্রদায়িক বন্ধন নাই। এই জন্যই পরিচয়ার্থে শুধু "অখণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

এই সম্পর্কে একজন একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অখণ্ড কাহাকে কহে? অখণ্ড-নাম পাইলেই কাহাকেও অখণ্ড-সংজ্ঞা দান করা যায় না, বিশ্ববাসী সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি ভ্রাতৃবুদ্ধি, জগতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবিহীন

প্রেমভাব, সকল ধর্ম্ম, সকল দর্শন, সকল কর্ম্মপন্থা ও সাধন-প্রণালীর প্রতি হিংসাহীন নির্ম্মল দৃষ্টি পোষণ করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অখণ্ড-আখ্যায় আখ্যাত করা যায় না। আর্ত্তের ত্রাণে, দুঃখীর দুঃখ-বিদূরণে, পতিতের অভ্যুদয়-বিধানে যে কোনও দলের সহিত ঈর্য্যাহীন প্রাণে সসম্মান সহযোগিতা দিবার ক্ষমতা অখণ্ডের এক বিশিষ্ট লক্ষণ।

অখণ্ডমণ্ডলীর সাফল্য

"তোমাদের মধ্যে অনেকে আছ, যাঁহারা আমার স্বপ্নময় 'ভবিষ্যৎ ভারতের' স্রষ্টৃবর্গের অন্যতম হইলেও হইতে পার। যে নবজাতি সৃষ্টির জন্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গৌরব অপেক্ষা করিতেছে, তাহারই নির্ম্মাতাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের ঐ শীর্ণকঙ্কাল দেহের মধ্যে, তোমাদের ঐ জীর্ণচীরাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে লুকাইয়া আছে। বাহিরের প্রাচীরে আঘাত করিয়া ভিতরের সেই পুরুষসিংহগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের নিকটে ভবিষ্যৎ ভারতের যে দাবি রহিয়াছে, তাহা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে।—যদি ইহা পার, তবেই জানিব যে, মাঝে মাঝে তোমাদের যে সম্মেলন হইতেছে, তাহা সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে।

অখণ্ড-মণ্ডলীর প্রাণ

"তোমাদিগকে জানিতে হইবে যে, ব্যষ্টি অখণ্ডের লক্ষ্য বা

আদর্শ যাহাই হউক, অখণ্ড-সম্মিলনীর প্রাণ অতীত ভারত নহে, বর্ত্তমান ভারতও নহে, ইহার প্রাণ হইল ভবিষ্যৎ ভারত। তোমাদের লক্ষ্য অতীতের পুনরায়োজন নহে কিম্বা মাত্র বর্ত্তমানের সহিত হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা নহে, পরন্তু ভবিষ্যতের সৃষ্টি। তোমাদের প্রত্যেকটী বাক্য ও তোমাদের প্রত্যেকটী চিন্তা, তোমাদের প্রত্যেকটী কর্ম্মকে যেন ভবিষ্যৎ যুগের উদ্বোধনের পথে পরিচালিত করে, ইহাই হইবে অখণ্ড-সম্মিলনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র আরাধ্য। অতীতকে তোমরা অস্বীকার করিবে না, বর্ত্তমানকে তোমরা উপেক্ষা করিবে না, কিন্তু ভবিষ্যৎই হইবে তোমাদের সকলের চেয়ে আপন, প্রাণাধিক প্রিয়। অতীতকে তোমরা তোমাদের সুবিচার দিও, কিন্তু ভবিষ্যৎকে দিতে হইবে তোমাদের সর্ব্বস্ব। অতীতকে তোমরা তোমাদের মস্তিষ্ক দিও, বর্ত্তমানকে তোমরা তোমাদের সক্ষম বাহুযুগল দান করিও কিন্তু ভবিষ্যৎকে দিতে হইবে তোমাদের অনন্ত জীবন।"

পরিচয়ের সূত্র

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি হাওড়া জেলা-নিবাসী জনৈক ত্যাগাকাঙ্ক্ষ উন্নতহৃদয় যুবকের এক সুদীর্ঘ পত্রের উত্তরে দীর্ঘতর এক পত্র লিখিলেন,—

"তোমার আমার পরিচয়ের সূত্র হইতেছে সম-মনোভাব, দেখাশুনায় কেহ কাহারও পরিচিত হয় না। জীবনের প্রতি পাদ-বিক্ষেপে কত লোকের সঙ্গে আমরা মিশি, কত জনের

সঙ্গে একই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ আমরা করি, কিন্তু ভাবের সাম্যের অভাবে কেহ কাহারও হৃদয়ের স্পর্শ পাই না। প্রেরণার খোঁজ রাখি না, সুতরাং পরিচয়ও পাই না। কিন্তু যখন কাহারও প্রকৃত পরিচয় পাইতে আরম্ভ করি, তখন দেখি, আমার হৃদয়ের সিংহাসন তিনি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন এবং আমরা যখন কাহারও নিকট পরিচিত হইতে আরম্ভ করি, তখন আমাদের জন্যও তাঁহাদের হৃদয়ের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই জন্যই তখন পরিচিত-জন হয় আমাদের একান্তই আপনার জন, একান্তই প্রাণের-জন।

পরিচয় ও প্রেম জন্মজন্মান্তরীণ

"এই পরিচয় আমরা বিশ্ব-মানবের সাথে জন্মে জন্মে করিয়া আসিতেছি। জন্মে জন্মেই আমরা হৃদয় দান করিয়াছি এবং হৃদয় পাইয়াছি। জন্মে জন্মেই আমরা প্রেমিকের পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং নিজেরা প্রেমিক হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যাহা এবং আমার প্রতি তুমি যাহা, তাহা উহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

বন্ধু এবং হৃদয়-দুয়ার

"তোমার বন্ধুরা পত্র দেখিয়াছেন বলিয়া রাগ করি নাই বরং সুখীই হইয়াছি! কেননা, যে আকাঙ্ক্ষার তীব্র অনল তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সত্যের সন্ধানে ধাবিত করিয়াছে, বন্ধুরা তাহারই

ইন্ধন হইবেন এবং তোমার চরম চরিতার্থতা লাভের সহায়তা করিবেন। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধান। সুপরীক্ষিত বন্ধু ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রাণের গভীর বেদনা জানাইও না, যার তার কাছে গিয়া মর্ম্মের বাণী শুনাইতে বসিও না। নিষ্কাম প্রেম দিয়া যিনি তোমাকে বন্ধন করেন, তিনিই তোমার বন্ধু। যাঁহার প্রেমের বন্ধন তোমাকে মিথ্যার পথে পদার্পণ করিতে অক্ষম করে, যাঁহার স্নেহ-ভালবাসা তোমাকে পশুত্বের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পূর্ণ মানবতার অভ্রংলিহ বিজয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া দেয়, তিনিই তোমার বন্ধু। যাঁহার স্মৃতিতে পবিত্রতায় প্রাণ ভরিয়া যায়, যাঁহার দর্শনে অনাবিল আনন্দে জীবনের সকল দুষ্কৃতির অসহনীয় শোক-তাপ বিস্মরণ হইয়া যায়, যাঁহার মধুময়ী কথা কাণের ভিতর দিয়া আত্মায় গিয়া প্রবেশ করে এবং নিত্যকালের সত্যবস্তুর সাধনার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়কে উন্মাদিত করিয়া তোলে, তিনিই বন্ধু। এমন বন্ধু সহজে মিলে না, সুতরাং সকলের কাছে হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়াও দেওয়া চলে না। যাঁহারা তোমারই ন্যায় সত্যবস্তুর সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, মৃত্যুর পরপারেও যাঁহারা লক্ষ্যলাভের জন্য অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তাঁহাদেরই কাছে প্রাণের কপাট খুলিয়া দিও। কারণ, ইহার ফলে তুমিও যেমন লাভবান্ হইবে, তাঁহারাও তেমন লাভবান্ হইবেন।

সংসার কি সাধনার বিঘ্ন

"সংসারে জড়াইয়া পড়িলে দেশ-সাধনা বা ভগবৎ-সাধনা

কিছুই হইবে না, একথা ঠিক্ ঠিক্ সত্য নহে, আংশিক সত্য মাত্র। সংসারের পরিবন্ধনে থাকিয়াও দেশের সেবা করিতে পারেন, ভগবানকে লাভ করিতে পারেন, এমন বীরেন্দ্রকেশরী এ জগতে যথেষ্ট আছেন। কিন্তু সকলেই গার্হস্থ্যের মধ্য দিয়া এই বীরত্বের প্রকাশ ঘটাইতে পারেন না, অতি অল্প সংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্রহ্ম-পুরুষকার-জীবী ব্যক্তিই পারেন। পরার্থকারী এবং ভগবৎ-পদারবিন্দের মকরন্দলুব্ধ ব্যক্তিরা দলে দলে যে সংসারত্যাগী হইয়াছেন, তাহার একটী উল্লেখযোগ্য কারণ ইহা। আবার সংসারী হইলেও ইহারা অনেকেই দেশ ও ভগবানের সেবা করিতে পারিতেন, ইহাও যথার্থ।

"বলিবে, তবে ইঁহারা দার-ত্যাগ করিলেন কেন? সংসারে থাকিয়াই যদি দেশ ও ভগবানের অর্চ্চনা সম্ভব ছিল, তবে নিঃসঙ্গ জীবনের অবশ্যম্ভাবী অসুবিধা-নিচয় মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? বিবাহিত জীবন যদি ইঁহাদের জীবনৈকলক্ষ্যের অনুসরণে প্রবল বাধা হইবার যোগ্যতাই না রাখিল, তবে সন্ন্যাস-জীবনের সুকঠোর কৃচ্ছ্রগুলিকে কি ইঁহারা স্বীকার করিলেন খামাখা?

বীর গৃহী ও বীর সন্ন্যাসীর সমর-নীতি

ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর বীরপুরুষ আছেন। এক শ্রেণীর বীর শত্রুজয় করিতে বাহির হইয়া একটার সঙ্গে দু'দশটা অতিরিক্ত লড়াই করিতেও অসম্মত নহেন। অপর

শ্রেণীর বীর নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অন্যত্র লড়াই দিতে চাহেন না; যে লড়াইটাকে এড়াইয়া যাওয়া চলে, সেই লড়াইটাকে সাধিয়া আনিতে চাহেন না। গৃহী মহাপুরুষেরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাধক, সন্ন্যাসী মহাপুরুষেরা দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সাধক, উভয়েই বীর কিন্তু হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি বা সমর-নীতি দুই জনের দুই প্রকার। একজন মনে করেন, জীবন-সংগ্রামের গুরুত্বের তুলনায় গার্হস্থ্য-সংগ্রাম এমন অধিক কি যে, তাহাকে এড়াইয়া চলিতে হইবে? অপর জন মনে করেন, জীবন-সংগ্রামের সহিত আবার গার্হস্থ্য-সংগ্রামটাকে জড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আটি চাপাইবার দারুণ আবশ্যকতা কি পড়িয়াছে যে, বিবাহ করিতেই হইবে? একজন মনে মনে হিসাব করেন যে, জীবন-সংগ্রাম জয় করিবার যার ক্ষমতা আছে, দাম্পত্য-সংগ্রাম সে কটাক্ষে জয় করিতে পারে। অপর জন মনে মনে হিসাব করেন যে, জীবন-সংগ্রাম জয় করিতে যখন জীবনব্যাপীই লড়াই চালাইতে হয়, তখন একটী সৈনিককেও অন্যত্র ব্যস্ত থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, সকল শক্তি এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নেপোলিয়ান বা জার্ম্মাণীর কাইজারের মত একজন ভাবেন যে, বিশ্বজয়ী ইংরেজের সঙ্গেই যখন লড়াই দিবার যোগাড় রাখি, তখন তুচ্ছ রুশিয়াকে আর ভয় কি? আর একজন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসনের মত ভাবেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যস্ততাই যখন আমার সকল শক্তি সামর্থ্যের দাবী করিতেছে, তখন গায়ে পড়িয়া য়ুরোপের যুদ্ধের ভাগ লইতে যাই কেন?

পথ ও তাহা খুঁজিবার শক্তি

"এইরূপ এক এক জন এক এক রূপ হিসাব মত চলিতেছেন। তোমাকেও একটা হিসাব করিয়াই ঠিক্ করিতে হইবে, কোন বুঝ তোমার বুঝা উচিত। এই বিচারের ভার আমার উপর দিলে চলিবে না। ইহা খুব শক্ত বিচার, কিন্তু তোমাকেই এই মীমাংসা করিতে হইবে। তুমি দীনহীন নহ, তোমার পথ তোমার নিজেরই শক্তিতে খুঁজিয়া লইতে হইবে এবং জানিও, সেই সামর্থ্য দিয়াই ভগবান্ তোমাকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন। কোন্ পথে কার পূর্ণতা, ইহা জানিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া একজনকেও তিনি পাঠান নাই। প্রত্যেকেই অনন্ত শক্তি লইয়া আসিয়াছে এবং সেই শক্তি তাঁহারই শক্তি, সুতরাং অপরাজেয়। তবে এ অনন্ত শক্তি ক্ষুদ্র আধারে সবটা ফুটিতে পায় না, মলিন মনের মধ্য দিয়া বিকাশ পায় না। তাই, সাধনা করিতে হয়।

সাধনা ও উচ্ছ্বাস

"সাধনা করিতে করিতে চিত্ত-শুদ্ধি জন্মিবে, তখনই তুমি তোমার নির্ভুলতম পন্থাকে প্রাপ্ত হইবে। সাধন করিতে করিতেই তুমি তোমার প্রাণের টানের প্রকৃত স্বরূপটী দেখিতে পাইবে এবং তখনই তোমার নির্ভয়ে পথ চলার দিন আসিবে। সন্ন্যাসের জন্য তীব্র উন্মাদনার পশ্চাতে অনেক সময়ে স্থায়ী সাংসারিকতার

বীজ উপ্ত থাকে এবং উন্মাদনা প্রশমিত হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে গার্হস্থ্য-জীবনের প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়। আবার, বিবাহ-বাতিকের পশ্চাতেও অনেক সময়ে সর্ব্বত্যাগের স্থায়ী প্রেরণা প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং একটু জোর বাতাস বহিয়া গেলেই মেঘান্তরিত শশধরের মতন বিশ্বতোমুখিনী জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণ করিতে থাকে। এই জন্যই তোমাকে বুঝিতে হইবে, তোমার সকল উচ্ছ্বাসের পশ্চাতে প্রকৃত ও স্থায়ী বস্তুটী কি এবং তাহা বুঝিবার জন্যই সাধনের দরকার।

ভগবৎ-সাধনা ও দেশসেবা

"সাধনা বলিতে এখানে আমি ভগবৎ-সাধনা বুঝিতেছি। ভগবৎ সাধনাই তোমার সমাজ-সাধনা ও দেশ-সাধনার উৎকৃষ্টতম ভিত্তি, কেননা, ভগবৎ-সাধকের স্থির নির্ব্বিকার মনে পূর্ব্বসংস্কারের অপচিহ্ন থাকে না, তাঁহার দেশ-সেবার পিছন হইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কদর্য্য সুখেচ্ছা উঁকিঝুঁকি মারিতে পারে না। ভগবৎ-সাধনার শিকড় হইতে দেশ-সেবার যে বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে স্বর্গের পারিজাত ফোটে এবং সেই পারিজাতের বক্ষ হইতে স্তন্যধারার মত অমৃত ঝরিয়া পড়িতে থাকে। তুমি যে যক্ষ্মা রোগীকে নির্ব্বিবাদে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সেবা করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছ, তুমি যে অন্ধ, আতুর, অনাথ ও কাঙ্গালের দুঃখ-বিদূরণের জন্য নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে চাহিতেছ, ইহার মূল কথা ইহারা নারায়ণ, ইহারা

ভগবানেরই বিভূতি? নারায়ণ-বোধটুকু না থাকিলে তোমার দরিদ্র-সেবার মূল্য কয়টী কাণাকড়ি? পথ হইতে ভিক্ষুকের দল ডাকিয়া আনিয়া কতকগুলি চাউল ডাইল বিলাইয়া দিলেই কি তোমার দরিদ্র-সেবা হইয়া যাইবে? প্রত্যেকটী তণ্ডুল-কণার সাথে তোমাকে কি অফুরন্ত হৃদয়িকতা, অফুরন্ত প্রেম, অফুরন্ত অনুরাগও পরিবেশন করিতে হইবে না? তুমি যে তোমার দেশকে সেবা করিতে চাহ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের প্রতি তোমার ভগবদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ কি দেশসেবার নামে আত্মসেবাই হইবে না? লক্ষ লক্ষ জনে 'দেশের সেবা, দেশের সেবা' বলিয়া হাঁকিতেছে কিন্তু উহার সহস্র-করা নয়শত, নিরানব্বইটী স্থলেই ত' উদরদেবের পূজা বা কীর্ত্তিদেবীর অর্চ্চনাই হইতেছে,—দেশের বা দশের পূজা হইতেছে না! দেশকে পূজা করিতে হইলে আগে দেশকে তোমার ভগবান্ বলিয়া জানা চাই, দশের সেবা করিতে হইলে আগে দশের মধ্যে ভগবানের মূর্ত্ত বিকাশ দেখিতে পাওয়া চাই।

বড় কি—দেশ-সাধনা, না ভগবৎ-সাধনা

"সুতরাং এইরূপ প্রশ্নই নিরর্থক যে, ভগবৎ-সাধনা বড়, না, দেশ-সাধনা বড়। সাধনা মাত্রেই বড়,—সাধনার মধ্যে বড় ছোট নাই। কিন্তু ভগবানকে ভুলিলে দেশ বা দরিদ্রের পূজার প্রয়াস ব্যর্থতাই আহরণ করিবে। ভগবৎ-সাধনা ভূমি, দেশ বা

সমাজ-সাধনা তাহার বৃক্ষ-কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র ও পল্লব, বিশ্ব-জগতের কল্যাণ তাহার ফুল ও ফল। বল দেখি, ভূমি বড়, না গাছ বড়? যে ভূমির রস না পাইলে গাছ বাঁচে না, সে বড়, না যে-গাছ না গজাইলে ভূমির বন্ধ্যাত্ব ঘোচে না, সে বড়? বল দেখি, ফুল বড়, না ফল বড়? যে ফুল না থাকিলে ফল হয় না, সে বড়, না যে ফল না হইলে ফুলের বৃথাই প্রস্ফুটন, সে বড়? বল দেখি, জননী বড়, না সন্তান বড়? যে জননী না থাকিলে সন্তান জন্মে না, সে বড়, না যে সন্তান না জন্মিলে জননীত্ব হয় না, সে বড়?

দুর্ব্বলতাই পাপ

"তোমার দেহ কৃশ বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছ। আক্ষেপের কি আছে? কৃশতায় কি যায় আসে? দুর্ব্বল না হইলেই হইল। দুর্ব্বলতাই লজ্জার, কৃশতার লজ্জা কি? দুর্ব্বলতাই পাপ, দুর্ব্বলতাই অপরাধ, দুর্ব্বলতাই মৃত্যু। দুর্ব্বলতা দূর কর, প্রাণপণ যত্নে নিজেকে গড়িয়া তোল; কৃশতা গেল, কি না গেল, তাহাতে কি আসে যায়? এই কৃশতা যদি দুর্ব্বলতারই ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সবল হইবার চেষ্টা দ্বারাই কৃশতা অনেকটা নিবারিত হইবে।"

সংসার না সন্ন্যাস

শ্রীযুক্ত ন—এই পত্রের নকল রাখিয়াছিলেন। তিনি

বলিলেন,—পত্রটাতে গার্হস্থ্যের প্রতি পক্ষপাত কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাল ক'রে পড়ে দেখ।

শ্রীযুক্ত ন—পত্রখানা পুনরায় পড়িলেন এবং বলিলেন,—না, এখন দেখ্তে পাচ্ছি সন্ন্যাসের প্রতি পক্ষপাত করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—পক্ষপাত করি নি, উভয় পক্ষের কথাই নিরপেক্ষ-ভাবে বলেছি। সংসারী বা সন্ন্যাসের প্রচারক আমি নই, আমি মনুষ্যত্বের প্রচারক, স্বাধীনতার প্রচারক। কে সংসারী কর্‌বে, কে সন্ন্যাসী হবে, তা' নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কর্ত্তব্যের বাইরে, আমার কর্ত্তব্য সংসার বা সন্ন্যাসের বাদানুবাদের বাইরের জগতে।

ময়মনসিংহ
৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

স্ত্রী-জাতিতে দৃষ্টি-সংযম ও কল্পনা-কুশল ব্রহ্মচারী

অদ্য প্রাতঃকালে জনৈক পবিত্রকামী যুবকের সহিত আলাপ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীজাতির দেহের প্রতি দৃষ্টি দিতে গেলে ঐ দেহ সম্বন্ধে মননও আস্‌বেই। দেহের প্রতি দৃষ্টি বেশী হ'লে বা দৃষ্টিটা সকাম সতৃষ্ণ হ'লে, এমন কি গুহ্য অঙ্গগুলিও মননকালে স্মরণে আস্‌বে। এই জন্যই স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টি-সংযম করা আবশ্যক। আর, যদি কখনও চেষ্টাকৃত সংযম সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত-ভাবে দৃষ্টি গিয়ে স্ত্রীদেহে পড়ে, তবে

তাতে স্ত্রীদেহ সম্বন্ধে খুব তীব্র মনন আস্‌বে না সত্য, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যত intelligent (বুদ্ধিমান্) ছেলেগুলিকে নিয়ে। এদের imaginative faculty এত প্রবল থাকে যে, যা' মুহূর্ত্ত মাত্র দেখেছে, তারই বিষয়ে এমন নিখুঁত মনন আরম্ভ ক'রে দেবে, যেন এক যুগ ধ'রে ঐ নির্দ্দিষ্ট দেহটাকে দেখেছে। আবার, স্ত্রীদেহের যে অঙ্গগুলি কখনো দেখে নি, সেগুলি সম্বন্ধে অনুমানেই এমন নির্ভুল মনন ক'রে যাবে, যেন ঐ অঙ্গগুলি এই মাত্র দর্শন ক'রে এসেছে। এদের পক্ষে দৃষ্টি-সংযমই মনের পবিত্রতা-রক্ষার শেষ উপায় নয়, এদের জন্য এমন উপায় চাই, যার মধ্যে intellectual culture (বুদ্ধির উৎকর্ষ-বিধায়ক প্রণালী) আছে, যার মধ্যে imagination-এর full play (কল্পনাশক্তির পূর্ণ বিকাশ) এবং unrestricted liberty (নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা) আছে। কারণ, ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বশীভূত কত্তে হবে, মনের স্বাভাবিক শক্তিগুলির উন্মেষের দুয়ার খোলা রেখে, একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে নয়।

স্ত্রী-যোনি স্মরণে কর্ত্তব্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার কল্পনা-প্রবণতার ফলে নিয়ত স্ত্রী-যোনি স্মরণে আসছে, এটাকেও আমি বিপদ ব'লে মনে করি না। কারণ, যে কল্পনা-কুশলতার দরুণ এইটী হচ্ছে, সেই কল্পনা-কুশলতার আশ্রয় নিলেই তোমার মুস্কিল-আসান হবে। কল্পনার ক্ষমতা যার কম, তার যদি স্ত্রী-যোনি

স্মরণে আসে, তবে তার পক্ষে উপদেশ হচ্ছে, দৃশ্যান্তরে মনঃসন্নিবেশ করা, চিন্তাশক্তিকে অন্য বিষয়ে নিয়োগ করা। কিন্তু কল্পনা-প্রবণ মন বিষয়ান্তরে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রেও আবার নিজের কল্পনারই শক্তিতে তার মধ্যে স্ত্রী-যোনির অস্তিত্ব সৃষ্টি ক'রে ফেল্‌বে। সাধারণ ছেলে একটা উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবি দেখে যে কদর্য্য চিন্তা দ্বারা আবিষ্ট হ'ল, তা' থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে একটা ফুল দেখে। কিন্তু কল্পনা-প্রবণ ছেলে স্ত্রী যোনি থেকে মনকে ফুলের মধ্যে টেনে এনেও আবার কল্পনারই শক্তিতে নূতন ক'রে মনন আরম্ভ কর্‌ল, ফুল ত' শুধু ফুল নয়, এ যে বৃক্ষলতার যোনি ও লিঙ্গ, এরাও যে গর্ভাধান ও গর্ভধারণের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে অপেক্ষা কচ্ছে। তাই, কল্পনা-প্রবণের পক্ষে কল্পনার পথে আর একটু অগ্রসর হ'য়ে কল্পনার শক্তিতে আর একটু খাটিয়ে নিয়ে যুদ্ধ-জয় কত্তে হবে। স্ত্রী-যোনির মানসিক ঐ দৃশ্যটা তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা তার পক্ষে বৃথা। ঐ দৃশ্যটাকে মেনে নিতে হবে এবং ভাব্‌তে হবে,—"ঐ যে স্ত্রী-যোনি, তার ভিতরে ভগবান্ আছেন, আমার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আছেন, আমার জগজ্জননী কালী আছেন, আমার যীশু-জননী মাতা মেরী আছেন। ঐ যে স্ত্রী-যোনি, ব্রহ্ম ওখানে আছেন, যিনি সর্ব্বভূতাত্ম, সর্ব্বান্তর্যামী তিনি ওখানে আছেন। তিনি কি অম্‌নি আছেন? শক্তিহীন হ'য়ে আছেন? নিজ স্বভাব পরিহার ক'রে আছেন? স্বকীয় বীর্য্য বর্জ্জন ক'রে আছেন? না, তা' নয়,—তিনি আছেন তাঁর পূর্ণ পবিত্রতায়, পূর্ণপ্রজ্ঞায়, তিনি

আছেন তাঁর পূর্ণ শুদ্ধতায়, পূর্ণ বিভায়। স্ত্রী-যোনি আমার কাছে কদর্য্য জিনিষ, কিন্তু তাঁর কাছে ত' নয়! ভেদাভেদ-জ্ঞান আমার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, কিন্তু তাঁর ত' এ জ্ঞান নাই! তবে কেন তিনি নিজের অনাবিল প্রেমের পূর্ণ মহিমা নিয়ে এই কদর্য্য, এই অশ্লীল, এই ন্যক্কারজনক, এই ঘৃণ্য স্ত্রী-যোনিতেও বাস কত্তে পারবেন না? আমি নিশ্চিত জানি, তিনি এখানে আছেন, এই কদর্য্য দৃশ্যের মধ্য দিয়েও আমি তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর পবিত্রতাদীপ্ত প্রেমোজ্জ্বল শ্রীমুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁর স্নেহ-মমতা-মাখা চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতি স্পষ্ট অনুভব কচ্ছি।"—এইরকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে আপনি তার মন সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হ'য়ে যাবে। একদিনে না যায়, অভ্যাসের ফলে কালক্রমে যাবে।

কামরূপের যোনিপীঠ পূজার উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কামরূপে যে যোনি-পীঠের পূজা হয়, জান্‌বে, তার উৎপত্তি এইভাবেই হয়েছিল। যাঁরা এই যোনি-পূজা প্রবর্ত্তনের প্রেরণা পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন highly imaginative nature-এর (অত্যধিক কল্পনা-কুশল প্রকৃতির) সাধক। কল্পনাকে তাঁরা কল্পনার বলেই জয় করেছেন। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা, শুধু প্রকৃত যোদ্ধা নয়, আশ্চর্য্য যোদ্ধা। তাই, তাঁরা শত্রুকে দিয়েই শত্রুর ঘাড় ভেঙ্গে ছিলেন। কল্পনাকুশলতা ছিল তাঁদের সংযম-সাধনায় সিদ্ধি লাভের

বৈরী, তাঁরা সেই কল্পনা-কুশলতার সহায়তা নিয়েই তাকে কুপোকাৎ করেছেন।—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

লিঙ্গপূজার উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—লিঙ্গপূজার কারণও ঐ একই প্রকার। পুরুষের পক্ষে মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা যতটা কঠিন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও ততটাই কঠিন। পুরুষদের পক্ষে এই মানসিক সংগ্রাম যত বিচিত্র, স্ত্রীলোকের পক্ষেও ততটাই বিচিত্র। পুরুষের ইন্দ্রিয় জয়ের যেমন সহস্র সহস্র পন্থা, স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়-জয়েরও তেমনি সহস্র সহস্র পন্থা। পুরুষদের পক্ষে যেমন অনেক সময় স্ত্রী-অঙ্গ স্মরণ স্বাভাবিক, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তেমন অনেক সময় পুমঙ্গ স্মরণ স্বাভাবিক। স্ত্রী-অঙ্গ স্মরণে পুরুষদের মনে যেমন অধিকাংশ সময় অপবিত্রতা আসা স্বাভাবিক, পুমঙ্গ স্মরণে স্ত্রীলোকদের মনেও তেমন অধিকাংশ সময় অপবিত্রতা আসা স্বাভাবিক। তাই, মনস্তত্ত্বজ্ঞ গুরু (তিনি স্ত্রী কি পুরুষ, কে জানে) একদিন কল্পনা-কুশল স্ত্রী-শিষ্যাকে কল্পনার বলে কল্পনার বিনাশ-সাধনের কৌশল শিখিয়েছিলেন। "নিয়ত পুমঙ্গ স্মরণে আসছে, আসুক না মা, ভয় কি তাতে, তুই ভাব্‌তে থাক্, ঐ পুমঙ্গে সদাশিব বিরাজ কচ্ছেন, পরমবেদ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদির আরাধ্য, জগতের সার সত্য, নিত্য ধন, পরমানন্দ প্রেম-পুরুষ ঐখানে রয়েছেন। তোর মনে কুভাব আসছে? সে কি মা, ঐ দেখ্ তাকিয়ে এই লিঙ্গ কি একটা

মানুষের লিঙ্গ, এর যে ব্যাপ্তি কোটি জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম ক'রে, এ যে অনন্ত, অসীম, অখণ্ড! ঐ দেখ্ তোর প্রেমময় ভগবান্ ঐ লিঙ্গ-মধ্যে, পূর্ণপ্রেমে, পূর্ণ পবিত্রতায়, দিব্য বিভূতিজাল গায়ে মেখে ব'সে আছেন।"—এই করলেন তিনি তাঁর কল্পনাকুশলা উপযুক্তা শিষ্যাকে উপদেশ।

যোনিপূজা ও লিঙ্গপূজা ব্যপদেশে ব্যভিচার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই ব্যাপারটাই শেষে গিয়ে ভীষণ ব্যভিচারে দাঁড়াল। মনের অপবিত্রতাকে দমন করবার জন্যে যে লিঙ্গ বা যোনিকে মানসিক উপচারে পূজার ছিল আদিম প্রয়োজন, তাকে মানুষের বিকৃত বুদ্ধি টেনে নিয়ে এল একেবারে বাস্তবের জগতে। "স্ত্রী-অঙ্গ স্মরণে এলে তার মধ্যে আদ্যাশক্তি জননীর উপস্থিতি অনুভব কর্ব্বার চেষ্টা কর",—এই ছিল গোড়ার উপদেশ, কিন্তু শিষ্যের মনের অপকর্ষ মানসিক পূজার ব্যাপারকে ক'রে নিল দৈহিক পূজাতে পরিণত, সে রক্তমাংসের নারী এনে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে কর্‌ল তার উলঙ্গ মূর্ত্তির অর্চ্চনা। "পুমঙ্গ স্মরণে এলে তার মধ্যে পরমানন্দ জগৎপিতার উপস্থিতি উপলব্ধি কর্ব্বার চেষ্টা কর",—এই ছিল গোড়ার উপদেশ, কিন্তু তারই অর্থবিকৃতি ঘট্‌তে ঘট্‌তে এমন দাঁড়াল যে, তপস্বিনী নারী সদ্ভাবকুসুম দিয়ে মনঃসৃষ্ট কাল্পনিক পুমঙ্গের পূজা না ক'রে কর্‌তে বস্‌লেন জড় মাংস-পিণ্ডময় এক

নরদেহের কদর্য্য অঙ্গের পূজা। এইভাবে সাধক-সমাজে ব্যভিচার ঢুক্‌ল, সাধন ক'রে অমর না হ'য়ে লক্ষ লক্ষ সাধক-সাধিকা শুধু কামের গরলই পান কর্ল্লেন আর বিষের জ্বালায় আর্ত্তনাদ কত্তে কত্তে মর্ল্লেন।

চেষ্টাকৃত সংযম ও স্বাভাবিক সংযম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা চলিয়া যাইবেন। স্থানীয় স্কুল-সমূহের ও কলেজের কয়েকটী অনুরক্ত ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। একজন ছাত্র সংযম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চেষ্টাকৃত সংযমের চাইতে স্বাভাবিক সংযম শতগুণ শ্রেষ্ঠ কিন্তু চেষ্টা কত্তে কত্তেই সংযম স্বভাবে পরিণতি হয়, বিনা চেষ্টাতে হয় না। চেষ্টাকৃত সংযমে অসাফল্যের সম্ভাবনা কিছু না কিছু থাকেই কারণ, চেষ্টা করে মানুষ জ্ঞাতসারে। অজ্ঞাতসারে যখন চেষ্টার তোড়জোড় শিথিল হয়, তখনই পদস্খলন ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিক সংযমে সে ভয় নেই, কারণ সংযম যখন তোমার স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তুমি হুঁসিয়ার থাক আর না থাক, সংযম তোমার পরিভ্রষ্ট হবে না কোনো মতেই। তাই, স্বাভাবিক সংযমকে লাভ কত্তে হ'লে অনেক আদানুন খরচ কত্তে হয়, অনেক ঘাটের জল খেতে হয়, অনেক সমুদ্র আলোড়ন কত্তে হয়। মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কেউ সংযমকে স্বভাবরূপে পায় না। একদা সংযম যার চেষ্টাকৃত ছিল, ভবিষ্যতে সংযম তার স্বভাব-সম্পদ

হ'য়ে থাকে; ঈশ্বর-সাধনেরও ইহা নিত্য শুভফল।

কলিকাতা

৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্য প্রচার

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতার অনেক যুবক-ভক্তই শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা সকলে মিলে পণ কর, সংযম ও সদাচারের আন্দোলনকে সমগ্র দেশব্যাপী কর্‌বে, দরিদ্রের কুটীর-প্রাঙ্গণ থেকে ধনীর বিলাস-প্রাসাদ পর্য্যন্ত নিয়ে একে পৌঁছাবে। কাউকে বাদ দিলে চল্‌বে না। কাশ্মীর থেকে ব্রহ্মদেশ আর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, সর্ব্বত্র তোমাদের বীর্য্যের বাণী ছড়াতে হবে। যার কাছে যেমন ভাবে বল্‌লে তার ভিতরে সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে, তার কাছে তেমন ক'রে বল্‌তে হবে। কলকাতা সহরে দলবল বাড়িয়ে হুজুগ কর্‌লে চল্‌বে না, তোমাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের লক্ষ লক্ষ পল্লীগ্রামে। সেবা সুরু করবে জন্মভূমিকে দিয়ে, তারপরে তাকে ব্যাপ্ত করবে নিখিল বিশ্বে। পল্লীতেই ত' কোটি কোটি সুকুমারমতি বালকের দল দিনের পর দিন বড় হচ্ছে,—তাদের কচি মাথা কেউ না খেতে পারে, তাদের তরুণ দেহের শক্তি কেউ না চুরি কত্তে পারে, এর ব্যবস্থা কত্তে হবে।

দেশের সেবা, যশের সেবা ও উদরের সেবা

তৎপরে অন্য বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যখন দেখবি, লোকের চক্ষে হেয় হবে ব'লে, লোক নিন্দার ভাজন হ'তে হবে ব'লে তুই বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ কত্তে যাচ্ছিস্, তখন জান্‌বি, তুই দেশের সেবা কচ্ছিস না, কচ্ছিস্ যশের সেবা। যখন দেখ্‌বি, রসদ বন্ধ হবে ব'লে তুই পরের মতে সায় দিচ্ছিস, তখন জান্‌বি, তুই দেশের সেবা কচ্ছিস্ না, কচ্ছিস্ উদরের সেবা। দেশের সেবা কত্তে হ'লে, প্রথমে চাই পর-নিরপেক্ষ স্বাধীন-বুদ্ধি, তারপরে চাই সেই বুদ্ধির অনুসরণ কর্ব্বার যোগ্য লোক-ভয়ঙ্কর সৎসাহস। এ দু'টি যার নেই, সে কখনো যোগ্যভাবে দেশের সেবা কত্তে পারে না।

কলিকাতা
৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

জপের নাম ও কীর্ত্তনের নাম

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা নাম-কীর্ত্তন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর-স্বরূপে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার যেটী ইষ্টনাম, সেটী বড়ই গোপনের ধন। ইষ্টনাম সযত্নে গোপন রাখ্‌তে হয়, কারো কাছে প্রকাশ কত্তে নেই। অন্য লোকে কৌশলে বা অনুমানে যদি তোমার ইষ্টনাম জেনে ফেলেও থাকে, তবু একে গোপন করা বিধি। কিন্তু এই ইষ্টনামের দিকে যাতে তোমার

বারংবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, বারংবার যাতে তোমার ইষ্টনাম স্মৃতিপথে জাগরিত হয়, উত্তরোত্তর যাতে তোমার ইষ্টনামের প্রতি প্রাণের প্রীতি, রুচি, আসক্তি ও আকর্ষণ বাড়্‌তে থাকে, তারই জন্য কীর্ত্তনার্থে তোমার এমন নাম নির্ব্বাচন করা উচিত, যা' দ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সুসিদ্ধ হয়। কীর্ত্তনের নামকে জপের নামের পরিপোষক রূপে গ্রহণ কত্তে হবে, পরিপন্থী কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নয়।

কীর্ত্তনকালীন মনোভঙ্গী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কীর্ত্তনকালে মনটাকে এমন একটা ভঙ্গীর ভিতরে নিয়ে ফেল্‌বে, যেন সে অবিরাম কীর্ত্তনের মাঝে কেবল ইষ্ট নামের মধুই আহরণ করে। এটী যদি ভুলে যাও, তাহ'লে কিন্তু মৃদঙ্গ-করতালের রোল বৃথা গণ্ডগোল-মাত্রে পর্য্যবসিত হবে।

কলিকাতা
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

স্বাধীন চিন্তা ও সত্য-পরীক্ষা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম-প্রবাসী জনৈক প্রিয় ভক্তের নিকটে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন,—

"তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তাহার প্রধানতম কারণ এই যে, তোমার মধ্যে স্বাধীন চিন্তার

স্ফুরণ দেখিতে পাইতেছি। যাহা নিজ প্রত্যক্ষের সহিত মিলিবে না, তাহাকে না-মানিবার মনোবল সকলের থাকে না, থাকে শুধু স্বাধীন-চিন্তকের। চিন্তাশীল মানুষও অনেক থাকেন সত্য, কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহের মধ্য দিয়া যাহার উন্মেষ নহে, এমন ভাবুকতাকে স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনও প্রশ্রয় দেন না। কিছুদিন হইতেই তোমার মধ্যে এই লক্ষণটীর ক্রম-বিকাশ আমি লক্ষ্য করিতেছি। তখন হইতেই জানিতেছি যে, সত্য বস্তুর সাক্ষাৎ-লাভ তোমার অবশ্যম্ভাবী, কেননা, বলবানই সত্যকে লাভ করিয়া থাকে, বলহীনেরা নহে।

"সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমি সর্ব্ববিষয়েই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। প্রদীপ্ত সূর্য্যালোককে দেখিয়াও যে ব্যক্তি এক কথায় উহাকে সূর্য্যালোক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, পরন্তু সূর্য্যালোকের সকল লক্ষণের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বরূপ-নির্ণয় করে এবং তারপরে তাহাকে মাথা পাতিয়া মানে, তাহার পক্ষে পথ-ভ্রান্তির ও কর্ত্তব্য-বিচ্যুতির সম্ভাবনা অতীব অল্প। এই জন্যই আমি স্বাধীন-চিন্তাকে এত সম্মান করি। আমি মনে করি, যতদিন না আমরা ভারতবাসী স্বাধীন-চিন্তার অমূল্য সম্পদের গৌরব করিতে পারিতেছি, যতদিন না সত্যকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার তীব্র আগ্রহ ও যোগ্যতা আমরা লাভ করিতেছি, ততদিন আর যাহাই আমরা করি না কেন, প্রকৃত উন্নতি ও সুস্থির কল্যাণকে কিছুতেই লাভ করিতে পারিব না। ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান

লোকদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে পারি, দেশের ও দশের সেবার সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াই অপরের কৌশলজালে আবদ্ধ হইতে পারি কিন্তু যে উৎসর্গ জগতেরও কল্যাণ করে, আত্মারও উদ্ধার করে, সেই সুমহান্ আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের স্বার্থত্যাগকে যদি সার্থক করিতে হয়, আমাদের জীবন-দানকে যদি পরিপূর্ণতা দিতে হয়, তবে, তাহার পশ্চাতে স্বাধীন চিন্তার অবিচ্ছেদ্য যোগ রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সঙ্ঘ-সংগঠনের মধ্যে যদি প্রাণশক্তির সম্যক্ চৈতন্য-বিধান করিতে হয়, আমাদের জীবসেবার বুদ্ধিকে যদি অনিদ্র জাগরণ ও অনিন্দ্য বিশুদ্ধি দান করিতে হয়, তবে সকল ব্যষ্টির মধ্যে আগে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে নিজে দেখিয়া বুঝার অভ্যাসকে। গুরুর কথা শিষ্য, পিতার কথা পুত্র, দাদার কথা ভাই আর রাজার কথা প্রজা এতকাল মানিয়া আসিয়াছে,—নির্ব্বিচারে। এখন হইতে মান্যের কথা মানিতে হইবে,—বিচার করিয়া, নিজে বুঝিয়া, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সহিত মিলাইয়া। যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে হইবে—চিরকালের বীরপুরুষগণেরই মত, কিন্তু তুমি যাহাকে এক্ষণে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেছ, তাহাই তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কিনা, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের পরে নির্দ্ধারণ করিয়া। দশজনে যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝাইয়া গেল, তাহাই প্রকৃত ভাল কিনা, বুদ্ধিমানেরা যাহার এত প্রশংসা করিয়া গেল, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয় কিনা, ইহা নিজের বুঝের মাপকাঠিতে একবার মাপিয়া দেখিতে হইবে।

লক্ষ্য-নির্ণয় ও ভগবৎ-সাধন

"সংসার তোমাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—এস আমার বুকে এস। সংসারের বাহির হইতে আবার আর একটি কণ্ঠ আহ্বান করিতেছে,—এস, আমার বুকে এস। কার কথা শুনিবে? সেই আহ্বানের, না, তোমার অন্তরের প্রেরণার? নিজের অন্তরকে অনুসন্ধান কর, নিজের প্রকৃত স্বরূপকে নিজের দৃষ্টিতেই আগে দেখিয়া লও। কেহ তোমাকে বলিতেছে,—তুমি সুরূপ, সুকান্ত তুমি মদনেরও মনোমোহন। আবার কেহ তোমাকে বলিতেছে,—তুমি কুরূপ, কদাকার, অন্ধকারের চাইতেও কুৎসিত। কার কথা বিশ্বাস করিবে? কার কাছে প্রকৃত মীমাংসা পাইবে? কে তোমাকে সংশয়াতীত করিয়া দিবে? যে তাহা করিবে, নিশ্চয়ই উহা একখানা দর্পণ, যাহাতে তুমি নিজের চ'খে নিজের মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবে।

"সেই দর্পণ আর কিছুই নহে, উহা তোমার সাধন। ভগবৎ-সাধনের পদ-তলে আত্মসমর্পণ কর, নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাইবে, নিজের লক্ষ্য, নিজের প্রার্থিত, নিজের প্রকৃতি নিজেই বুঝিতে পারিবে।"

গুরু ও শিষ্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে-লিখিত একখানা পত্রে গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধে লিখিলেন,—

"যে শিষ্য একদিন সখা, আর একদিন সে সন্তানবৎ হইবে, তৃতীয়-দিন সে উদাসীনবৎ, চতুর্থদিন সে বিদ্রোহী, পঞ্চমদিন শান্ত, ষষ্ঠদিন সে ভাবময় ভক্ত,—গুরু-শিষ্যের মধ্যে এইরূপ নানাভাব স্বভাবতঃ আসিবে। গুরুর কর্ত্তব্য ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। কারণ, এই সকল বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া গুরু ও শিষ্য পরস্পরের প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ পরিচয় পায়, যাহার ফলে অজানিত রস আস্বাদন করিয়া অকথিত মধু আকণ্ঠ পান করিয়া উভয়েরই জীবন কল্যাণে পুষ্ট হয়।"

গুরু সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক মহাভাব

শ্রীযুক্ত ন—শেষোক্ত পত্রের অনুলিপি রাখিতেছিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এক অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। যারা ঐহিক জগতের দিক্‌টাকে বাদ দিয়ে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধকে দর্শন করে, তারা এর মধ্যে জগতের সকল সম্পর্কগুলিকে খুঁজে পায়। গুরু শিষ্যের মধ্যে আর শিষ্য গুরুর মধ্যে মা পায়, বাপ পায়, ভাই পায়, বন্ধু পায়, প্রেমিক পায়, প্রেমার্থী পায়। ভগবানকে নিয়ে বৈষ্ণবের যেমন পঞ্চরস, গুরুকে নিয়ে শিষ্যের তেমন পঞ্চরস। কিন্তু শুধু আকর্ষণের সম্পর্কগুলিই কি তাঁদের মধ্যে? বিকর্ষণের কি এখানে স্থান নেই? রামের প্রতি রাবণ, কৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল, কংস ভাবেরও কি স্থান এখানে নেই? খুব আছে। যে গুরু শিষ্যের ভক্তিটুকুই চান, বশ্যতাটুকুই চান, বিদ্রোহটুকু সইতে

পারেন না, তিনি গুরুই নন। যে গুরু ভালবাসাই চান, প্রীতিই চান, বিদ্বেষের জ্বালা সইতে পারেন না, তিনি গুরুই নন। কারণ, গুরু ত' একটা মানুষ নয়, গুরু একটা ভাব। যে ভাবটার অপরিসীম উচ্চতার কাছে স্তব্ধ হ'য়ে শিষ্যের ভালমন্দ, শুভাশুভ সকল ভাব নত হয়, গুরু সেই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক মহান ভাব। মানুষটার কাছে নিজেকে নত করার নাম শিষ্যত্ব স্বীকার নয়, শিষ্যত্ব হচ্ছে সর্ব্বভাবের অবিরোধী, সর্ব্বভাবের সাফল্য-দাতা, সর্ব্বভাবের অনুপূরক মহাভাবের নিকটে মাথা নত করা। গুরুর সঙ্গে নিজের প্রকৃত সম্বন্ধটা যে চিনেছে, বিশ্বের কোনও সম্পর্ক তার অচেনা থাকে না।

গুরুবাদের বনিয়াদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ছিল ভারতের গুরুবাদের মূল বনিয়াদ। শিষ্যের জন্যই যাঁর সর্ব্বস্ব, নিজের জন্য যাঁর কিছুই নয়, সেই গুরুর একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠা শিষ্যের দৃষ্টিতে তাঁকে ব্রহ্মপদাভিষিক্ত করেছিল। জান ত', ভারতবর্ষ অবতার-বাদের দেশ। অন্যান্য দেশের লোকের ভিতরেও মহামানবকে ঈশ্বরাবতার ব'লে পূজা করার প্রবৃত্তি প্রচুর দেখা যায়, একথা সত্য। কিন্তু এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র একজন মহাপুরুষ এত সহজে ভগবানের সঙ্গে অভেদ ব'লে প্রতিষ্ঠা পান নি। মুসলমানের দৃষ্টিতে ত্রিজগতে হজরৎ মহম্মদের তুল্য পুরুষ আর কেউ নেই, তবু তিনি আল্লার সঙ্গে অভেদ নন, তিনি আল্লার রসুল, আল্লা

নন। দেখ, আরবের মাটীতে তাঁকে অবতার ব'লে গ্রহণ করা হ'ল না। হজরৎ আলির শিষ্যেরা একপ্রকারের অবতারবাদ যেন অনুশীলন কত্তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ তার পাত্তাই দিলে না। যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টানগণের চ'খে ঈশ্বরাবতার, কিন্তু পিতৃরূপী ঈশ্বর পুত্ররূপী যীশু এবং পবিত্রাত্মারূপী ভগবান্ এই তিনের মধ্যে ঐক্য কতখানি আর অনৈক্য কতখানি, তার দার্শনিক তর্কাতর্কি খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন ব্যূহে কয়েক শ' বছর ধ'রে চল্ল। কিন্তু ভারতের মাটীতে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যে ব্রহ্মাকে জানে, সে ব্রহ্ম হ'য়ে যায়। ফলে প্রথম প্রথম হ'ল "যত মত, তত অবতার", তারপরে দাঁড়াল, "যত শিষ্য তত অবতার।" প্রথমে হ'ল—একজন সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহামানব সেই সম্প্রদায়ের সকল লোকের কাছে অবতার, সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টারা গুরু, কিন্তু অবতারও নন, উপাস্যও নন। কিন্তু পরে দাঁড়াল,—একই সম্প্রদায়ের মতামত শত সহস্র গুরু প্রচার কচ্ছেন, একই সম্প্রদায়ের সাধন-ধর্ম্মে শত শত গুরু দীক্ষাদান কচ্ছেন এবং দীক্ষিতের নিকটে তিনি এবং পরমেশ্বর এক ও অভেদ ব'লে গৃহীত হচ্ছেন। কোন্‌টা ভাল ছিল বা কোন্‌টা মন্দ হ'ল, সে বিচারে যেয়ে কাজ নেই। কিন্তু ঘটনাটী দাঁড়াল এই। একটী মাত্র ব্যক্তির কাছে সম্যক্ আত্মসমর্পণ ক'রে শিষ্য সেই ব্যক্তিটীর সাধনোৎকর্ষের সবটুকু সহজে আয়ত্ত কর্ল্লেন, এইটুকু হ'ল তার প্রাপ্তি। কিন্তু যেই ব্যক্তিটির ভিতরে সাধুত্বের ভাণ ছাড়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিছুই নেই বা শিষ্যকে একটী মন্ত্র

দেওয়া ছাড়া আর কোনও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা নেই, তার কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়ে শিষ্যের লাভ হ'ল কি এবং কতখানি, প্রথার দাস অন্ধ-সমাজ কি তার কখনো হিসাব করেছে?

গুরুবাদের রূপান্তর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই হিসাব করে নি ব'লেই, আজকের যুগে এই হিসাবটা নিয়েই সব চেয়ে বেশী বুঝা-পড়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, গুরুবাদ বর্জ্জিত ধর্ম্ম-সমাজ কি স্থাপিত হ'তে পারে না? দীক্ষাদাতা দীক্ষা দেবেন, দীক্ষার্থী দীক্ষা নেবেন, এর দ্বারা একজন আর একজনের পূজনীয় এবং অপর জন তাঁর আশীর্ভাজন হলেন। বাস্ এই পর্য্যন্তই। কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুরু, তিনি কি দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাগ্রহীতা উভয়ের গুরু ব'লে মনে, জ্ঞানে ও ব্যবহারে গৃহীত হ'তে পারেন না? চিরপ্রচলিত গুরুবাদ এবং অভ্যুন্নত গুরুবাদ, এই উভয়ের মাঝখানে আমি হচ্ছি transition-(রূপান্তর)-এর সেতু। আমার পরে দেখ্‌বে যে, কোনো ব্যক্তি আর মানুষের গুরু নয়, পরমাত্মাই সবার গুরু, পরমাত্মার সাক্ষাৎ-বিগ্রহরূপ নামই সবার গুরু।

শিক্ষা ও সাহস

বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ন—

কে লইয়া কলেজ-স্কোয়ারে গমন করিলেন। সেখানে দুইজন ভদ্রলোক মিলিয়া ভয়ানক তর্ক করিতেছিলেন। তর্কের বিষয় শিক্ষা। একজন তার্কিক হিন্দুস্থানী, অপরে বাঙ্গালী। বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিতেছিলেন,—'শিক্ষা' 'শিক্ষা' কি বল্‌ছেন, শিক্ষা পেয়েই ত' দেশের লোক কাপুরুষ হয়েছে।

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বলিলেন,—আপনি যা' বল্‌ছেন, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এই যে আপনার বাঙ্গালী জাতি এত বড় হয়েছে, এই যে দেশবন্ধুর মত লোক, জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথের মত লোক সব বেরিয়েছে, তা' কিসের বলে হয়েছে? শিক্ষারই বলে নয় কি?

বাঙ্গালী।—হোক্ গে বাঙ্গালীরা শিক্ষিত, কিন্তু কয়টা ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীরা করেছে? কয়টা অনাথ আশ্রম বাঙ্গালীরা চালায়? আমি ত' দেখি সবই অবাঙ্গালীদের অর্থেই চল্‌ছে। লড়াই করার সময়ে, দাঙ্গা করার সময়ে বাঙ্গালীকে পাবেন? বাঙ্গালী শিক্ষার গুণে কি প্রাণভয়ে পরাঙ্মুখ হয়েছে?

হিন্দুস্থানী।—আপনাকে ধিক্। নিজের জাতির গৌরব-বোধটুকু পর্য্যন্ত আপনার নেই। অবাঙ্গালীরা সব মূর্খের দল, ওদের সাহসের মূল্য কতটুকু?

বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিলেন,—শিক্ষিত বাবুরা লড়াই কর্ব্বার সময়ে বারবার শুধু লাভ ক্ষতি হিসাব কর্ব্বেন, মর্‌তে ভয় পাবেন। অশিক্ষিত লোকের সে সব হিসাব-নিকাষের বালাই নেই।

আলোচনা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয় দেখিয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ন—কে লইয়া অন্যদিকে চলিলেন এবং বলিলেন,—দেখ্ ন,—Bravery unsupported by knowledge is no bravery at all, heroism unaided by intelect is fruitless heroism (জ্ঞানের সঙ্গে যার যোগ নেই, সে সাহস সহসই নয়,—বুদ্ধির সঙ্গে যার যোগ নেই, সে বীরত্ব নিষ্ফল।)

কলিকাতা
১১ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

নামজপকালীন তন্দ্রা

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামজপ কত্তে বস্লেই দুনিয়ার যত ঘুম এসে চোখ চেপে বসে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই তন্দ্রার ভাবটা মনঃস্থৈর্য্যেরই ভূমিকা মাত্র। যে মনটা অবিরাম চঞ্চল হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই মনটা কতকটা স্থির হ'য়ে এসেছে ব'লেই তন্দ্রা আস্ছে। তন্দ্রাটা কোনো খারাপ লক্ষণ নয়। তবে তন্দ্রা এসেছে ব'লেই জপ ছেড়ে দিও না। তন্দ্রায় শরীর যতই ঢুলতে থাক্বে, তুমিও তত বেশী এঁটে নাম চালিয়ে যেতে থাক। অবিরাম নাম জপ্তে জপ্তে আপনি তন্দ্রা ছুটে যাবে এবং স্থির প্রশান্ত ভাব আস্বে। বহু-ভ্রাম্যমাণ চঞ্চল অবস্থা আর নিবিড় গভীর স্থির অবস্থা, মনের এ দুটী অবস্থার মাঝখানে তন্দ্রা একটী পুরু পর্দ্দা মাত্র। এই পর্দ্দাটায় মাথা ঠুকেই যদি পালিয়ে ফিরে চলে আস, তবে আর মনঃস্থৈর্য্য জীবনেও হবে না। আর যদি বারংবার এই তন্দ্রার পর্দ্দায় মাথা ঠুকেও ক্লান্ত না হও এবং এই পর্দ্দা ছিঁড়ে কোনও প্রকারে ওপারে যেতে পার, তবে আর ভাবনার কোনো কারণ নেই। কেননা, তখন মন অক্লেশে স্থির প্রশান্ত ভাবটীকে পাবে।

শারীর-স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জনিত তন্দ্রা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কখনো কখনো তন্দ্রার প্রধান কারণ শারীরিক অবসাদ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। সেই অবস্থাতে তন্দ্রা মনঃস্থৈর্য্যের ভূমিকা নয়। তাই, সেই অবস্থায় তন্দ্রার সঙ্গে লড়াই করার জন্য লঘুমহামুদ্রা, স্বল্পমহামুদ্রা প্রভৃতি অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, শরীর ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতানাশক ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ কর্ত্তব্য এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল তন্দ্রায় ঢুলতে না থেকে, অত্যধিক তন্দ্রা এলে মাথায় শীতল জল ঢেলে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে স্নিগ্ধ হবার সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

তন্দ্রাতিগত অবস্থা ও নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তন্দ্রার পুরু পর্দ্দা ভেদ ক'রে তোমার মন যখন প্রশান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছুল, তখনই হচ্ছে আনন্দে জপ চালাবার প্রকৃষ্ট সুযোগ। এ অবস্থায় যত বেশী পরিমাণ জপ চালাতে পারবে, ততই বেশী আনন্দ, ততই বেশী মঙ্গল। সাধকদের প্রতিদিনই সমান চিত্ত-প্রশান্তি আসে না। সুতরাং যেদিন সত্যি প্রশান্তি এসে গেল, সেদিন চুটিয়ে সাধন কর্ব্বে।

সাধনে সময়-নিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু 'একদিন খুব বেশী, একদিন বাদ, কম লাভ তাতে কিন্তু বেশী অবসাদ।' সুতরাং প্রত্যহই সাধনে বস্‌বে ঘড়ির কাঁটায় একই সময়ে। সময়-নিষ্ঠার কড়াকড়ি এই বিষয়ে খুবই লাভের ব্যাপার হবে। তাতে প্রায় প্রতিদিনই মনের স্থৈর্য্য প্রায় সমান গভীর হবে।

নামজপ কতক্ষণ করণীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নদীকে অবগাহন কত্তে নেমে শরীর সম্পূর্ণ শীতল, স্নিগ্ধ ও জলসিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন কেউ জল থেকে উঠে পড়ে না, ঠিক্ তেমনি মন-প্রাণ নামের সুশীতল মধু-প্রবাহে স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নামজপ ত্যাগ কর্‌বে না।

কলিকাতা

১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৯

অদ্য পত্র লিখিবারই ভিড়। পত্রের পর পত্রই লেখা হইতেছে। শ্রীযুক্ত 'ন—'পত্রসমূহের নকল রাখিতেছেন।

পত্র লিখিবার ফাঁকে ফাঁকে যখন জন-সমাগম হইতেছে, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি মাঝে মাঝে কোনও কথা বলিতেছেন।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও চিন্তার পরাধীনতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষ যে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির

অধীন, এটা শুধু তার বর্ত্তমানেরই দুঃখ। কিন্তু ভারতবর্ষ যে নিজের সভ্যতার উপর প্রাণের টান হারিয়েছে, নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরাগ হারিয়েছে, পশ্চাত্যের ভোগবাদের অনুকরণ করাটা একটা শ্লাঘার বিষয় মনে কচ্ছে, এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের শত-শতাব্দী-ব্যাপী ভবিষ্যতের অসীম দুঃখপুঞ্জের মূল। বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির আমরা পদানত হ'য়ে আছি, এটা হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠব্রণ, কিন্তু বিদেশী সভ্যতার যে আমরা পদানত হ'য়ে পড়ছি, এটা হচ্ছে আমাদের সর্ব্বাঙ্গের ব্যাধি, পায়ের নখের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে কেশাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপক সংক্রামক রোগ। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি বিদেশীর রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা অভিভূত, এর মানে এই যে, একদিন এ অধীনতা থাকবে না। ভারতের চিন্তাশক্তি বিদেশীর চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিভূত, এর মানে এই যে, এ পরাধীনতা স্কন্ধের পরে চেপেছে একেবারে মৌরসী বন্দোবস্ত নিয়ে, বংশানুক্রমে সে তার অপপ্রভাব বিস্তার ক'রে বেড়াবে।

ভারতের চিন্তার পরাধীনতার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের এই চিন্তার পরাধীনতা খামাখাই এসেছে, তা' নয়। এরও একটা সঙ্গত কারণ রয়েছে। অকারণে গাছের পাতাটাও নড়ে না। এক সময়ে অমারা আমাদের অতীত গৌরবের অনেক কথা ভুলে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই সময়টাতেই আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার চক্‌চকে ঝকঝকে মূর্ত্তি

এসে আমাদের সাম্‌নে দাঁড়াল। অতএব তাকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে নেওয়ার আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে জন্মেছিল। আমরা যদি সুদূর অতীত কাল থেকেই আমাদের ইতিহাসের গৌরবগুলিকে গ্রন্থনিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তাম,—আজকাল যেমন ক'রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বাঁড়ুয্যে, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি মনীষী-ব্যক্তিগণকে সাত সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত ঘুলিয়ে দেখ্‌তে হচ্ছে, তেমন কর্ব্বার প্রয়োজন যদি না থাক্‌ত, তাহ'লে আমাদের উপরে পাশ্চাত্যের এতবড় একটা কৃষ্টির দিগ্বিজয় কিছুতেই হ'তে পাত্ত না। আমাদের যে শাস্ত্র গ্রন্থগুলি মোগল-পাঠান যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, নিজেরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েও যদি সেগুলিকে বাঁচাতে আমরা চাইতাম, সেইগুলিকে রক্ষা আমরা কত্তাম তাহ'লে পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে, ভারতীয় জীবনযাপনের সহজ সরল ধারাকে এমন ক'রে পঙ্গু ও পঙ্কিল কত্তে পাত্ত না। মোগল এবং পাঠান যুগের অবসানে যখন এদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রলয়-নৃত্য সুরু করেছে, সেই সময় যদি মহারাষ্ট্রের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশেও দু-একজন ক'রে "সমর্থ রামদাস স্বামীর" আবির্ভাব হত, তাহ'লেও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুদ্র-তরঙ্গ ভারতের তটভূমির খুব বেশী স্থান লবণাম্বুসিক্ত কত্তে পাত্ত না। আর সর্ব্বোপরি, উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক যখন এদেশে শিক্ষাপ্রচারের বিষয়ে চিন্তা চেষ্টা আরম্ভ করেন, তখন যদি চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতবর্গ সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়েও ইংরেজী শিক্ষার বিরোধীতা কত্তেন,

তাহ'লেই পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে অসমর্থ হত। কিন্তু ত্যাগশক্তিহীন সহস্র পণ্ডিতের কলরব একজন ত্যাগশক্তিপ্রবুদ্ধ রামমোহন রায়ের চেষ্টার কাছে পরাহত হ'য়ে গেল।

ইংরিজী-শিক্ষা ও স্বাদেশিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বলতে পারো, ইংরিজী শিক্ষাই এদেশে স্বাজাত্যবোধ এনেছে, কিন্তু আমি বল্‌ব, দেশীয় শিক্ষার ভিতর দিয়েও স্বাজাত্যবোধ আস্‌তে পার্‌ত। ইংরিজী হরফগুলি এদেশে স্বাজাত্যবোধ আনে নাই, হরফগুলির ভিতর দিয়ে যে অমূল্য জ্ঞান এসেছে, দেশাত্মবোধ বা অখণ্ড-ভারতের প্রতি প্রাণের অবিচল আকর্ষণ কতকটা সেই জ্ঞানেরই অপ্রত্যাশিত ফল। সেই জ্ঞান দেশী হরফের মধ্য দিয়েও আহৃত হতে পাত্ত। ফরাসী, জার্ম্মেণ, রুশ বা অষ্ট্রীয়ানরা ইংরিজী হরফের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে না ব'লেই ইংরেজ কোনও মনীষীর দান থেকে ত' বঞ্চিত হচ্চে না! ইংরিজী শিক্ষার প্রচার না হ'লে দেশী ভাষার মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্যের বাণী আমাদের নিকটে পৌঁছুত। তাতে পাশ্চাত্যের অনেক বিষ এই রন্ধন-স্থালীতেই জারিত হ'য়ে যেত এবং পরিবেশিত হ'ত শুধু সংশোধিত বস্তু।

চিন্তার পরাধীনতা দূর করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে

আমাদের চিন্তার পরাধীনতাকে দূর করার কোনও উপায় যে আমাদের হাতে নেই, তাও বলা চলে না। হাতে আমাদের উপায় আছে, সদুপায়ই আছে। আমার শাস্ত্র, আমার তীর্থ, আমার সদাচারকে আবার প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে হবে। শাস্ত্র-বচনের অসঙ্গতি খুঁজে খুঁজে হয়রান্ না হ'য়ে, তার ভাল দিক্‌টাকে নিজ নিজ জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হোক্, খোলা চ'খে আমরা নানা তীর্থ ভ্রমণ কত্তে আরম্ভ করি,—ত্যাগ, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের প্রত্যেকটি আচরণে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি,—দেখ্‌বে, বিনা চেষ্টায় পাশ্চাত্য সভ্যতার মিথ্যাটুকু দেশ থেকে পলায়ন করেছে।

ভারতের নিজস্ব স্বাদেশিকতার শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বিজাতি মাত্রেই সান্ধ্যোপাসনার সময়ে প্রথমেই "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু",—এই মন্ত্রটী উচ্চারণ ক'রে থাকেন। পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ সিন্ধুতটে ব'সে সন্ধ্যামন্ত্র পাঠের প্রাক্কালে গঙ্গাকে আহ্বান করেন সিন্ধুজলে, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ গোদাবরী-তীরে ব'সে সিন্ধুকে আহ্বান করেন গোদাবরী-জলে। সন্ধ্যামন্ত্রের ভিতর দিয়ে ভারতীয় হিন্দু স্মরণাতীত কাল থেকে এভাবে সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা স্মরণ করেছে। এই শিক্ষাটী ভারতের নিজস্ব সংস্কার। এর জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা আমদানী

করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। সমগ্র ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত যে প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট দৈনিক তিনবার ক'রে আপন হ'ত, সেই শিক্ষা বিলাতের দেওয়া নয়। তবে জাতিভেদ-বর্জ্জিত ইংরাজের সভ্যতা এসে পৌছুবার ফলে বড় লাভ আমাদের এই হ'ল যে, দ্বিজাতির অধিকৃত মন্ত্র ও সাধনে অন্ত্যজজাতির অধিকার আছে কিনা, তার চিন্তা নূতন ক'রে আমাদের মনে জাগ্‌ল। বৈদিক যুগেও এ প্রশ্ন অনেকবার আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মাঝে মাঝে অব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লাভের মধ্য দিয়ে নিজের জবাব নিজে সে পেয়েছে। পৌরাণিক যুগের শিক্ষা এ প্রশ্নকে কতকটা এড়িয়েই গিয়েছিল। বিদেশী মোগল, বিদেশী পাঠান যখন তাদের সম্পূর্ণ সভ্যতা নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, তখনও আমরা এ জাতীয় চিন্তা করেছিলাম কিন্তু সনাতন ধর্ম্মকে বিধর্ম্মীর উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় আমরা তখন এত বিব্রত যে, মন্ত্ররাজ প্রণবে অধিকার দানের কথা ধামাচাপা দিয়ে অন্য ভাবে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে সমীকরণের চেষ্টা কত্তে হয়েছিল। ইংরাজ শুধু সাম্রাজ্যই স্থাপন কল্লেন না, মতবাদের যে স্বাধীনতা মোগল-পাঠানের কাছে কল্পনার অতীত ছিল, ইংরেজ তাঁর দার্শনিকদের বাণীর ভিতর দিয়ে সেই স্বাধীনতার জয় ঘোষণা কর্লেন। মনে হ'ল, নূতন কিছু শুন্‌লাম। তাই যেন হঠাৎ জেগে উঠে জাতি-ভেদের দুর্গ ভেঙ্গে চুরে দিয়ে বৈষম্যের কলঙ্ক দূর কত্তে লেগে গেলাম। কিন্তু ভারতবর্ষ যে এক ও অখণ্ড, এই মহাশিক্ষা ভারতের মাটীতেই জন্মেছে এবং এই মহশিক্ষার গুণেই

ভারত অনন্তকাল নিজস্বতা বজায় রাখ্‌তে সমর্থ হবে। এ শিক্ষা ইংরেজের দেওয়া নয়।

ভারতের মাটী ও ভারতের জল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাশ্চাত্য সভ্যতাও চিরকাল ভারতের অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কিন্তু পশ্চিম যদি ভারতকে একবার ধাঁধায় ফেলে থাকে, পূর্ব্ব দিক্ থেকে আবার যে কোনো সময়ে আর একটী ধাঁধাঁর উৎপত্তি হবে না, এত নিশ্চিন্ত হবার কিছু নাই। ইতিহাস বলছে, যার মুষ্টিতে যখন অসি এসেছে, সেই তখন অতীতের বহু-প্রশংসিত বহু সভ্যতার মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে নিজের মর্জ্জি রেখেছে। তাই বহু সুদূরের অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও ভারতকে তার সিন্ধু, তার গঙ্গা, তার কাবেরী, তার যমুনা, তার গোদাবরী, তার সরস্বতীকে পল্লীকোণের ডোবার ঘাটে ব'সে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ কত্তে হবে। ভারতের মাটী আর ভারতের ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ভারতের নদী আর ভারতের মাটী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই মাটীকে ভালবাসাই তোমাদের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্মকার্য্য। এই মাটীই তোমাদের শিক্ষা দিবে যে, নিখিল বিশ্ব তোমাদের স্বদেশ।

স্বদেশ-প্রেম কাহাকে বলে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বদেশ প্রেম কেমন বস্তু জান? স্বদেশ-প্রেম যেন অগ্নিতপ্ত লৌহশলাকা,—যার হৃদয়ে

প্রবেশ করে, তার প্রাণ পরের দুঃখে, পরের ব্যাথায় ছট্‌ফট করে। স্বদেশ-প্রেম কেমন জান? পারদ খেলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ ফুটে বের হয়, ঠিক তেমনি ফুটে বের হয়, আর চ'খের নিদ্রা করে হরণ, মুখের হাসি নেয় কেড়ে। স্বদেশ-প্রেম কেমন জান? যেন কামানের গোলা। নিমেষের মধ্যে সে সকল স্বার্থবুদ্ধি ধ্বংস ক'রে দেয়, যা' ছিল অনাচার ও অবাঞ্ছিত, তা' সে ভস্ম ক'রে উড়িয়ে দেয়।

অহৈতুকী স্বদেশ-ভক্তি

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—প্রহ্লাদ ভগবানকে ভালবাসতেন। কেন বাস্‌তেন? তার কারণ তিনি জানতেন না। তিনি ভালবাস্‌তেন ব'লেই ভালবাস্‌তেন। ধ্রুবের কিন্তু ভগবানে ভালবাসা গিয়েছিল রাজ্যলাভোপলক্ষ্যে। সুগ্রীবের কিন্তু রামচন্দ্রে ভালবাসা গিয়েছিল বিপদে প'ড়ে, অত্যাচারী রাজা অর্থাৎ বালি কর্ত্তৃক স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে। স্বদেশকেও প্রহ্লাদের মত কেউ কেউ বিনা কারণে ভালবাসেন, তাঁরা ভালাবসেন ব'লেই ভালবাসেন। মান পাব, যশ পাব, মুকুটহীন রাজা হব, জন-গণ-মন-অধিনায়ক হব, এই লোভ থেকে কাজ কত্তে কত্তেও কারো কারো স্বদেশের প্রতি প্রেম জন্মে। কেউ বা রাজদ্বারে বিনা দোষে দণ্ডিত হ'য়ে বা লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেয়ে তার প্রতিবিধানকল্পে চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং এই বিদ্বেষমূলক চেষ্টা থেকেই স্বদেশ-প্রেমের উদ্ভব ঘটে।

এঁরা সকলেই প্রেমিক হন, কিন্তু যাঁর ভালবাসা অহৈতুকী, তিনিই শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত, তাঁরই স্থান সর্ব্বোচ্চে।

দেশভক্তির প্রকারভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশভক্তির উদ্ভবের কারণ থেকে দেশভক্তির উৎকর্ষেরও তারতম্য ঘটে। অত্যাচার পেয়ে যিনি দেশভক্ত হয়েছেন, অনেক সময়ে তিনি আবার সুযোগ পেলে অন্যের উপরে অন্যায় জুলুম কত্তে ছাড়েন না। সম্মাননার লোভ থেকে যিনি দেশভক্ত হয়েছেন, অবমাননার সম্ভাবনা দেখ্‌লে তিনি আবার অনেক সময়ে দেশদ্রোহীও হ'তে পারেন। কিন্তু অহৈতুকী যাঁর দেশভক্তি, তিনি বিশ্বপ্রেমিক ব'লেই স্বদেশ-প্রেমিক। কোনো জাতির উপরে তাঁর আক্রোশ নেই, কোনও সম্প্রদায়ের উপরে তাঁর বিদ্বেষ নেই, মানব-প্রীতির অমিয়-নির্ঝর তাঁর অন্তর জুড়ে খে'লে বেড়াচ্ছে, শত্রু-মিত্র, আপন-পর সবাই তাঁর কাছে প্রেমের পাত্র, স্নেহের আধার। আমার মতে ইনিই আদর্শ-প্রেমিক, এরূপ দেশপ্রেমিকেরই ভারতের আজ প্রয়োজন।

ভারতীয় দেশভক্তির সার্ব্বভৌমিকতা

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের মাটীতেই এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে,—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ত্রৈলোক্যং তৃপ্যতু, ব্রহ্মা থেকে সুরু ক'রে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, ভেক, কীট, পতঙ্গ এমন কি জড়পদার্থ পর্য্যন্ত

তৃপ্তি লাভ করুক। ভারতের দেশভক্তির বনিয়াদ হবে বিশ্বজনের প্রতি সেবাবুদ্ধি। জীবন আমার নিখিল জগতের সেবার জন্য, সুতরাং আমি ভারত-ভক্ত।

বর্ত্তমান যুবক ও ভারতের ভাগ্যপরিবর্ত্তন

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন,—

"প্রাণপণ অধ্যবসায় সহকারে নিজেকে সুগঠিত করিতে যত্ন লইতে থাক। নিজে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যকে লাভ কর এবং ব্রহ্মচর্য্যের অগ্নিমন্ত্র ছড়াইয়া এই নিদ্রিত, অবসন্ন, শৈথিল্যগ্রস্ত মহাজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোল। তোমাদের মত ভগ্নস্বাস্থ্য, ভগ্নমনা, সহায়সম্পদহীন যুবকেরাই তাহাদের সঙ্কল্পবদ্ধতা এবং সৎসঙ্কল্পের দুর্ব্বার সামর্থ্যে যুগে যুগে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তোমাদেরই মত সামান্য যুবকেরা সদিচ্ছার অপরাজেয় শক্তিতে যুগে যুগে ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। বিশ্বাস কর, তোমরা তাহারা, যাহাদের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ-ভারতের স্বর্ণ-শেখর গৌরব-মন্দির নভোমণ্ডলের সুনীল বক্ষ ভেদ করিয়া নির্ম্মিত হইবে, তোমাদেরই বজ্রবাহু বিশ্বব্যাপী অকল্যাণের ধ্বংসময়ী শক্তিকে ভীমসেন-কবলিত হিড়িম্বের মত, বক রাক্ষসের মত, কীচকের মত, জরাসন্ধের মত বিনাশ করিবে, মনুষ্যত্ব-পথের অপরিমেয় বাধা-বিঘ্নকে কটাক্ষে চূর্ণীকৃত করিবে, পতিতকে উত্থানের পথে,

শঙ্কাতুর ভয়-ভীতকে অভয়ের পথে, বিষাদ-খিন্ন নিরানন্দকে আনন্দের পথে টানিয়া আনিবে, দুঃস্থকে কল্যাণপুঞ্জে মণ্ডিত করিবে, অবসাদগ্রস্তকে আত্মবিশ্বাস দান করিবে ; নিজেকে বিশ্বাস করিয়া আজ কেশরীর বিক্রমে আত্মগঠনে অগ্রসর হও।

সাধনের বল

"নিজের সাধন-শক্তিকে বর্দ্ধিত করিতে প্রাণপণ যত্ন লইতে থাক। সাধনের শক্তিই শক্তি, ইহার তুলনায় অপরাপর শক্তি ছেলেখেলা মাত্র। সাধনের শক্তি থাকিলে দুই সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও চিন্তার অদৃশ্য ক্ষমতা দ্বারাই অপরের জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যায়। সাধনের শক্তি না থাকিলে দশ বৎসর একত্র সঙ্গ করিলেও কিছুতেই কিছু হইবে না। বাহুবলে জগৎ কল্যাণ হয় না, বিদ্যার বলেও নহে, বুদ্ধির বলেও নহে। পরন্তু জগৎকে যতজন মুক্তহস্তে কল্যাণ-বিতরণ করিয়াছেন, যতজন মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, যতজন পাতকীকে পাপ-পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিয়াছেন, অসত্য-সন্ধের মধ্যে সত্যের, অসংযমীর মধ্যে সংযমের, স্বার্থ-লুব্ধের মনে পরার্থের এবং ভোগাসক্তের চিত্তে ত্যাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্রত্যেকেই তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়ছেন সাধনের বলে।

সাধকেরই অভাব

"আমরা আজ কবি, আমরা আজ দার্শনিক, আমরা আজ

জ্ঞানী, আমরা আজ বিজ্ঞ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা আজ সাধক নহি। ভগবানকে আমরা অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করি নাই, তাঁহাকে জীবিতেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে প্রস্তুত হই নাই, জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে তাঁহার প্রেরণাকে অনুভব করি নাই। সুতরাং আমরা ভারতো-দ্ধারের প্রকৃষ্টতম, সুষ্ঠতম, সুন্দরতম সুপন্থা আবিষ্কার করিয়া লইতেও সমর্থ হইলাম না। পথের খোঁজে আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি, আর নিত্যনূতন হুজুগের সৃষ্টি করিয়া অভিশাপগ্রস্তের স্বাভাবিক চিত্তবৈকল্যকে কোন রকমে ঢাকিয়া রাখিতেছি। কিন্তু এভাবে ত' চিরকাল চলিবে না। আমাদিগকে আজ সাধন-শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কর্ম্মের পথে অবতীর্ণ হইতে হইবে।—অবশ্য, সাধন বলিতে আমি দেশ-কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্যহীন সাধন বুঝাইতেছি না।

ভারত সর্ব্বজনীন দেশ, ইহার উদ্ধারকর্ত্তা অসংখ্য

"একজন বা দুইজন মহাপুরুষ ভারতকে উদ্ধার করিয়া দিবেন, এই মিথ্যা কল্পনার প্রশ্রয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও দিও না। ভারতবর্ষ কখনও একজনের শাসন মানে নাই, এক গুরুর শিষ্য হয় নাই, এক মন্ত্রে দীক্ষা নেয় নাই, এক ধর্ম্মের আচরণ করে নাই, একজনের চেষ্টা, একজনের সাধনা বা একজনের দিগ্বিজয় ভারতবর্ষের এই অতুলনীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তোলে নাই।

বশিষ্ঠই ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, ভীষ্মই ভারতবর্ষের একমাত্র আদর্শ নহে, দধীচিই ভারতবর্ষের আত্মোৎসর্গের একমাত্র উপমা নহে। এদেশ একটি মাত্র ধর্ম্মের জন্য নহে, একটী মাত্র বর্ণের জন্য নহে। সুতরাং একটী মাত্র মহাপুরুষ এ দেশকে উদ্ধার করিবেন না। তোমাদের প্রত্যেককে মহাপুরুষ হইতে হইবে, তোমাদের প্রত্যেককে আদর্শ-প্রতিষ্ঠাতা হইতে হইবে, তোমাদের প্রত্যেককে নিজের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির উন্মেষ অনুভব করিতে হইবে।

য়ুরোপ ও ভারতের মুক্তি-সাধনার পার্থক্য

''বলিতে পার, ফ্রান্স-আমেরিকা ত' সাধন-শক্তি লাভ করে নাই,—তাহারা যাহা করিয়াছে কামান আর তলোয়ারের জোরে। ইহার উত্তর সোজা। ইহারা যথার্থ মুক্তিকে লাভ করে নাই ; যে মুক্তি ইহ-পর জীবনের পূর্ণতার সুখাস্বাদনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, ইহারা তাহার খোঁজটুকুও পায় নাই। ইহারা একদিকে যেমন না পারিয়াছে দরিদ্রের ক্রন্দন নিবারণ করিতে, আর একদিকে তেমন না পারিয়াছে মানবের অন্তরতম আত্মার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিতে। না পারিয়াছে ইহারা ভোগের তৃষ্ণা মিটাইতে, না পারিয়াছে ইহারা ত্যাগের বহ্নি জ্বালাইতে। না পারিয়াছে ইহারা ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে, না পারিয়াছে ইহারা অতীন্দ্রিয়ের মাঝে অবগাহন করিতে। না পারিয়াছে ইহারা

রক্তমাংসের দাবী পূরণ করিতে, না পারিয়াছে ইহারা আত্মার আলোক স্পর্শ করিতে। ইহাদের মুক্তি-সাধনা সিদ্ধিকে করতলগত করিতে পারে নাই, পরন্তু তান্ত্রিক পঞ্চ-ম-কারীর বিক্ষিপ্ত বিকারের ন্যায় পরস্বাপহরণের দুর্দ্দমনীয় লোভই শুধু ইহাদের মস্তিষ্ক ও অস্থিমজ্জা নিরন্তর চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে। যে ভারতবর্ষ তাহার অতীতকে শতগুণে অতিক্রম করিয়া যাইবে, যে ভারতবর্ষ বর্তমানের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী দু'এক বিদ্যুৎ-ঝলকের তুলনায় কোটিগুণ দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইবে, ভবিষ্যতের সেই অখণ্ড-ভারতবর্ষ ক্ষণস্থায়ী, পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ মুক্তিকে চাহে না। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ ইহকালের মুক্তি আর পরকালের মোক্ষ উভয়কেই একই বাহুপাশে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহে। সুতরাং ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনার ধারা অপর সকল দেশ হইতে একটু পৃথক্ হইবেই হইবে। ভারতবর্ষ ক্ষাত্র-শক্তিকে উপেক্ষা করিবে না, বাহুবলকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিবে না, কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবে ব্রাহ্মণ্যশক্তির উপরে। ভারতের মুক্তি সাধনার বিশেষত্ব এই হইবে যে, ইহার কর্ম্মী এবং নেতাগণের ইচ্ছার শক্তি বাক্যের শক্তি অপেক্ষা কোটিগুণে বজ্রময়ী, বিদ্যুন্ময়ী, জ্বালাময়ী এবং গর্জ্জনময়ী হইবে।''

স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব ও তাহার সাধন

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের জনৈক বিদ্যার্থী-ভক্তের নিকট লিখিলেন,—

"* * * স্ত্রী-জাতির প্রতি মাতৃভাব আসা অত্যন্ত আবশ্যক বটে কিন্তু এত শীঘ্রই আসিতেছে না বলিয়া অধীর হইবার কিছুই নাই। রামপ্রসাদের মাতৃভাব আসিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব আসিয়াছিল সে কি সামান্য সাধনার ফলে, সহজ অধ্যবসায়ের পরে? তোমারও মাতৃভাব আসিবে, না আসিয়া পারে না। যখন ভগবানকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে শিখিবে, অথবা মায়ের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতে পারিবে, তখনই স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব সহজলভ্য হইবে। ভগবানকে যখন 'মা' বলিয়া বুঝিবে অথবা নিজের মা-কে যখন ভগবান্ বলিয়া বুঝিবে, তখন দেখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তোমার মায়েরই স্নেহ-সমুজ্বল আশিস-স্নিগ্ধ অপরূপ মুখখানি প্রতিভাসিত হইতেছে।

"ভগবানকে যাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসে নাই, গর্ভধারিণী জননীকে যাহারা ভালবাসিতে পারে নাই, স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মানব স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাবকে একটা মিথ্যা কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে যে চাহিতেছে, তাহার প্রকৃত কারণটা কি জান? ইহারা ভগবানে মাতৃবুদ্ধি আরোপ করিতে অসমর্থ, ইহারা নিজের মাকেও ভালবাসিতে অক্ষম। তাই, ইহাদের স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব একটা অলীক কল্পনা মাত্র, বাস্তবতাহীন সত্যলেশ-বর্জ্জিত শুধু একটা নিরর্থক উপন্যাস। কিন্তু ভগবানের মাতৃময়ী স্নেহ-করুণার আস্বাদন বহু পুণ্য-ফলে, বহু সাধন-বলে একবার এক মুহূর্ত্তের

জন্যও যদি লাভ কর, তাহা হইলে দেখিবে, স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব পোষণ করা অতি সহজ ব্যাপার। এ ভাব তখন চেষ্টা দ্বারা আনিতে হয় না, আপনা-আপনি আসে।

"কিন্তু ভগবানে মাতৃবুদ্ধি অথবা মাতাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতেও সাধনা লাগে। সাধন না থাকিলে মা বলিয়া ডাকিবার রুচি বা সামর্থ্য আসে না, মাকেও ভগবান্ বলিয়া মনন করা যায় না। সুতরাং নাম-সাধনায় নিবিষ্ট হও।"

স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব আনার সহজ উপায়

শ্রীযুক্ত ন—জিজ্ঞাস করিলেন,—স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব আনার সহজ উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেতে সন্তানভাব আনা। সদ্যোজাত শিশু কোলে নিয়ে মা স্তন্যপান করাচ্ছেন, এই মূর্ত্তি ধ্যান কত্তে কত্তে নিজেকে ঐ ক্রোড়স্থিত শিশু ব'লে ভাবা।

জ্ঞানী ব্রহ্মচারী ও ভক্ত ব্রহ্মচারী

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ। জ্ঞানী এবং ভক্ত। জ্ঞানপন্থী ব্রহ্মচারী নিজেতে ব্রহ্মভাব আনয়ন করেন এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিতে যে পার্থক্য আছে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে উভয়কেই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মে স্থিত দর্শন করেন। ভক্তিপন্থী ব্রহ্মচারী ভগবানকে মা ব'লে ভাবেন, নিজেকে

সন্তান ব'লে উপলব্ধি করেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, সকল স্ত্রীর প্রতি সেই সম্বন্ধটারই মনন ও অনুধ্যান করেন।

কলিকাতা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

বিধবার ভবিষ্যৎ

আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় বিধবাদের ভবিষ্যৎ আমি বড়ই উজ্জ্বল দেখ্‌তে পাচ্ছি। এঁদের ভিতর থেকে এত বড় বড় সব ত্যাগী, কর্ম্মী, আচার্য্য ও সমাজ-শিক্ষক বেরুবেন যে, দেশের মধ্যে একটী নারীও অশিক্ষিতা, অপটু বা অন্ধসংস্কারাচ্ছন্না থাক্‌বে না। কপিল, কনাদ, পতঞ্জলি এঁদের মধ্য দিয়ে বেরুবেন, কত বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের নব-বিগ্রহ এইসব ব্রহ্মচর্য্যশুদ্ধ তপঃপবিত্র সংযম-কৃশ শরীরের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠ্‌বেন।

সদ্‌গুরু নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাব্‌তে পার, যে বিধবারা এতবড় হবেন, তাঁরা ত' আর অশিক্ষিতা থাক্‌লে চলবে না, তাঁদের শিক্ষা লাভের সুযোগ কোথায়? কিন্তু তা'ও জুটে যাবে। যে যুগের যেটা প্রয়োজন, সে যুগে সেটার আয়োজন আপনা-আপনি হবে, কাউকে গিয়ে গায়ের জোরে বুঝাতে হবে

না। বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে প্রচলিত কর্ব্বার জন্যে যে আন্দোলন চল্‌ছে, তার সাফল্যের অনেক আগে বিধবার ত্যাগ-পবিত্র জীবন-যাপনের আন্দোলন স্বতঃই সফলতা লাভ কর্ব্বে। এ আন্দোলন কি সফলতা লাভ কর্ব্বে চেঁচামেচিতে আর লাফালাফিতে? না, তা নয়। এ আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর কর্ব্বে সদ্‌গুরুর আবির্ভাবের উপরে। কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট জগদ্‌গুরু বা বিশ্বত্রাতার আবির্ভাবের উপরে নয়, পরন্তু দেশের সর্ব্বত্র সমাজের সর্ব্বস্তরে শত শত তপঃসিদ্ধ নিষ্কাম চেতা সদ্‌গুরুর আবির্ভাবের উপরে। কারণ, সদ্‌গুরু নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর মুখের বাণীতেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞান প্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে ; আর সত্যিকার সদ্‌গুরু যদি তিনি হ'য়ে থাকেন, তবে যা তাঁর মুখের বাণীতে আছে, তার কোটিগুণ আছে তাঁর প্রলোভন-জয়ী নিষ্কাম প্রাণের নিভৃত সদিসছার মাঝে। তাঁর সদ্‌গুরুত্ব তাঁর মন্ত্রদান-শক্তির প্রাচুর্য্যের উপরে নির্ভর কর্ব্বে না, কর্ব্বে সকলের সঙ্গে সর্ব্বসম্বন্ধবর্জ্জিত থেকেও সকলের ভিতরে জ্ঞান ও ত্যাগনিষ্ঠার উন্মেষের শক্তির উপরে।

সাধন-শক্তির অভাব ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীগ্রামে স্থিত কোনও দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মীর নিকটে একখানা পত্র লিখিলেন। নিম্নে তাহা অনুলিখিত হইল ঃ—

"যে কাজে নামিয়াছ, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হইবে সাধন-শক্তির। বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়া, ফন্দী চালাকী দিয়া, পাটোয়ারীর তোড়জোড় বাঁধিয়া তোমা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিরা যাহা করিতে পারেন নাই, যদি সাধনের শক্তি অর্জ্জন ও সঞ্চার করিতে পার, তবে তুমি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। দেশে ত' কত শত প্রতিষ্ঠান গড়া হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই যে একমাত্র সাধন-শক্তির অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ আজ কে রাখে? নানা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক-দিকের বিদ্যার অভাব বা বুদ্ধির অপ্রতুলতা এই অভাবনীয় পরাভবের কারণ নহে। যে সাধন-শক্তি লাভ করিতে পারিলে অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিবার জন্য সংবাদপত্রে কৃত্রিম জয়ঢক্কার নিনাদ করিতে হয় না, যে সাধন-শক্তি করায়ত্ত থাকিলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দারিদ্র্যের শোচনীয় উলঙ্গ-মূর্ত্তি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য জমা-খরচের মিথ্যা হিসাব লিখিতে হয় না, যে সাধন-শক্তির সঞ্চয় থাকিলে বলের অভাবকে দলের পুরুত্ব দিয়া ঘুচাবার বন্ধ্যা চেষ্টার পদ-সেবা করিতে হয় না, তাহার অভাবই এই পরাভবের মূলীভূত কারণ।

পাশ্চাত্যের শৃঙ্খলা ও ভারতের সাধন-শক্তি

"পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া আমরা যে অভিনব শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহার কুত্রাপি এই সাধন-শক্তির স্থান নাই। আর ভারতবর্ষের নিজস্ব সভ্যতা যে শিক্ষাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই সাধন-শক্তির মূলেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবতী হইয়াছিল। দেশের সেবা করিতে যাইবার আগে আমাদিগকে দীর্ঘকাল-উপেক্ষিত সেই সনাতন-সত্যের অর্চ্চনা করিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্যের নিকট হইতে যে শৃঙ্খলাবুদ্ধি আমরা পাইয়াছি, তাহা 'বয়কট্' করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু প্রাচীন-ভারত যে সাধন-শক্তির ইঙ্গিত আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছে, তাহার অনুশাসন আমাদিগকে মান্য করিতে হইবে। সুতরাং আজ তোমার লক্ষ্য পড়ুক সর্ব্বাগ্রে তপস্যার প্রতি। বিদ্যার কিছু কমতি থাকিলে দোষ হইবে না, বুদ্ধির কিছু ঘাট্‌তি থাকিলে দুর্গোৎসব ঠেকিবে না, কিন্তু যদি সাধক না হও, যদি ভক্তি-বিনম্র তপস্বী না হও, যদি না ভগবৎ-সেবার সহিত দেহ-সেবাকে অভিন্নরূপে একীকৃত করিয়া লইতে পার, তাহা হইলেই আপদ জুটিল।

নিষ্কাম প্রেম ও ফলাভিসন্ধিহীন সেবা

"মঠের (আশ্রমের) কার্য্যে তোমার যে অপরিসীম প্রীতি ও ত্যাগ স্বীকারেচ্ছা, জানিও তাহা সর্ব্বতোভাবে তোমার কল্যাণপ্রদ হইবে। এই অনুরাগ তোমার বন্ধনের হেতু নহে; পরন্তু মুক্তিরই পরোক্ষ সেতু। তবে, তোমার সহযোগীদের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মঙ্গলপ্রদ নহে। তুমি ইহাদের সেবা করিয়া যাও,

ইহাদের জীবন-গঠনের জন্য তুমি আত্মজীবন বলি দাও, ইহাদের মনুষ্যত্বের উন্মেষের জন্য তুমি তোমার সকল সুখে জলাঞ্জলি দাও, কিন্তু সাবধান, ইহাদের প্রতি অন্ধ অনুরক্তিতে আবদ্ধ হইও না। বিশ্বজগৎকে ভালবাসিতে আসিয়াছ, তাই বিশ্বসেবকের সেবার জন্য তুমি তোমার কণ্ঠনালী ছিঁড়িয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছ, তাই তুমি হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শোণিত-তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছ,—কিন্তু যাহাদের জন্য জীবন দিতেছ, যাহাদের জন্য কাঁদিয়া মরিতেছ, যাহাদের জন্য সর্ব্বত্যাগের কঠোরতা হাসিমুখে বরণ করিয়াছ, তাহারা যদি একদিন অকৃতজ্ঞ হয়, তাহারা যদি একদিন তোমাকে বর্জ্জন করিয়া অন্যতর সহযোগীর সাথে জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়, এমন কি তাহারা যদি একদিন চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া আততায়িরূপে তোমার সমগ্র জীবনের সাধনা ও আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলেও তোমাকে নিরুদ্বিগ্ন-চেতা থাকিতে হইবে। ইহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু চিরবশ্যতার সর্ত্ত রাখিয়া নয়; ইহাদিগকে স্নেহ কর, কিন্তু কোনও প্রকার প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিয়া নয়। ইহাদিগের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াই কৃতার্থ থাক, ইহাদের জীবনের কল্যাণই তোমার চরম লক্ষ্য হউক, কিন্তু ইহাদের সহযোগিতা বা সাহচর্য্য পাইবার জন্য চিত্তকে কখনও লালায়িত হইতে দিও না। স্বাভাবিক প্রেরণার বশে যদি কেহ তোমার স্কন্ধ মিলাইয়া সমাজ-কল্যাণের গুরুভার বহন করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার জন্য নীরবভাবে অপেক্ষা করিতে পার। যদি কেহ না হয়, তবে

অনুশোচনা করিতে তুমি পার না। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দেখিবে, কত বন্ধু আসিতেছে আর কত বন্ধু চলিয়া যাইতেছে,—তুমি তাহাদের জন্য যাহা করিবার করিয়া খালাস, কিন্তু তাহারা তোমার আদর্শকে মূর্ত্তিদান করিবার জন্য কি করিল আর না করিল, ইহা তোমার অনুধাবনীয় নহে। তোমরা সহযোগীদিগকে যদি এইভাবে স্নেহ করিতে পার, তবেই তোমার স্নেহ তাহার পূর্ণ সার্থকতা ও মহিমাকে লাভ করিবে, নতুবা তোমার অফুরন্ত স্নেহ শুধু অফুরন্ত দুঃখ ও অফুরন্ত নীচতাকেই আহরণ করিবে, তোমার অপরিমেয় ভালবাসা তোমার জন্য মহাযন্ত্রণাপ্রদ শরশয্যাই রচনা করিবে।

দেবতার ভালবাসা ও পশুর ভালবাসা

"মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষ যখন দেবতা হয়, তখন আকাশের মত সে হয় উদার, বিশাল, অনন্ত। মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষ যখন পশু হয়, তখন অন্ধকূপের মত সে হয় সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময় ও সদা-সন্দিগ্ধচেতা। সহকর্ম্মীদের প্রতি ভালবাসা তোমাকে যখন পঙ্কিল করিবে, তখন জানিবে, এই সকল ব্যক্তির সহিত এক জোয়ালে কাঁধ দিয়া কাজ করা তোমার উচিত নহে। এই সকল সহকর্ম্মীদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াও। সঙ্গ, সেবা ও প্রেম তোমাকে দেবতা করুক, পশু যেন করিতে না পারে। সহকর্ম্মীদের কাহারও কাহারও জন্য তোমার যে হাহুতোহস্মি ভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়,

তাহাকে সকল সময়েই নির্ব্বিচারে মনের শুচিতা বলিয়া বিশ্বাস করিও না। তাহাকে কঠোর ভাবে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে। যে ভালবাসা তোমকে দেবতা করিবে, তাহাই তোমার প্রয়োজন। যে ভালবাসা তোমাকে পশু করিবে, তেমন ভালবাসায় কোন্ সার্থকতা?”

কলিকাতা

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

রন্ধনকালীন মনোভাব ও খাদ্যসামগ্রী

উপদেশদান-প্রসঙ্গে জনৈকা মহিলা-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রিয়জনের আহারের জন্য যে দ্রব্য-সামগ্রী তোমরা রন্ধন কর, সব সময়ে খেয়াল রেখ, সেইগুলি রন্ধনের ও পরিবেশনের কালে তোমাদের মন যেন নীচ, মলিন ও নোংরা না থাকে। খাদ্যবস্তু তোমার প্রিয়জনের প্রাণ-শক্তিকে যতটুকু পোষণ করে, রন্ধন-কালীন ও পরিবেশন-কালীন তোমার স্নিগ্ধ, সরল, নিঃস্বার্থ চিন্তা তার চেয়ে অধিক করে।

কলিকাতা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

সত্য ও গুরু

অদ্য কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ জগতে সত্যের মতন গুরু নাই, গুরুর মত সত্য নাই। কিন্তু

সত্যই বা কাকে বলে, গুরুই বা কাকে কহে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, যাহা গুরু, কোন কিছুর তুলনাতেই যা' লঘু নয়, নীচ নয়, ছোট নয়, তাই সত্য, আর যা' সত্য, মিথ্যার যাতে লেশমাত্র নেই, অণুমাত্র নেই, স্পর্শমাত্র নেই, তাই হচ্ছেন গুরু। সত্যে আর গুরুতে যদি বিরোধ ঘটে, তবে বুঝ্‌তে হবে, হয় সত্যটা সত্য নয়, অথবা গুরুই গুরু নন। অ-গুরু গুরুকে সত্যের জন্য ত্যাগ করা যায়, অ-সত্যকে গুরুর জন্য বর্জ্জন করা যায়। অ-গুরু গুরুর বর্জ্জনে সত্যকে লাভ করা যায়, অ-সত্য সত্য-বর্জ্জনে গুরুকে লাভ করা যায়। সত্যকে যে পেয়েছে, গুরুকে সে পেয়েছে, গুরুকে যে পেয়েছে, সত্যকেও সে পেয়েছে। গুরু আর সত্য অভেদ, অ-গুরু আর অ-সত্য অভেদ।

দীক্ষা ও দীক্ষাদাতা

তৎপরে দীক্ষার কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎসঙ্কল্পে দৃঢ়া স্থিতি-দানই দীক্ষাদান আর সৎসঙ্কল্পে দৃঢ়া নিষ্ঠা-গ্রহণই দীক্ষা-গ্রহণ। যাঁর যে বিষয়ে সঙ্কল্পের দৃঢ় নিশ্চয় নেই, তিনি সে বিষয়ে দীক্ষা দিতে পারেন না। যাঁর যে বিষয়ে ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি সে বিষয়ে দীক্ষা নিতে পারেন না, নিজে যিনি ব্রহ্মচর্য্যে অটুট নিষ্ঠাবান্ নন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা দিতে পারেন না। নিজে যিনি ভগবদ্দর্শনের জন্য কৃতসঙ্কল্প নন, তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা দিতে পারেন না। নিজে যিনি স্বদেশ-সাধনায় দৃঢ়ব্রত নন, তিনি স্বদেশ-ব্রতে দীক্ষা দিতে পারেন না।

দীক্ষিত ও দীক্ষাদাতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—দীক্ষিতের উপরে দীক্ষা-দাতার প্রভাব অপরিসীম। এ প্রভাব ভাল দিকেও বটে, মন্দ দিকেও বটে। দীক্ষা-দাতার জীবনে যদি কাপট্য থাকে, দীক্ষিতের জীবনেও তার ছায়া এসে পড়ে; দীক্ষা-দাতার জীবনে যদি লাম্পট্য থাকে, দীক্ষিতের জীবনেও তার স্পর্শ আস্‌তে চায়। দীক্ষা-দাতার জীবনে যদি ফাঁকি-বাজি থাকে, চালাকী থাকে, ছলচাতুরী থাকে, দীক্ষিতও ফাঁকিবাজ, চালিয়াৎ ও ছলনাকারী হয়। আর, দীক্ষাদাতার জীবনে যদি থাকে নিষ্কাম বৈরাগ্য, প্রেমে সমদর্শিতা আর একনিষ্ঠ সাধন-পরায়ণতা, তা' হ'লে শিষ্যের জীবনে ঐসব দুর্ল্লভ সদ্গুণ ও কৃতিত্বনিচয় ফুটে উঠে। সকল আধারেই সমপরিমাণে ফোটে, তা' নয়, কিন্তু ফোটে যে, তা' অবধারিত। কি ধর্ম্ম-সাধনা, কি স্বদেশ-সাধনা, সকল সাধনার জগতেই এই একই নিয়ম। পুত্র যেমন পিতার দোষগুণ পায়, দীক্ষিত তেমন দীক্ষা-দাতার দোষগুণ পায়,—সবটা না পাক্, অল্প হ'লেও কিছু না কিছু পায়।

স্বদেশী গুরু ও স্বদেশী শিষ্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মসাধনের জগতে শিষ্যের উপরে গুরুর এই অপরিসীম প্রভাব সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব থেকেই ভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত রয়েছে। সেও আবার যেমন-তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়, বল্‌তে গেলে একেবারে অবিসংবাদিত-

রূপেই স্বীকৃত রয়েছে। কিন্তু দেশ-সাধনার ব্যাপারে এই সত্যটীকে আমরা স্বীকার করেছি, না মুখে, না মনে, না কার্য্যতঃ। স্বদেশী গুরুরা নিজেরা কথ্য অকথ্য নানাপ্রকার নিকৃষ্ট বিলাস-ব্যসনে মত্ত থেকে শিষ্যদের বলেছেন ত্যাগী হ'তে আর দরিদ্রের দুঃখে কাঁদতে,—দরিদ্রের দুঃখের কথা ভেবে নিজেরা একটিবার কাঁদেন নি, বা একটী রজনীও বিছানায় ছট্‌ফট্ করেন নি। স্বদেশী গুরুরা নিজেদের বিরাট পৈতৃক উত্তরাধিকার পেয়ে সে ধন-সম্পত্তি জনসাধারণের সহিত ভাগ ক'রে ভোগ করেন নি, একা একাই ভোগ করেছেন, একাই দুনিয়ার মজা লুটেছেন, কিন্তু শিষ্যদের বলছেন নিজেদের ধন, সম্পদ, উৎপন্ন দ্রব্য সব জনসাধারণের সঙ্গে সমভাবে ভাগ ক'রে ভোগ কত্তে। নিজেরা খাচ্ছেন আঙ্গুর আর বেদানার রস, আর পল্লীগ্রামের তৃষ্ণার্ত্ত শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন তার পাতাপচা ঘোলাটে জলের গ্লাসটা নিজে না খেয়ে পরকে দিয়ে দিতে। এই যে কপটাচার, এইটাই হয়েছে ভারতবর্ষের সকল জাতীয় আন্দোলনের ক্ষীণ-জীবিত্বের কারণ। কথার চটকে শিষ্যের দল দুই দিন মুগ্ধ হয়, কিন্তু এ মোহ ত' চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। তখন তারা দেশকে নিজের পথ নিজে দেখে নিতে ব'লে যার যার ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে চ'লে যায়। নেতার মধ্যে ত্যাগ আছে মনে ক'রেই তারা ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে ধামাচাপা দিয়ে দেশের সমস্যা মিটাতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু নেতারাই যখন সব স্বার্থের দাস, ব্যক্তিগত সুখের কিঙ্কর, তখন শিষ্যেরা তাদের নকল সিংহনাদে আর কত দিন ভক্তি রাখবে? সর্ব্বত্যাগী নেতার ছেলের

খোরকীর জন্য ব্যাঙ্কে দু' লাখ টাকা সঞ্চিত রয়েছে, সাম্যবাদী কম্যুনিষ্ট নেতার জমিদারীর আয় দশ লাখ টাকা আর বাড়ীতে ভিখারী গেলে দুয়ারেই তাড়া খেয়ে ফিরে আসে, স্বদেশী নেতা বিদেশী পণ্য আমদানীর ব্যবসায়ে গোপনে গোপন টাকা খাটাচ্ছেন,—এই সমস্ত যখন ধরা পড়ে, তখন শিষ্য গুরুদেবের চরণে জনান্তিকে প্রণাম জানিয়ে নিঃশব্দে স'রে পড়ে।

কলিকাতা

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩॥

সন্ন্যাস-সাধনা ও যুগের দাবী

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সংসার-ত্যাগেচ্ছু জনৈক ভক্তের নিকটে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেনঃ—

"* * * ঘর-সংসার যে ছাড়িবে, ইহা ত' নিশ্চিত। তোমার মতন ছেলেদের জন্য দেশ অপেক্ষা করিতেছে। দেশের আজ একান্ত প্রয়োজন একদল ত্যাগ-সমর্থ ব্রহ্মচারীর,—এমন একদল ব্রহ্মচারীর, যাহারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া নিজেদের জীবনকে দেশব্যাপী পুনর্জাগরণের জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে নির্ম্মমভাবে উৎসর্গ করিবেন। আত্মোৎসর্গ করিবার জন্যই তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছ, আত্মত্যাগই তোমার ধর্ম্ম, পরার্থে সর্ব্বস্ব সমর্পণই তোমার পূর্ণ পরিণতি। সংসারের মোহজালে বদ্ধ হইয়া ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেই তোমার আবির্ভাব নহে পরন্তু সর্ব্বস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া সকল সুখ-কামনার মুখে পদাঘাত করিয়া, জগতের শত সৌভাগ্য-

সম্ভোগ হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখিয়া পরার্থে তুমি দধীচির ন্যায় অস্থিদান করিবে, তোমার পক্ষে, ইহাই ধ্রুব সত্য। সংসারীর সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়া যাঁহারা দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন, আমি আজ তাঁহাদিগকেও সমান আগ্রহেই প্রার্থনা করি, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি ইহাদের মধ্যে একজন নহ। তোমার পর্য্যায় ইহাদের পর্য্যায় হইতে ভিন্ন, তুমি ইহাদের অপেক্ষা অন্যতম পংক্তিভুক্ত। আমি শতবার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি যে, অধঃপতিত, অভিশপ্ত ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা সন্ন্যাসীও নহেন, এই বর্ত্তমান ক্লীবযুগের ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ভোগসর্ব্বস্ব গৃহীনামের অযোগ্য, তথাকথিত গার্হস্থ্যাশ্রমীও নহেন। আমি বারংবার বলিয়াছি যে, যে-যুগে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ-সাধনার ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হইবে, যে-যুগে সংসারী-জীবন মনুষ্যত্ব-সাধনার বিকাশ-ভূমিরূপে পরিগণিত হইবে, যে যুগে বিবাহিত নর-নারী নিত্য-মুক্তির আস্বাদন লাভের জন্যই বিবাহরূপ বন্ধনকে স্বীকার করিবেন, সেই জাগ্রত যুগের গৃহীরাই ভারতবর্ষকে তাহার চিরপরাধীনতার অভিশাপ হইতে, দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে, মরণভয়-কাতরতার অভিশাপ হইতে এবং সর্ব্বোপরি জীবন্মৃত্যুর অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবেন। অভিশাপ-গ্রস্ত রাজা নহুষ যেমন করিয়া অজগর-কলেবর পরিহার করতঃ শাপমুক্ত অবস্থায় দিব্যসুন্দর, জ্যোতির্ম্ময় নবশরীর লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষও সেইদিন তেমনি হইবেন। অষ্টবজ্র-সম্মেলনে যেমন উর্ব্বশী শাপ-বিমুক্তা হইয়া নবযৌবনশ্রীমণ্ডিত দিব্যতনু লাভ করিয়াছিলেন, ভারত-জননী সেইদিন তেমন হইবেন।

কিন্তু এই নবযুগের গার্হস্থ্যকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য আজ যাঁহারা প্রাণদান করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই গৃহী নহেন। ইহা আমি জানি,—ধ্রুব সত্যরূপে ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। একদল দার্শনিক মনোভাব-সম্পন্ন সমাজ-হিতৈষী সন্ন্যাস-জীবনকে যতই নিন্দা করুন না, একদল ব্রহ্মজ্ঞান-অভিলাষী গৃহী সাধক বা অসাধক সন্ন্যাস জীবনকে যতই নিরর্থক বলিয়া প্রতিপাদিত করিতে চেষ্টা পাউন না, ভগবৎ-সাধন-সিদ্ধ গার্হস্থ্যাশ্রমী গুরুদেবের একদল শিষ্য-সম্প্রদায় সন্ন্যাসকে যতই নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করুন না, সর্ব্বশেষে জাতীয় রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা-বিদূরণে গৃহীত-ব্রত একদল স্বদেশকর্ম্মী সন্ন্যাসকে নিরর্থক আবর্জ্জনা ও সমাজের বিক্ষেপ বলিয়া যতই নিন্দা করুন না, আমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানি যে, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে অতি শীঘ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য সন্ন্যাস-শুদ্ধ, ত্যাগ-প্রবুদ্ধ একদল মহাকর্ম্মী অদূর-ভবিষ্যতে যে অভাবনীয় জাতীয় ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে রচনা করিবেন, বহু যুগ এবং বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে। কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে আপাততঃ সুস্থির হইতে বলিতেছি। ত্যাগ ত' করিবেই, কিন্তু করার মত কর। জীবন ত' দিবেই, কিন্তু দিবার মত দাও। মরিতেই ত' আসিয়াছ, কিন্তু মরার মত মর। যার কিছু নাই, সে কি দিবে? যার সামর্থ্য অল্প, সে কতটুকু করিবে? যার প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ, সে কতটুকু মরিবে? নিজের জীবনের ত্যাগকে অধিকতর গৌরব দিবার জন্য জীবনকে আগে সঞ্চয়বন্ত ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোল। বর্ত্তমান অবস্থানিচয় তোমাকে যেদিকে যতটুকু শক্তি-সংগ্রহে

সুযোগ দিতেছে, তাহার আগে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া লও।"

জাতিভেদ কেন

শ্রীযুক্ত স—পত্রসমূহ নকল করিতেছিলেন। প্রতিলিপি লিখার কাজ সমাপ্ত হইলে তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত স—জিজ্ঞাসা করিলেন,—সবাই যদি ব্রহ্ম, তবে জাতিভেদ কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোরা সবাইকে ব্রহ্ম ব'লে মানিস্ না ব'লেই জাতিভেদ। তোরা মনে মুখে এক হ'তে পাস্ না ব'লেই জাতিভেদ।

উদ্ধার বলিতে কি বুঝায়

শ্রীযুক্ত স—জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি সর্ব্বদাই ব'লে থাকেন, 'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র।' এই 'উদ্ধার' শব্দটার মানে কি 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ?'

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই যে এর মানে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাই যে এর মানে হবে না, এমনও কোনো কথা নেই। সীতা-উদ্ধার বলতে বুঝায়, যে সীতাকে রাবণ কেড়ে নিয়েছিল, তাকে ফিরে পাওয়া। অহল্যা-উদ্ধার বল্‌তে বুঝায়, যে অহল্যা নিজ মানবীত্ব হারিয়ে পাষাণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, তার মানবীত্ব ফিরে আনা। জগাই-মাধাই-উদ্ধার বল্‌তে বুঝায়, যে জগাই-মাধাই-পাপাচরণে ডুবে গিয়েছিল, তাদের পুণ্যপথে

টেনে তোলা। অস্পৃশ্যোদ্ধার বল্‌তে বুঝায়, যারা নিজেদের কদাচার ও কুশিক্ষার ফলে উচ্চবর্ণসমূহের দ্বারা অনাদৃত হয়েছিল, তা'দিগকে সুশিক্ষা ও সদাচারের বলে পুনরায় সকলের সম্মাননীয় অবস্থায় উন্নীত করা। 'ভারতের উদ্ধার' বল্‌তেও তেমনি বুঝায় যে, যে বিষয়ে অবনত হ'য়ে পড়ায় ভারতবর্ষ সীতা-হীন রামচন্দ্রের মত নিরানন্দ, পাষাণত্ব-প্রাপ্তা অহল্যার ন্যায় নির্জ্জীব, কলুষ-পঙ্ক-নিমজ্জিত জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাপ-পরায়ণ, সদাচার-বিস্মৃত, সৎশিক্ষাহীন অন্ত্যজের ন্যায় অপাংক্তেয়, সেই সেই বিষয়ে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ-শৃঙ্খলা, চরিত্রবল, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, দৈহিক শক্তি, মানসিক উৎকর্ষ,—এই সকলের সর্ব্বতোভাব বিকাশেরই নাম ভারতের উদ্ধার। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এলেও যদি ভারতবাসীর এই সব দিকে উন্নতি সাধিত না হয়, তবে বুঝ্‌তে হবে, স্বাধীনতাও ভারতের প্রকৃত উদ্ধার নয়।

কলিকাতা

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

উপদেশ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"অবিরাম কেবল উপদেশের পর উপদেশ চাহিতেছ। কিন্তু তোমাদের জন্য আমার উপদেশ মুখর হইয়া উঠে কখন জান? যখন তোমরা প্রদত্ত উপদেশকে শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রহণ কর

এবং প্রাণপণ করিয়া তাহা পালন কর। শুধু কথার জন্য কথা বলা ত' বৃথা আয়ুক্ষয় করা। অথবা যে জন সত্য সত্য উপদেশ পালন করে, তাহার জন্য অনেক কথা কহিবারই বা প্রয়োজন কোথায়? উপদেশ শুনিয়া পুনরাদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া না থাকিলে যে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কার্য্যতঃ রূপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহার আর সাধিয়া উপদেশ চাহিতেও হয় না।"

সেবা ও যশোলিপ্সা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"সেবা-বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন সর্ব্ববর্জ্জিত। যাহারা নামের জন্য সেবা করে, তাহাদের সেবা হয় পঙ্গু এবং আতুর। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইহারাও কিছু কাজ করে। কিন্তু যাহারা সেবা করে না, মাত্র যশ খোঁজে, তাহারা অতীব বিলজ্জনক ব্যক্তি। কথার দাপটে সেবা হয় না, হয় কলহ। আর সেবা হয় চিত্তের অকপট সহানুভূতি ও প্রীতির ফলে। অন্তরকে শুদ্ধ কর এবং প্রকৃত সেবক হও। নাম-যশের লোভকে মনের কোণ হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় কর।"

কলিকাতা

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

স্বাধীনতা লাভের পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পন্থা নিয়েই চলেছে যত মতভেদ। নইলে, যেখানে যত দল আর সম্প্রদায় আছেন, সবাই জানছেন যে, স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার এবং এই অধিকারকে লাভ করাই প্রয়োজন। কিন্তু পথ-নির্ণয়ের বেলায়ই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং না ভিন্নম্"—এমন মুনি নেই, যাঁর ভিন্ন একটা মত নেই। অথবা, তিনি মুনিই নন, যিনি ভিন্ন একটা নূতন মতকে প্রচার না করেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমিও ত' একটা সামান্য লোক নই রে, একেবারে আস্ত একটা মুনি, একটা জ্বলজ্যান্ত ঋষি। সুতরাং আমারই বা ভিন্ন একটা মত থাক্‌বে না কেন?

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—আপনার কি মত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মত এই যে, ত্যাগের ভাবকে সুপ্রচারিত না কত্তে পার্‌লে, পরার্থের বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত না কত্তে পার্‌লে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না। য়ুরোপে স্বাধীনতার নাম ক'রে যতবার জনসাধারণের শক্তিকে একত্রিত করা হয়েছে, ততবারই সাধারণের মনকে টেনে নে'য়া হয়েছে যার যার ব্যক্তিগত দুঃখের প্রতি, দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেকের ভোগাধিকারের পানে। কিন্তু ভোগের লোভে কেউ কখনো মৃত্যুকে পদতলে নিষ্পেষিত কত্তে পারে না, যদি কেউ পারে, তবে তা' ত্যাগেরই প্রেরণায়। সমগ্র জাতিকে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত কত্তে যদি পারা যায়, তবেই ভারতবর্ষ জাতিগতভাবে

মৃত্যুলাঞ্ছন হ'তে পার্ব্বে। মৃত্যুকে যারা লাঞ্ছনা দিতে পারে, স্বাধীনতা তারাই পায়। দুঃখকে যারা বুক পেতে নিতে পারে, স্বার্থের দায়ে নয়, পরার্থে,—স্বাধীনতা তারাই পায়।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে একদেশদর্শিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে, দেশমধ্যে যাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলন করেন, তাঁরা যদি দেশের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি প্রভৃতি উন্নতিকে নিষ্প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করেন, তা' হ'লে নিতান্তই ভ্রম করা হবে। কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে ব'লেই যে, সে সমাজ-সংস্কার কর্ব্বে না, পল্লী-সংগঠন কর্ব্বে না, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কর্ব্বে না, এ কোনো কাজের কথাই নয়। রাম একটা স্বাধীনতার দল গ'ড়েছে ব'লেই শ্যামকে তার সাহিত্য-পরিষদ ভেঙ্গে দিতে হবে, যদু একটা স্বাধীনতার দল গ'ড়েছে ব'লেই মধুকে তার দাতব্য-চিকিৎসালয় তুলে দিতে হবে, এ আব্‌দার নিতান্ত গ্রাম্য চাষারই উপযুক্ত, শিক্ষিতের উপযুক্ত নয়। উদার দৃষ্টি চাই, উদার বুদ্ধি চাই,—সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে বড় কাজ হয় না। আমি যতটুকু বুঝ্‌তে পেরেছি, পরমতে সহিষ্ণুতা, পরপথে শ্রদ্ধাবোধ ব্রহ্মচারীরই সহজে হয়। Live and let live মুখে ত' অনেকেই বলে, কিন্তু কাজে তা' পরিণত কত্তে হ'লে গোড়ায় চাই ইন্দ্রিয়-সংযম।

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এই জন্যেই আমি ব'লে

থাকি,—'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র।' হাজার বার আমি এই একটা কথা বলেছি। তোমরা ভেবেছ আমি একটা আস্ত পাগল।—পাগল নই গো, পাগল নই। মাথাটা ঠিক আছে ব'লেই বার বার বল্‌ছি—'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র।' ব্রহ্মচর্য্যই ত্যাগবুদ্ধি দেবে, ব্রহ্মচর্য্যই পরার্থপরতা দেবে, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় জনগণের প্রাণে নিঃশঙ্কতা যোগাবে। ব্রহ্মচর্য্যই পরমতে সহিষ্ণুতার সঞ্চার কর্ব্বে। ব্রহ্মচর্য্যহীন আত্ম-অবিশ্বাসী হয়, কঠিন কাজ কত্তে গেলে বুক তার ধড়ফড় করে, দুরু দুরু ক'রে, শ্রমে সে ক্লান্ত হয়, বুদ্ধি তার চঞ্চল হয়, সঙ্কল্প তার অস্থির হয়, উদার দৃষ্টিতে তার অভাব ঘটে। তাই আমি বারবার বল্‌ছি,—'ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূলমন্ত্র।' বল্‌ছি না, 'ব্রহ্মচর্য্য উদ্ধারের শাখা', বল্‌ছি না,—'কাণ্ড', বল্‌ছি না—'ফুল বা ফল', বল্‌ছি শুধু 'মূল।' ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূল,—এই থেকেই কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, ফুল, ফল সব আকাশের আবহাওয়া বুঝে, যুগপ্রবাহের ধারা বুঝে, কালের গতি বুঝে আপনি বিকশিত হবে। মূল যত শক্ত হবে, বৃক্ষ তত বড় হবে, শাখা-পল্লবাদি তত বেশী হবে, ফল তত সুপুষ্ট হবে, ফুলের তত সৌরভ হবে, ছায়া তত দিগন্ত-বিস্তৃত হবে। ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের উদ্ধারের মূল এবং এই মূলকে আশ্রয় ক'রেই যাবতীয় জাতীয়-উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা সফলতা লাভ কর্ব্বে। যেখানে এই মূলটা উচ্ছৃঙ্খলতার কুঠারঘাতে কাটা যাবে, বিলাস-তারল্যের পঙ্কিল জলে পচে যাবে, সেখানে শাখা, পত্র, ফল, ফুল, সব ধুলায় ধুসরিত হবে।

কলিকাতা
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

ঈর্ষ্যান্বিতের প্রতি কর্ত্তব্য

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"নির্মৎসর ব্যক্তি জগতে খুবই কম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ ব্যক্তিকেই স্নেহ, প্রীতি, প্রেম ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা অনুকূল করা যায়। তখন আর তাহারা তোমার উন্নতিতে ঈর্ষ্যা বোধ করিবে না, কেননা, তোমার উন্নতি তাহাদের চক্ষে নিজ-জনের উন্নতি বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্তু একপ্রকারের মাৎসর্য্যযুক্ত ব্যক্তি দেখা যায়, স্নেহ, প্রীতি, সেবা, দান, সদ্ব্যবহার বা সুমধুর বাক্য প্রভৃতি কোনও কিছু দিয়াই যাহাদের চিত্তজয় করা যায় না। তাহারা প্রতি কার্য্যে দোষ অনুসন্ধান করিবে, প্রতি ব্যাপারে ছল খুঁজিবে। উপকৃত হইয়াও তাহা অস্বীকার করা এবং উপকার না করিয়াও তাহারই দাবী করা ইহাদের চরিত্রের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। এ জাতীয় লোকের সংসর্গ ও সংশ্রব যত্নতঃ বর্জ্জন করিবে, নতুবা ইহাদের এইসকল জঘন্য দোষ ও ইতর মনোবৃত্তি তোমার ভিতরে ক্রমশঃ আসিয়া সংক্রামিত হইবে। নিজের চরিত্রে যাহাতে ঈর্ষ্যা, পরনিন্দা, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, পর-দোষাবিষ্কারের রুচি প্রভৃতি অমানুষোচিত নীচতা না প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই ইহাদের সংশ্রব বর্জ্জন করিবে, ইহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ

নহে। কেননা, যে যাহাকে বিদ্বেষ করে, নিজের অজ্ঞাতে সে তাহার দোষ আহরণ করে। ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবে শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়।”

কলিকাতা
২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

বিক্রমপুর-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণবংশীয় যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত গ্রন্থাদি পড়িয়া এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, সংসার ত্যাগ করিয়া জগৎকল্যাণে আত্মসমর্পণের প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার জাগ্রত হইয়াছে। তাঁহার একখানা পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি নিম্নলিখিত পত্রখানা লিপিবদ্ধ করিলেন ঃ—

ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন

“* * * জানিও, যে দেশে একজন ভগবান্ বুদ্ধের, একজন আচার্য্য শঙ্করের, একজন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, সেই দেশে শত শত ভগবান্ বুদ্ধের, শত শত আচার্য্য শঙ্করের, শত শত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। যে স্তন্য-দুগ্ধে বুদ্ধদেবের শৈশব-তনু বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে গাঙ্গ্য-বারি-নিবহে শঙ্করাচার্য্যের পুণ্য কলেবর ব্রহ্মজ্ঞান-পরিশুদ্ধ হইয়াছিল, যে প্রেমমাখা মলয়-মারুত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাবের পাগল করিয়াছিল, আজও তাঁহা এদেশে আছে। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যের জননীরা আত্মবিস্মৃত হইয়া মোহশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিলে কি হয়, আজও তাঁহাদের জীবন-

স্পন্দন থামিয়া যায় নাই, আজও তাঁহাদের সাধনার দীপ্তি নিভিয়া যায় নাই। সুতরাং একথা বিশ্বাস করিতে কখনও কৃপণ হইও না যে, তুমিও একদিন শ্রীবুদ্ধের ন্যায় জীবসুখার্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তুমিও একদিন শ্রীশঙ্করের ন্যায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বজ্রনাদে অপধর্ম্ম ও অজ্ঞানকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে, তুমিও একদিন শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমের টানে পথের ফকীর হইয়া অনাথের ন্যায় বৃন্দাবনের পবিত্র ধুলিতে “হরি হরি” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিতে পারিবে।

ত্যাগের সহিত সংস্কৃতাধ্যয়নের সম্পর্ক

“এই সমুন্নত অবস্থা লাভের সঙ্গে সংস্কৃত পড়া না-পড়ার কোনও সম্পর্ক নাই। সংস্কৃত পড়িয়াও মানুষ ত্যাগী হইয়াছে, না-পড়িয়াও হইয়াছে। সংস্কৃত পড়িয়াও মানুষ জ্ঞানী হইয়াছে, না-পড়িয়াও হইয়াছে। সংস্কৃত পড়িয়াও মানুষ ভক্ত হইয়াছে, না-পড়িয়াও হইয়াছে। জীবন যদি দানই করিতে চাও, তাহা হইলে সংস্কৃত পড়িলেও দিতে পারিবে, না পড়িলেও দিতে পারিবে। যাঁহার পদতলে নিজেকে বলি দিতে চাও, তাঁহাকে তুমি কতটা বিশ্বাস কর, ইহাই হইতেছে আসল কথা। যতটা তুমি বিশ্বাস কর, ততটাই আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, বেশী পারিবে না। আরাধ্য দেবতায় যার বিশ্বাস অপ্রচুর, চেষ্টা সে যতই করুক না কেন, তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণও তার অপ্রচুর। আরাধ্যে যাহার বিশ্বাস অফুরন্ত, অপরিমেয়, তাহার আত্মসমর্পণও

অফুরন্ত, অপরিমেয়। বিশ্বাসের পরিমাণই এখানে জীবন-দাতার ভাগ্য-নিরূপণ করিতেছে, সংস্কৃত-বিদ্যার প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্য নহে। সুতরাং আজ সর্ব্বপ্রথমেই প্রাণের পুরে অন্বেষণ করিয়া দেখ, যাঁহার জন্য আত্মাহুতি দিতে চাহিতেছ, তাঁহার প্রতি তোমার আস্থা কতখানি, তাঁহার উপরে তোমার নির্ভর কতটুকু।

ত্যাগ-পথের বন্ধুরতা ও আত্ম-পরীক্ষা

"কিন্তু নর-নারায়ণের সেবার পথ ত' কুসুমাস্তৃত নয় বাপধন। এ পথে কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত হতাশা-নিরাশার সহিত সংগ্রাম, কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত পতন-ভয়, তাহাও ভাবিয়া দেখিও। এ পথের বন্ধুরতা কতবার হয় ত' চরণ-ক্ষত উৎপাদন করিবে, এ পথের পিচ্ছিলতা কতবার হয়ত পদস্খলিত করিতে চাহিবে, এ পথের দুর্গমতা ও বিভীষিকা কতবার হয়ত তোমাকে ভীত, ত্রস্ত ও পরাঙ্মুখ করিতে চাহিবে, তাহার বিচার করিও। কতবার হয় ত' নিজেকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলিয়া মনে হইবে, দুঃখ-বরণের গৃহীত কল্যাণ-পন্থাকেও অকল্যাণের আকর বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে,—তাহাও চিন্তা করিও। জ্বলন্ত অগ্নির লেলিহান স্বর্ণ-রসনার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া পতঙ্গ যেমন হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া ছুটিয়া আসে, গৈরিকের সৌন্দর্য্যটুকুতে মুগ্ধ হইয়া তোমাকেও সেভাবে নির্ব্বিচারে ছুটিয়া আসলে চলিবে না। তোমাকে যদি আসিতে হয়, তবে আসিতে হইবে বিচার করিয়া, নিজের সকল দিকের সকল ভাল-মন্দ,

সকল শুভাশুভ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া, নিজের প্রাণের প্রার্থনা ও দেহের প্রার্থনার মধ্যে কোন্‌টীর দাবী অধিকতর সঙ্গত ও বৈধ, তাহা নিক্তির কাঁটায় মাপিয়া জুখিয়া। আজ, তুমি গৈরিকের পতাকাতলে আশ্রয় লইতে চাহ,—বেশ কথা। কিন্তু বাছা, নিজেকে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে কি, এই পতাকাতলেই তোমার চরম উন্নতি কিনা? দ্বাদশ বৎসর গৈরিকের ছায়ায় বাস করিয়া পরে আসিয়া ওকালতী করিবার সনদ লইয়াছে, এমন নজির যথেষ্ট আছে। ইহা কিসের ফল জান? অধিকাংশ স্থলেই ইহা আত্মপরীক্ষার অভাবের ফল। সুতরাং আজ সর্ব্বপ্রথমে আত্মপরীক্ষা কর, আজ প্রথমে নিজেকে বুঝ, নিজের রুচি, প্রকৃতি, সামর্থ্য ও সংস্কারসমূহকে সতর্ক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন কর। তারপরে স্থির করিও তোমার জীবনের উপরে সন্ন্যাসকে জয়ী হইতে দিবে, না সংসারকে।

সন্ন্যাসে কি শুধুই দুঃখ

"—'কৌমার্য্যের পথ যে কেবল দুঃখের পথ, তাহা আমার মনে হয় না। শ্রীভগবানে আত্মদান করিয়া নর-নারায়ণের সেবা করা যদি দুঃখ হয়, তবে কেমন করিয়া মানুষ ভগবানের নামে পাগল হয়? কৌমার্য্যের পথ সুখ-বিলাসীর পথ না হইতে পারে, কিন্তু কেবলই দুঃখের নহে।'—তোমার এই কয়টি কথা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার এই কথা গুলিতে সত্যের ঝঙ্কার আছে এবং জানিও সত্যের জয় সর্ব্বত্র।"

গড়িয়া পিটিয়া সন্ন্যাসী হয় না

শ্রীযুক্ত স—উল্লিখিত পত্রখানা নকল করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যুবকটীর সহিত কি আপনার পরিচয় আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখা শুনার পরিচয় নাই, পত্রে-পত্রেই যা' পরিচয়।

স।—এতেই তার এত আগ্রহ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এখন দেখ্‌ছিস্ কি! লক্ষ লক্ষ নরনারী একদিন পাগল হ'য়ে ছুটে আস্‌বে, ভগবানের কাজ মাথা পেতে নেবার জন্য। আস্‌বে কি তারা ত্যাগের মহিমা-কীর্ত্তন শুনে? তারা আস্‌বে, নীরব ত্যাগীর শুদ্ধ ইচ্ছার আকর্ষণে। জবরদস্তি ক'রে কাউকে কি ত্যাগী করা যায়? মানুষ ত্যাগী হয়, যার যার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্তিতে, নিজের স্বাভাবিক সংস্কারের পরিপাকে।

কলিকাতা
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

শূদ্রান্নভোজন ও জাতিচ্যুতি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা আকুবপুর-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকটে লিখিলেন ঃ—

" * * * ব্রাহ্মণ হইয়া সূত্রধরের বাড়ী খাইলে অপরাধ হয় বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং

সূত্রধর, নমঃশূদ্র, কপালী প্রভৃতি অনাচরিত জাতিকে আমি পৃথক্ শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করি না। ইহাদের প্রত্যেককেই আমি মানুষ বলিয়া মনে করি এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের দায়ে আমি আবদ্ধ, এই কথাই বিশ্বাস করি। সদাচারী সূত্রধরের অন্ন খাইলে আমার জাতি যায় না, কিন্তু দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের ছায়া-স্পর্শেও জাতি যায়। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্নগ্রহণে সাধন-ভজনের কোনও ক্ষতিই হয় না,—সে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্ম যে বংশেই হউক না কেন। পরন্তু পরস্বাপহারী, অসরলচেতা, অসযতবুদ্ধি, মদ্যপ, লম্পট যদি ব্যাস-বশিষ্ঠের ঔরসেও জন্মিয়া থাকে ; তাহার স্পৃষ্ট এক কণা গঙ্গা-জলকেও আমি সাধন-ভজনের বিঘ্নকারী বলিয়া মনে করি। ছোট জাতের বাগানের ফুলটা দেবপূজায় লাগিতে পারিবে না, এমন মিথ্যা কুসংস্কার আমার নাই। যে ফুলটা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাহাকে কীটে দংশন করে নাই, কোন বিলাসীর নাসিকা যাহার গন্ধের ঘ্রাণ লয় নাই, তেমন ফুল যার বাগানেই ফুটুক, জানিও আমার দেবতারই পদতলের সে অঞ্জলি। তের হাত লম্বা দাড়ি, সতের হাত লম্বা পৈতা এবং পঁচিশ হাত লম্বা টিকীর গর্ব্বকারী, ব্রহ্মজ্ঞানবিমুখ, কল্যাণ-কর্ম্ম পরাঙ্মুখ, দাম্ভিক বড় জাতের বাগানে জন্মিয়াছে বলিয়াই যে অস্ফুটিত, কীটদষ্ট, পীত-মধু, পূর্ব্বাঘ্রাত ও পাদস্পৃষ্ট ফুলটাকে মাথায় লইয়া নাচিব, এমন অন্ধ কুসংস্কারের দাসত্ব করিবার অনুরাগ আমার নাই।

বংশগত আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব

"বংশগত আভিজাত্য টিকাইবার জন্য যত প্রয়াস হইতেছে, তন্মধ্যে উৎকর্ষকে বংশানুক্রমিক করিবার চেষ্টা নাই। এই জন্য আমি বর্ত্তমান বংশগত আভিজাত্যকে মানি না। বর্ত্তমান সমাজে যত স্থানে ঔৎকর্ষ্য-লাভের চেষ্টা হইতেছে, সর্ব্বত্র ইহা ব্যক্তিগতভাবেই চলিতেছে। পিতার চরিত্রবল পুত্রে সংক্রামিত হইতেছে না, ধার্ম্মিক পিতার পুত্র হইতেছে হয় বক-ধার্ম্মিক নতুবা পরম অধার্ম্মিক। পিতার লোকবিস্ময়কর ক্ষাত্র-বীর্য্য ও স্বাদেশপ্রীতি সন্তানে বর্ত্তিতেছে না, বীরেন্দ্র-কেশরীর পুত্র হীন-বীর্য্য কাপুরুষ হইয়া জন্মিতেছে, দেশের জন্য যিনি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছেন বা নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, তাঁর পুত্র লইতেছে গুপ্তচরের চাকুরী। দাতার পুত্র কৃপণ হইতেছে, জ্ঞানীর পুত্র মূর্খ হইতেছে, উদারচেতা লোকপাবন মহাপুরুষের পুত্র হীনচেতা সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি দেশদ্রোহী কুলাঙ্গাররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই আমি কৌলীন্যকে মানি ব্যক্তিগতভাবে, বংশগতভাবে নহে। দিন কয়েক হইল কলিকাতার একজন জ্ঞানবৃদ্ধ কায়স্থ-সন্তান * হিন্দু-মহাসভা দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। এখানে আভিজাত্য ব্যক্তিগত, বংশগত নহে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মান্য করা হয় কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্নকে কেহ অবতার বলে নাই। বুদ্ধদেবের কোটি কোটি

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পূজা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তিনিও ঈশ্বরাবতার বলিয়া অর্চ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু কই তাঁহার পুত্র রাহুলকে ত' কেহ অবতারও বলে নাই বা মূর্ত্তি রচিয়া পূজাও করে নাই। এখানেও আভিজাত্য ব্যক্তিগত, বংশগত নহে। পরমহংস রামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার এক জ্ঞাতি-শ্বশুর আসিয়াছিলেন, গিরীশ ঘোষ বলিলেন,—'ঠাকুরকে প্রণাম কর,'—রামকৃষ্ণ বলিলেন,—'ও যে আমার শ্বশুর।' গিরীশ ঘোষ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—'রামকৃষ্ণের বাপও যদি আসিতেন, তবে তাঁহাকেও রামকৃষ্ণের পায়ের তলায় একবার লুটাইয়া তবে ছাড়িতাম।' এখানে রামকৃষ্ণেরও যে আভিজাত্য, তাহা ব্যক্তিগত, বংশগত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কৌলীন্যের কারণ নহে, পরন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনই তাঁহাকে ত্রিলোকপূজ্য করিয়া রাখিয়াছে এবং অপূর্ব্ব ব্যক্তিগত আভিজাত্যশালী মহামানবের জন্মই জগন্নাথ মিশ্রের বংশকে ধন্য করিয়া দিয়াছে। চিরকাল জগতে ব্যক্তিরই জয় ঘোষিত হইয়াছে, বংশের নহে। যখন দেখা গিয়াছে যে, একই বংশ হইতে পর পর অনেকগুলি উন্নতশির মহা-মানবের আবির্ভাব হইতেছে, তখনই দেশ, জাতি বা সমাজ ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সমগ্র বংশটাকে বড় বলিয়া মানিয়াছে। মেবারের শিশোদীয় রাজপুত বংশের একটা অপূর্ব্ব আভিজাত্য একদিন সৃষ্ট হইয়াছিল—বাপ্পারাও হইতে আরম্ভ করিয়া রাণাপ্রতাপ পর্য্যন্ত কতকগুলি অদ্ভুত-কীর্ত্তি স্বদেশপ্রাণ মহাবীরের ব্যক্তিগত

জীবনের জন্য। আজ হয়ত মেবারের রাণা হল্‌দিঘাট কোথায় জানেন না। অর্থাৎ ঐরাবতের বংশে গন্ধ-মুষিকের উদ্ভব অসম্ভব হয় নাই। কৌলীন্যকে যদি বংশগতই রাখিবার হইত, তাহা হইলে নিষ্কপট কণ্ঠে বলিতে হইবে, ভারতবর্ষ অবনতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজের ঔরসের দোহাই দিয়া মিথ্যা আভিজাত্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা রক্ষণশীলগণের মধ্যে চলিতেছে, তাহা যদি বিজয়শ্রীমণ্ডিত হইবার হইত, তবে বলিতে হইবে, ভারতের প্রলয়ের কাল সমীপবর্ত্তী। মোগল আমলের টাকা ও মোহর ইংরেজের আমলে চলে না, কিন্তু মোগল আমলের সোণা ও রূপা সকল আমলেই চলে। প্রাচীন আমলের ব্রাহ্মণ নূতন আমলে চলিবে না কিন্তু প্রাচীন আমলের ব্রাহ্মণত্ব সকল আমলেই সম্মানিত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব বংশগত নয়, ইহা তপোলভ্য, সুতরাং, ব্যক্তিগত। বশিষ্ঠ জন্মিয়াছিলেন বেশ্যার উদরে, ব্যাস জন্মিয়াছিলেন মেছুনীর জঠরে, সত্যকাম জাবালি জন্মিয়াছিলেন ধর্ম্মশালার পান্থ-সাধারণের সেবা-দাসীর গর্ভে। তথাপি প্রাচীন যুগ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। বিশেষ বিশেষ বংশে জন্ম দৈবাধীন ব্যাপার, সুতরাং ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইতে পারে না, স্থলবিশেষে সহায় হইতে পারে বটে। কিন্তু তপস্যা বংশগত নহে, উহা ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্যের ব্যাপার, অতএব ব্রাহ্মণত্বের কারণ। আমরা যখন কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সত্ত্বগুণাশ্রয়ী অপরাজেয়

পুরুষকারকেই প্রণাম করি। ভ্রান্ত পথ-পরিচালিত দৈব নির্ভরশীলতা ও মুণ্ডহীন অদৃষ্ট-বিশ্বাস এই হতভাগ্য জাতিকে পুরুষকার-বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই সত্য-যুগের ঋষিদের দোহাই দিয়া কলিযুগে কৌলীন্য আদায়ের ফন্দী রচনায় প্ররোচিত করিতেছে। যেদিন চেষ্টা ও আলস্যশূন্যতা ভারতবাসীর নিকটে তাহাদের প্রাপ্য সেবা ও মর্য্যাদালাভ করিবে, সেইদিন দেখিও তথাকথিত কুলীনেরাই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা কুলীন নহেন। নিজেরাই তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিলে অনেক সময়ে কর্ম্মকুণ্ঠা ও উৎসাহহীনতাই আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং অবনতির গভীর পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। তখন নিজেরাই তাঁহারা প্রত্যেকে আসিয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিবেন,— 'আমি ব্রাহ্মণ নহি, কেন না, আমার জীবন-গৌরব আমার তপস্যায় সঞ্জাত নহে, আমার ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব-গরিমার পশ্চাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য নাই।'

জাতিভেদ ও বর্ত্তমান সমাজসংস্কার

"উচ্চবংশীয়েরা তথাকথিত নিম্নবংশীয়দিগের অন্ন খাইবেন কিনা তাহা সমাজ-সংস্কারীদের জাতি-ভেদ-নিন্দার জয়-ঢক্কা-রবের উচ্চতা বা নিম্নতার উপরে নির্ভর করে না। সকলকে লইয়া এক পংক্তিতে খাইলেই যে প্রকৃত একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে, ইহাও মনে করিও না। একত্র ভোজন স্থল-বিশেষে

প্রেমের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বস্থলের প্রেমের জনক নহে। কখনও ইহা হুজুগের প্রশ্রয়দাতা, কখনও ইহা ভণ্ডামির প্রবর্দ্ধক, কখনও বা ইহা প্রকৃতই প্রাণ-স্পন্দনের আহরক। বাহিরের ব্যবহার কখনও ভালবাসার আবরক, কখনও বা ব্যঞ্জক। প্রকৃতই যখন আমরা জাতিতে জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হইব, এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করা তখন আমাদের সাম্যবোধের একটা লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তোড়জোড় বাঁধিয়া কোনও প্রকারে এই লক্ষণটীর একটা প্রদর্শনী করিতে পারিলেই যে সাম্য আসিবে, তাহা নহে। জাতিভেদ-বিদূরণ সাম্যের প্রাণ নহে, খোসা মাত্র। প্রাণের যেদিন সন্ধান পাইবে, প্রাণকে সেদিন তার সমগ্র শক্তি প্রয়োগের সৌকর্য্য দান করিবার জন্য এই খোসাটাকে দিয়া ঢাকিতে হইতে পারে। বুদ্ধ শঙ্করের আত্মার অপরিমেয় শক্তি তাঁহাদের দেহের আবরণকে অস্বীকার করে না। যদিও দেহটা মাটীর তৈয়ারী একটা খোসা মাত্র, তথাপি আত্মার অমিত শক্তি বিকাশের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। যেদিন প্রকৃত সাম্যবোধ জাগিবে, সেদিন জাতিভেদ আপনিই বিদূরিত হইবে, পরন্তু জাতিভেদ দূর করিলেই সাম্য আসিবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা নিরূপণ সুকঠিন।

জাতিভেদ ও ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি

"সমাজগতভাবে জাতিভেদের সমর্থন বা প্রতিবাদ করিবার উপায় ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে নাই, কারণ, উহা সমাজের সমষ্টিগত

অধিকার। একজনের অধিকারের উপরে আর একজনের হস্তক্ষেপ করা স্বাধীনতা ধর্ম্মের বিরোধী। সমাজ যতদিন পর্য্যন্ত সমষ্টিগতভাবে জাতিভেদের প্রতিকূল না হইতেছে, ততদিন সমাজের সমষ্টি-শক্তির উপরে ব্যক্তি বিশেষের বল, প্রভাব বা প্রতিপত্তির প্রয়োগ একপ্রকার নিরর্থক, কেন না, তাহাতে জাতিভেদের জড় মরিবে না, উৎপাটিত বৃক্ষের ছিন্ন-ভিন্ন মূলগুলি হইতে নূতন নূতন পত্রাঙ্কুর সামান্য বর্ষার আনুকূল্য পাইলেই গজাইয়া উঠিবে। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে যদি জাতিভেদকে ক্ষতিকর বলিয়া জানিয়া থাক, ছেঁড়া চটী জুতার ন্যায় ইহাকে বর্জ্জন কর, কলেরা রোগীর মলমূত্রাদিলিপ্ত ছিন্ন কন্থার ন্যায় ইহাকে পরিত্যাগ কর। তোমার এই বর্জ্জন-ব্যাপারে আমি তোমার সমর্থক জানিও। আর যদি জাতিভেদকে সমাজিক সুশৃঙ্খলতার উৎকৃষ্টতম আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে জানিও, তোমার জাতি-ভেদ-সমর্থন ব্যাপারেরও আমি বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

স্বাধীনতা

"আমি স্বাধীনতার মন্ত্র লইয়া আসিয়াছি। তোমার স্বাধীন-চিন্তা, স্বাধীন লক্ষ্য ও স্বাধীন অনুভূতি তোমাকে যে পথে পরিচালিত করিবে, জানিও, তোমার জন্য সেই পথই আমার একান্ত প্রসংসিত পথ। হত্যাও যদি করে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় করুক, পরন্তু পরবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া সে জীবনের পথে চলিতেও যেন বিরত হয়। আমার ধর্ম্ম স্বাধীনতা,—অন্তরের ও

বাহিরের স্বাধীনতা,—ভাব, ভাষা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা। দশজনে যাহা করে, তাহাই যে আমাকে করিতে হইবে, ইহা—আমি মানি না। আমার প্রাণ আমার সহজ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাহা চাহে, আমি তাহাই মানি। (অবশ্য, আমার এই সহজ বুদ্ধি ভগবৎ-সাধনার দিব্য প্রভাবে অক্ষতযোনি কুমারীর দেহের ন্যায় নিত্য-পবিত্র থাকুক, ইহাও আমি কামনা করি।) অপরের কথা যখন আমি মানিতে বসি, তখন তাহাকে আমার স্বাধীন-বিচারের নিকষ-পাষাণে কষিয়া গ্রাহ্য মনে করিলেই মানি। তোমরা আজ এই স্বাধীন বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হও এবং জাতিভেদ বা অপরাপর বিষয়ে নিজ নিজ উপলব্ধির উপদেশ শুনিয়া অগ্রসর হও। (অবশ্য, তোমাদের এই স্বাধীন বুদ্ধি সুবিধাবাদের আশ্রয় লইয়া কুলটা নারীর ন্যায় স্বৈরিণী ও বহুগামিনী না হয়, তাহার জন্য ভগবৎ সাধনার মধ্য দিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।) আমি জাতি-ভেদ মানি না, এই যুক্তিতে নির্ভর করিয়া যদি তোমরা উহা না মানিতে চাহ, তবে তাহা আমার সন্তোষের কারণ হইবে না। কিন্তু তোমাদের স্বাধীন-বুদ্ধি যদি তোমাদিগকে আমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবহারেও প্রণোদিত করে, তবে জানিও, স্বাধীনতার কৈফিয়তে তাহাকেও সম্মান করিব এবং তোমাদের জন্য তাহারও অনুমোদন করিব।

জাতিভেদ ও শিক্ষাপ্রচার

"এক হিন্দু অপর হিন্দুকে ঘৃণা করে, ইহা দারুণ দুর্গতির

লক্ষণ। এই দুর্গতিকে দূর করিতেই হইবে। দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষার প্রচার। ভগবৎ-কৃপায় তোমার উপরে শিক্ষা প্রচারেরই ভার পড়িয়াছে। জ্ঞান-ভাণ্ডারের রুদ্ধ-দুয়ার সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিবার পরম শ্লাঘ্য অধিকার তুমি লাভ করিয়াছ। এই অধিকারের তুমি প্রকৃষ্টতম সদ্ব্যবহার কর। জ্ঞানের আগুন একবার যদি জ্বালিতে পার, বর্ত্তমান জাতিভেদের এই মিথ্যাচারময় দীর্ঘকালজীর্ণ জতুগৃহ ভস্মীভূত হইতে কয় মুহূর্ত্ত লাগিবে? সূর্য্যোদয়ে যেমন কুজ্ঝাটিকা থাকে না, বিদ্যোদয়ে তেমনি কুসংস্কারের অবসান হইবে।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও সমাদর

"স্ত্রীলোকদের শিক্ষা আমি অত্যাবশ্যকীয় বলিয়াই মনে করি। আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরাও এইরূপই মনে করিতেন। বৈদিক যুগে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন যুগে ছিল এবং পরবর্ত্তী যুগে স্বাধীন হিন্দুরাজদিগের সময়েও ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় আছে। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত জনক-রাজ-সভায় যে বিচার করিয়া ছিলেন, তাহা উচ্চতম সুশিক্ষার পরিচায়ক। বলিতে কি, তৎকালে যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত অপর কেহ ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর সমকক্ষই ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য যখন মৈত্রেয়ীকে যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—'যেনাহং নামৃতা

স্যাম্, তেনাহং কিং কুর্য্যাম্?'—অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিব না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ইহা দ্বারাও মৈত্রেয়ীর সুশিক্ষার পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে এবং গোভিল-গৃহ্যসূত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, স্ত্রীলোকগণেরও উপনয়ন হইবে। ইহা দ্বারা বৈদিক যুগে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচলন প্রমাণিত হয়। পরবর্ত্তী যুগেও বহু শাস্ত্রগ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষার অনুশাসন রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ' শ্লোকটি ব্রাহ্ম-সমাজের চেষ্টায় বিশেষভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। রামের রাজ্যাভিষেক কালে কৌশল্যা বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহুতি প্রভৃতি দিয়াছিলেন এবং বালি সুগ্রীবের যুদ্ধকালে বালি-পত্নী তারা বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের এক স্থানে আছে যে, এক ঋষি-পত্নী তাঁহার পুত্রকে সকল কলা ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন; অন্যত্র আছে যে, এক রাজ্ঞী ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেন। রাজর্ষি জনক সন্ন্যাসের জন্য পাগল হইলে তাঁহার পত্নী বেদাদি শাস্ত্রানুযায়ী উপদেশ দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন এবং সুলভা নাম্নী এক ব্রহ্মচারিণী জীবন্মুক্ত জনককেও ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশসমূহ দান করিয়াছিলেন। বিদুলা স্বীয় পুত্রকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দেন, মদালসা স্বীয় পুত্রগণকে ব্রহ্মবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দেন। মহাভারতে বহু স্থলেই দ্রৌপদীকে পণ্ডিতা

বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে,—সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদীর উপদেশ নিচয়েও যথেষ্ট সুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী, ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী, কালিদাসের পত্নী বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে কর্ণাটরাজপত্নী এত বড় বিদুষী ছিলেন যে, মহাকবি কালিদাসও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। মুসলমান যুগেও হিন্দুনারীদের মধ্যে বিদুষী জন্মিয়াছিলেন—মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, সহজীবাঈ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঞ্জোরাধিপতি রঘুনাথের সভাতে শত শত বিদুষী ছিলেন, মধুরবাণী নাম্নী মহিলা তন্মধ্যে সর্ব্ববরেণ্যা ছিলেন। আমাদের শাস্ত্র এবং ইতিহাস উভয়ই স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থন করিতেছে, সুতরাং নূতন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থনের কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনেই করি না।"

গুরু ও ব্রহ্ম

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি ভ্রমণ-ব্যপদেশে কতিপয় ভক্তের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—দাতার মধ্যে জ্ঞানদাতা শ্রেষ্ঠ, তাই গুরু পূজ্য। কিন্তু যিনি অনন্ত জ্ঞানের খনি, সেই ব্রহ্মই তোমার উপাস্য। গুরুতে এবং ব্রহ্মেতে স্বাভাবিকভাবে যদি কখনো অভেদবুদ্ধি আসে, আসুক, ক্ষতি দেখি না। কিন্তু যাকে মানুষ ব'লে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, যার জীবনের সসীমত্ব প্রত্যক্ষ বুঝতে পাচ্ছ, তাকে ব্রহ্ম ব'লে ধারণা কর্ব্বার মিথ্যা

চেষ্টা ক'রো না। তাতে কারো মুক্তি হয় না,—"মুক্তির্নজায়তে দেবি, মানুষে গুরুভাবনাৎ।" উপদেষ্টা, হিতকারী ও পথ-প্রদর্শক ব'লে ভাবাই যথেষ্ট। তোমরা দীক্ষা নেবার আগেও আমি ব্রহ্ম ছিলাম। তোমরা আমায় পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলেও আমি ব্রহ্ম থাক্‌ব। কিন্তু সে ত' আমার উপলব্ধির কথা। দীক্ষাদান ব্রহ্ম হবার কোনো যুক্তি নয়। তোমরা এখানে দীক্ষা পেয়েছ, তাই ব'লে কি একেবারে ব্রহ্ম হ'য়ে গেলাম? যিনি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই, তিনিই ব্রহ্ম। যখন যাঁকে অদ্বিতীয় ব'লে জানবে, তখন তাঁকেই বহ্ম ব'লো। কিন্তু যার দ্বিতীয় আছে, তাকে কখনো ব্রহ্ম ব'লো না,—যতক্ষণ দ্বিতীয় আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম ব'লো না। বল্‌লে ঠক্‌বে। তোমার গুরু কে? না যাঁর কাছে তুমি স্বভাবতঃ লঘু, যাঁর সৎসঙ্গ তোমার আত্মাভিমান দূর করে, যাঁর পাদস্পর্শ তোমার পক্ষে সহজজ্ঞানদায়ী। গুরু মিলে ক'জনার? গুরু চেনে কয়জনে? উপলব্ধি কর্‌বার ক্ষমতার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের নাম নেই, শুধু "গুরু"—"গুরু" ব'লে কোলাহল! "গুরুই ব্রহ্ম"—ব'লে শুধু চেঁচালে কি হবে? আগে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ হ'তে হবে, মনে মুখে এক হ'তে হবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড না যতক্ষণ গুরুময় হচ্ছে, ততক্ষণ আবার মানুষ-গুরু কিসের ব্রহ্ম? সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, ত্রাসে, ত্রাণে, সঙ্কটে, উদ্ধারে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় যতক্ষণ না হৃদয়ের মধ্যে গুরু-কৃপার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে, ততক্ষণ আবার কিসের ব্রহ্ম? মানুষকে মানুষ ব'লেই যতক্ষণ মনে

হচ্ছে, ততক্ষণ প্রাণ গেলেও স্বীকার ক'রো না গুরুই ব্রহ্ম।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুরুর মধ্যেও কি ব্রহ্ম-সত্তা নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে। কিন্তু তোমার মধ্যেও কি ব্রহ্ম-সত্তা নেই? গুরুর মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে ব'লে তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু তোমার মধ্যেও ত' ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে, তুমিও কি ব্রহ্ম নও? ব্রহ্ম সবাই,—গুরুও ব্রহ্ম, শিষ্যও ব্রহ্ম। তবে যথার্থ গুরুর ভিতরে ব্রহ্মের প্রকাশটা খুব নির্ম্মল, খুব উজ্জ্বল, কারণ আধারটা তাঁর স্বচ্ছ ও তপঃশুদ্ধ। তুমিও সাধন কর, তোমার আধার স্বচ্ছ হবে, দেহমন ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণের যোগ্য হবে।

কলিকাতা

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

নাম-সাধন ও ধ্যানকালীন রূপ-বৈচিত্র্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক যুবকের বিস্তারিত এক পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—"অখণ্ড-নাম কোনও সাম্প্রদায়িক নাম নহে, ইহা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমিক নাম; ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় নহে, ইহা সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়। শাক্তমন্ত্র জপ করিতে করিতে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করা চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান চলে। কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে কালীমূর্ত্তি ধ্যান চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে কালীমূর্ত্তি ধ্যানও চলে। শিব-মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্যান চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ

করিতে করিতে তাহা চলে। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম জপ করিতে করিতে শিবমূর্ত্তি ধ্যান চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে তাহা চলে। রাম-নাম জপ করিতে করিতে যীশুমূর্ত্তি ধ্যান চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে তাহা চলে। হনুমান-মন্ত্র জপ করিতে করিতে জননীমূর্ত্তি ধ্যান চলে না, কিন্তু অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে তাহা চলে। সাকার দেবতার মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিরাকার-চিন্তন চলে না, অখণ্ড-নাম জপ করিতে করিতে তাহা চলে। শ্রীভগবানের অফুরন্ত রূপ; নিজ নিজ চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া, প্রাণের অভাব বুঝিয়া, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভগবানের বিভিন্ন রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়, মানব-মনের ইহা ক্রম-পরিণতির স্বভাব, ইহা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বা অপরাধ নহে। একমাত্র অখণ্ড-নাম দিয়াই বিভিন্ন অবস্থার রুচির তৃপ্তি ও বিভিন্ন রূপের ভজনা হয়। একজন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ বা জৈনের এক অংশে শিবধ্যানী, অপর অংশে কৃষ্ণধ্যানী, তৃতীয় অংশে খ্রীষ্টধ্যানী, চতুর্থ অংশে বুদ্ধধ্যানী হওয়া অপরাধ, কিন্তু অখণ্ডের পক্ষে তাহা নহে। অখণ্ড-সাধক নামকে মূল জানে, সাধনকে কাণ্ড জানে এবং 'রূপ'কে শাখা জানে। একটী মূল হইতেই শত শত শাখা জন্মে,—অখণ্ড-সাধক মূলকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে এবং মূলের ধর্ম্মে যে সকল শাখা-প্রশাখা যখনই যেভাবে উদ্‌গত হউক, তাহাদের অবমাননা করিতে বিরত থাকে। .... কুলবতী সতী নারী যেমন শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, অতিথি প্রভৃতি

সকলেরই প্রাণপণ সেবা-পরিচর্য্যাদি করে, কিন্তু স্বামী ছাড়া আর কাহারও শয্যাসঙ্গিনী হয় না, অখণ্ড-সাধকও তেমনি নিজ প্রাণের রুচি বুঝিয়া যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন রূপের ধ্যান করে কিন্তু অখণ্ড-নাম ব্যতীত অন্য নাম জপ করে না।"

গুরু ও অভয়

বৈকাল বেলা ভ্রমণ-কালে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার কাছে যেতে ভয় আসে, তিনি আবার গুরু কিসের? গুরু হবেন অভয়দাতা, গুরু হবেন সন্তাপহারী, গুরু হবেন প্রাণের প্রাণ আপনার জন। গুরু কি বাঘ না গণ্ডার, যে, তাঁকে ভয় কত্তে হবে। গুরু তাঁর মুখের একটী সামান্য কথায় শিষ্যের প্রাণের সমস্ত তাপ প্রশমন করেন। কি ক'রে করেন, জানিস্? তাঁর অভয়-দানের শক্তি দিয়ে।

কলিকাতা
৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

বিগ্রহের প্রাণ

কতিপয় ভক্ত সমাগত হইলে দেবপূজা সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ কি বিগ্রহকে পূজো করে? না তা' নয়। সে পূজো করে নিজেকে। পূজক যখন বিগ্রহের মধ্যে ব্রহ্মভাব আরোপ করে, তখনই বিগ্রহ-পূজা হয়, নইলে ত' আর হয় না। এই ব্রহ্মভাব আরোপ করাকেই বলে

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বিগ্রহে যতক্ষণ ব্রহ্মভাব আছে, ততক্ষণই তার পূজা, যাই ব্রহ্মভাব টুটে গেল, অমনি বিগ্রহটা হ'য়ে গেল ইট, মাটি আর পাথর। দলে দলে ভক্ত এসে তোমার দেবতার পায়ে নতি জানায়, তার মানেটা জান? তুমি প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে তোমার বিগ্রহের মধ্যে ব্রহ্মভাব আরোপ করেছ, তোমার সেই অপূর্ব্ব শক্তিমত্তাকে সম্মান কর্ব্বার জন্যেই দলে দলে তীর্থযাত্রী ছুটে আসে। তুমি প্রেমবিগলিত প্রাণ দিয়ে তোমার বিগ্রহের মধ্যে ব্রহ্মভাব আরোপ করেছ, তোমার অপূর্ব্ব প্রাণবত্তাকে পূজা কর্ব্বার জন্যেই দলে দলে ভক্তেরা সব ছুটে আসে। তীর্থযাত্রী ভাবছে, পূজা কচ্ছে দেবতার, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা পূজো ক'রে যায় সেই পরম প্রেমিক পূজারীর, যাঁর প্রাণশক্তি ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে ব্রহ্মকে অনুভব কত্তে পেরেছিল।

চিন্তার শক্তি ও ভারতের ভবিষ্যৎ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবমণি বলিলেন,—যত জায়গায় যত শক্তির খেলা দেখ্‌তে পাচ্ছ, সকলের মূল উৎস শক্তিমানের চিন্তায়। শক্তিমান্ মন যখন কল্যাণকে আশ্রয় ক'রে নিজেকে বিস্তারিত করে, তখন জগতের সবগুলি মন কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট হয়, মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ অনুভব করে। কল্যাণ-সাধনার যোগ্য আত্মগঠন যাদের পূর্ব্ব থেকেই ছিল, তারা সেই অদৃশ্য প্রেরণাকে ধ'রে ফেলে, তাকে নিজের ভিতরে এনে পুষ্ট করে, নিজের

বিশিষ্টতা দিয়ে তাতে রং ফলায়, তারপর নিজের ছন্দে, নিজের ভঙ্গীতে তাকে জগতের বুকে কর্ম্মরূপে প্রকাশ ক'রে দেয়। আজ ভারতে এই রকমেই কতকগুলি অসামান্য মানব-মানবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন পড়েছে, যাদের চিন্তার সূক্ষ্মগতি সহস্র বৎসরের ভবিষ্যৎকে গিয়ে প্রেরণার পর প্রেরণা, উদ্দীপনার পর উদ্দীপনা যোগাতে থাক্‌বে। বাহুবল বর্ত্তমানকে দেখে, বিচার-শক্তি অতীতের হিসাব-নিকাশ মিলায়, সঙ্কল্প ভবিষ্যৎকে গড়ে। দেশাত্মাকে এই সঙ্কল্পের শক্তিতে বিদ্যুন্ময় ক'রে তুল্‌তে হবে। তারই জন্য চাই শুদ্ধাত্মা মানব-মানবীর শুদ্ধ মনের সঙ্কল্প, শুদ্ধ হৃদয়ের অনুভূতি, শুদ্ধ বিচারের সিদ্ধান্ত।

বিদ্বেষ-সৃষ্টি ও সমাজ

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ-উদ্রেকের শক্তি যাহাদের বেশী, ভ্রান্ত লোকেরা অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগকেই নিজেদের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্য-চরিত্রের এক নিদারুণ তামসিকতা। ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতি-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করিতে চরিত্রবল, তপস্যা, ত্যাগ বা জনসেবার প্রয়োজন হয় না, কতকগুলি কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি, মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং অতি ক্ষুদ্র ত্রুটীকে বাড়াইয়া ফেনাইয়া বড় করিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে দায়িত্ববোধ-

বর্জ্জিত, বিচারবুদ্ধিহীন, অবান্তর ও বেপরোয়া কটূক্তি ও রোষভাষণ-সমূহ উচ্চারণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। যেই ব্যক্তি যত কাণ্ডজ্ঞানহীন, এই ব্যাপারে সেই ব্যক্তি তত সাফল্য অর্জ্জন করে। সরলচিত্ত, নিরীহ ও বোকা লোকগুলি কথার দাপটকেই যুক্তি মনে করিয়া, এই মিথ্যাকে বারংবার উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া, ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজের বিরুদ্ধে সত্য সত্যই যে অভিযোগ তাহাদের নাই, তাহাই আছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে বৃথাই মনে মনে নিজেদিগকে নিদারুণ আহত, প্রবঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও অবহেলিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া ক্রমশঃ এমন এক মনোভঙ্গী আয়ত্ত করে, এমন এক মনোভাবের অনুশীলন করে যে, ইহাদের চরিত্র বনের হিংস্র পশুর ন্যায় উদ্ধত, অমার্জ্জিত ও রুক্ষতার চরম সীমায় উপনীত হয়। শুধু পরের মুখে ঝাল খাইতে খাইতে ইহারা কল্পিত অভিযোগ এবং রচিত অপবাদ-সমূহকে সত্যের মর্য্যাদা দিতে আগ্রহী হয়। পৃথিবীতে এ ভাবে অসংখ্য সত্যদর্শী, জীবহিতকারী, সুবিচারপরায়ণ ব্যক্তি সম্প্রদায় বা জাতি-বিদ্বেষ-স্রষ্টা নীচ জন্তুদের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে যেই যত বুদ্ধিমান্ এবং মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান কর না কেন, এক এক বার নিজ নিজ চরিত্রের দিকে চাহিয়া, নিজেকে বিচার করিয়া, ওজন করিয়া, আত্মপরীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিও যে, তোমরা কোনও সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিদ্বেষ-স্রষ্টাদের হস্তের ক্রীড়নক রূপে

পুতুলের জীবনই যাপন করিতেছ কিনা। যাহারা মানবের মনে প্রেম ও করুণার সৃষ্টি না করিয়া বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও দোষানুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তোলে, যাহারা মৈত্রী, প্রীতি ও শান্তির মনোভাব সৃষ্টি না করিয়া বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইতে নিজেদের শক্তি ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করে, মনুষ্য-সমাজ তাহাদের বাসের উপযুক্ত স্থান নহে, তাহাদের প্রকৃত বাসস্থান হিংস্রজন্তু-সমাকুল গভীর জঙ্গলে। যেই সমাজে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সমাজ মানুষের সমাজ নহে, তাহা শ্বাপদের সমাজ। এই সকল বিদ্বেষস্রষ্টারা জীবন্তকে মৃত করিতে পারে, মৃতকে জীয়াইয়া তুলিতে পারে, মিথ্যা সাক্ষ্য রচনা করিতে পারে, নির্দ্দোষ ও সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত কার্য্যকে শত শত কলঙ্কে কলুষিত করিতে পারে, চন্দ্রমাকে জোনাকীতে পরিণত করিতে পারে, হিমালয়তুল্য বিশাল গৌরব গোষ্পদে ডুবাইয়া মারিতে পারে। ইহাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কুৎসাসুখী পাতলাকাণ একদল অনুগত লোক ইহারা সযত্নে সংগ্রহ, পালন ও পোষণ করে এবং এই সকল মূর্খ ব্যক্তিদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া নিজেদের কুটনীতির সংগ্রাম চালায়। তোমরা ত' এক উন্নত, মহান, শক্তিধর, বীর্য্যবান্ দেবচরিত্র, সর্ব্বজীব-হিতকামী, জগন্মঙ্গল, ঈশ্বর-নিষ্ঠ জাতি ও সমাজ গড়িতে চাহিতেছ? তোমরা এই জাতীয় কুলোকদিগকে প্রাধান্য দিয়া সেই মহতী প্রার্থনাকে বিফল হইতে দিও না।”

স-পিতা।—কিন্তু এমন খুব তপস্বী পুরুষেরা কি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন বেড়াবেন না? তাঁদের তপস্যাই যে জগতের হিতার্থে। জগতের হিতের জন্য দুয়ারে দুয়ারে তাঁরা ঘুরে না বেড়াবেন ত' কারা বেড়াবে? সংসারের পায়ে যার মাথাটা শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে, সে কি পার্ব্বে?

প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়

স-পিতা।—কিন্তু প্রকৃত তপস্বীর সংখ্যা যে অতি অল্প। এঁরা এই লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মচর্য্যহীন যুবকদের সঙ্গে মিশ্‌বার অবসর পাবেন কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সব সময়ই কি মিশবার প্রয়োজন হয়? সাধু-সজ্জনেরা তাঁদের পবিত্র সঙ্গ দিয়েও লোকের মনের ব্যাধি দূর কত্তে পারেন, মনের প্রবল ইচ্ছা দিয়েও পারেন। চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা মানুষের জীবন পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে পারেন। এমন কি যাকে কখনো দেখেন নি, উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ ক'রেও তার চিত্তমালিন্য দূর ক'রে দিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্য যদি প্রচার কত্তে হয়, তবে এই সব মহাপুরুষদেরই কাজ,—যার জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস নেই, তার কাজ নয়। বক্তৃতাটা প্রচারের অতি স্থূল উপায়, আদর্শ-পুরুষের তীব্র সঙ্কল্পই প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায়।

কলিকাতা

২রা ভাদ্র, ১৩৩৪

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ মানসে ভবানীপুরে গেলেন। দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোডে শ্রীমান স—দের বাড়ীতে উঠিলেন। স—র মা ও বাবা নানা বিষয়ে সদালাপের অবতারণা করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার ও আদর্শ-জীবন

শ্রীমান স-'র পিতা বলিলেন,—দেখুন স্বামীজী, আপনি ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের জন্য যে সব লিখেছেন, এই গুলি স্কুলপাঠ্য কত্তে পার্ল্লে খুব কাজ হ'তো।

সাহাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অ—বলিলেন,—কিন্তু স্কুলে কি এগুলি পাঠ্য হবে? এসব বই যদি পাঠ্য হয়, তবে ছেলেরা সাহেবদের পিতৃপিতামহের নাম মুখস্থ কর্ব্বে কখন?

শ্রীযুক্ত অ—র কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন মাত্র। তৎপর শ্রীমান স—'র পিতাকে বলিলেন,—স্কুলে পড়িয়ে কিছু কাজ হ'লেও হতে পাত্ত বটে, কিন্তু আসল কাজটা হবে সংযত জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে। যেখানে শিক্ষকদের নিজেদের জীবনে সংযমের সাধনা নেই, সেখানে শুধু বই পড়িয়ে আর লেক্‌চার দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আগে চাই আদর্শ জীবন। যাঁদের একবার দেখ্‌লে পরে মনের মোহ কেটে যায়, এমন অগ্নিসম তেজস্বী দীপ্তিমান্ পুরুষদের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

কলিকাতা

৩রা ভাদ্র, ১৩৩৪

শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরু

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা-নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"শিষ্যকে মনে রাখা অতি ছোট কথা, প্রকৃত গুরু শিষ্যকে ধ্যান করেন। শিষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার মধ্যেই গুরুর ইহপর-জীবনের সকল সার্থকতা লুকাইয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রভাব শতাব্দীর পরে বিশ্বমানবের উপরে যে প্রবলতা ও দীপ্তি লইয়া নিপাতিত হইবে, তাহাই প্রকৃত গুরু নিজ জীবনের দীপ্তি বলিয়া জানেন। গুরু যে অমর, তাহা শিষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইবে, গুরুর দ্বারা নহে। শিষ্যের অমানব অলৌকিক জীবনের দিব্য প্রতিভাই প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবে যে, গুরু মানবজাতির কতখানি সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরু জগতের জন্য তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কতখানি রক্ত ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত, তাহা শিষ্যের মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য দিয়া জগতে গোচরীভূত হইবে। এই জন্যেই শিষ্য গুরুর নয়নের মণি, এই জন্যই গুরু শিষ্যকে প্রাণেরও অধিক বলিয়া গণনা করেন।"

কথা ও জীবন

অদ্য হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি দিবারাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট চারিঘণ্টা (বৈকাল ৪—৮ পর্য্যন্ত) সময় ব্যতীত সর্ব্বসময়ে মৌনী আছেন। বৈকাল চারিটা বাজিলে শ্রীশ্রীবাবামণি ভবানীপুর হইতে সমাগত ভক্তদের লইয়া পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া একটি নির্জ্জন কোণে বসিলেন। একটী আগন্তুক যুবক কাব্যসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

প্রশ্ন।—কোনও কবি যখন বিশ্বপ্রেমের বা স্বদেশ-প্রেমের কথা কীর্ত্তন করেন, তখন কি বুঝতে হবে না যে, তিনি প্রকৃতই প্রেমিক? ভিতরে যদি প্রেম না থাকবে, তাহ'লে অমন লেখা বেরোয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—লেখা প'ড়ে বা কথা শুনেই কাউকে বিচার করা অসম্ভব। প্রেমের সাময়িক ধ্যান থেকে প্রেমের কবিতা বেরুতে পারে। কিন্তু এই কবিতাটাই তার জীবনের ষোল আনা পরিচয় দেবে না। কাব্য তার ধ্যানশীল মুহূর্ত্তটুকুরই পরিচয় দেবে। পরমুহূর্ত্তেই সে হয়ত একটা প্রচণ্ড মাতাল বা লম্পটের পরিচয় নিজ আচরণ দিয়ে দিচ্ছে। এ জায়গায় তার কাব্য তার জীবনের বিরোধী। মানুষের উচ্চ চিন্তাটা যখন তার উচ্চ জীবন থেকে আসে, তখন তার প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু নীচ জীবন যাপন ক'রে যারা অভ্যাসের শক্তিতে উচ্চ চিন্তা পরিবেশন ক'রে থাকে, তাদের কথার প্রভাব মানুষের জীবনের

উপরে অতি অল্পই বিস্তারিত হয়। কথার কুহেলিকা অন্যের মনের উপরে শব্দের মায়াজাল বা ছন্দের চাতুরী অবশ্যই সৃষ্টি কত্তে পারে, কিন্তু তাতে জীবন-ভিত্তি রচিত হয় না।

কথার শক্তি ও ত্যাগের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ বাবা, সৎকথার নিজস্ব শক্তি চির-কালই আছে, চিরকালই থাকবে। কিন্তু যেখান থেকে কথাটা আসছে, সেই স্থানটা যত পবিত্র হবে, যত নিষ্কলুষ হবে, লোকে কথাটার তত মূল্য দেবে। বাজারে অনেক মূল্যবান জিনিষ আসে, কিন্তু লোকে কি সবগুলিকেই মূল্য দিয়ে কেনে? পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দোকান-ঘরে সাজান অল্পদামের জিনিষগুলিও তাড়াতাড়ি বিকিয়ে যায়। আবার, ধূলো-ময়লায় অপরিস্কৃত দোকানঘরে সাজান দামী জিনিসগুলিও কিন্‌তে খদ্দের পাঁচবার ইতস্ততঃ করে। একজন ত্যাগী বিবেকানন্দের মুখে উপদেশবাণী শুনে লোকে তার যে মূল্য দেবে, একজন কবি বাইরণের মুখে সে কথা শুনে লোকে কি সে মূল্য দিতে চাইবে? একজন মহাকবির রচনায় হয়ত ত্যাগ-সাধনার, পরার্থে প্রাণ-দানের অনুকূল বহু কথা আছে, কিন্তু তাতেই কি সহস্র সহস্র লোককে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কত্তে প্রাণোদিত কত্তে পারা যাবে? কিন্তু নিজের জীবন যদি সর্ব্বত্যাগের জীবন হয়, তা' হ'লে তেমন ব্যক্তির এক একটা কথায় শত সহস্র লোক সথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে দেশের জন্য, দশের জন্য কাঙ্গাল সাজতে পারে, চির-দরিদ্র্য,

চির-দুঃখ, চির-অভাব বরণ কত্তে পারে। অনেকে আছেন, যাঁরা খাঁটি কবি এবং গভীর দার্শনিক, জীবনে ত্যাগও আছে, তাঁদের কথা মানুষের বুদ্ধিকে সাময়িক উদ্দীপ্ত ক'রে দিয়ে গেল কিম্বা বিচারশক্তিকে মাত্র জাগিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু তাদের দিয়ে পরের জন্য দুঃখ বরণ করাতে পার্ল্ল না। পরহিতে সর্ব্বস্বত্যাগীর অনাড়ম্বর সাধারণ কথাগুলিও যেমন ক'রে লোকের মনের উপরে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে, এঁদের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ, কিছু কিছু দেশ-সেবা, কিছু কিছু জনহিতবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এঁদের সুচিন্তিত কথাগুলিরও তেমন মর্ম্মভেদী প্রভাব বিস্তারিত হয় না। এঁরা হয়ত জাতিকে দিচ্ছেন সৌন্দর্য্যবোধ ও বিচার-বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃত ত্যাগীরা জাতিকে দিচ্ছেন ত্যাগের বল, নিজ হৃদ্‌পিণ্ড নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলবার শক্তি, সকল স্বার্থ পদতলে বিদলিত কর্ব্বার সামর্থ্য। এই যে দানের পার্থক্য, এই যে প্রভাবের পার্থক্য, তা' এসেছে দুই দল লোকের জীবন-ধর্ম্মের ও জীবন-প্রণালীর পার্থক্য থেকে। জাতির উপর সাহিত্যিকদের প্রভাব বুদ্ধিগত ও চিন্তাগত,—প্রতিভার দিক্ দিয়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত জগতে অপরাজেয়। লেনিন কিম্বা গান্ধী নিশ্চয়ই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ব'লে দাবী কর্ব্বেন না। লেখনী এঁরাও ধারণা ক'রেছেন, কিন্তু এঁদের চেয়ে বড় বড় লেখক এঁদের নিজ নিজ দেশেই ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু সাহিত্য-প্রতিভার দিক্ দিয়ে এঁরা যদি অন্যান্য দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের চেয়ে ছোটও হন, তবু পরহিতে সমর্পিত-সর্ব্বস্ব

ব'লেই এঁরা নিজ নিজ দেশে পরিপূজিত এবং তারই প্রতাপে পৃথিবীর ইতিহাসে এঁরা নূতন অধ্যায়-যোজনা ক'রে থাকেন। অতি নিকৃষ্ট মানসিক খাদ্যে যে স্থানে জনসাধারণ তুষ্ট থাকতে বাধ্য হ'ত, প্রতিভাশালী কবি বা দার্শনিক সে স্থানে রাজভোগ পরিবেশন করেন। এটাও দেশের বা জগতের প্রতি তাঁর একটা সেবা। কিন্তু হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুভয়বিরহিত ক'রে পরদুঃখনাশে নিয়োজিত করার শক্তি জাগে শুধু আত্মদানকারীর প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত থেকে। বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিকেই উদ্বুদ্ধ করা যায়, ত্যাগ-শক্তিকে জাগ্রত করা যায় না। ত্যাগশক্তিকে জাগাতে হ'লে ত্যাগেরই প্রয়োজন ; যাঁদের জীবনে ত্যাগ আছে ব'লে জানি, এই জন্যই তাঁদের বাণী অমোঘ।

চাই জ্বলন্ত জীবন

অতঃপর বাংলা দেশের ছোট বড় অনেক কবির কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— দেশে সুকবি, সুলেখক, সুবক্তাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হচ্ছে, এটা সুখের কথা। কিন্তু এসব প্রতিভাবান লোকদের প্রতিভার সঙ্গে দেশাত্মারও যোগ চাই, শুধু কল্পনার শক্তি থাক্‌লেই যথেষ্ট হ'ল না। এঁরা কবিতা লিখ্‌বেন যেমন জ্বলন্ত, এঁদের জীবন হওয়া চাই তেমন জ্বলন্ত। এঁরা বক্তৃতা দেবেন যেমন বজ্রনির্ঘোষময়, জীবনও হওয়া চাই তেমন দম্ভোলিগর্জ্জী। একদল লোক শুধু কথাই বল্‌বে, কাজ কর্ব্বে আর একদল

এসে,—এমন বন্দোবস্ত কোনো কাজেই আস্‌বে না। যাঁরা কাজ কর্ব্বেন, তাঁরাই প্রয়োজনমত কথাও বলুন, যাঁরা কথা ব'লবেন, তারাও প্রয়োজনমত কাজে লাগুন,—এই হচ্ছে সুবিধাসঙ্গত বন্দোবস্ত। যাঁর যেদিকে স্বাভাবিক সামর্থ্য বেশী, তিনি সেইদিকে বরং নিজেকে একটু বেশী খাটাবেন। কিন্তু কথা বলব ব'লে শুধু কথাই বল্‌ব, এ কোনো কাজেরই কথা নয়। তুমি কখ্‌খনো ভেব না, কপটাচারীরা দেশোদ্ধার ক'রে ফেলবে, উদর-সর্ব্বস্ব স্বার্থপর বাক্য-বিলাসীর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হ'য়ে দেশের ঘুমন্ত অন্তরাত্মা জাগ্‌বে। দেশ জাগ্‌বে তপস্বীর বজ্রনির্ঘোষে, যাত্রার ভীমের বাহ্বাস্ফোটনে নয়। দেশ জাগ্‌বে অকপটতার আকর্ষণে, অভিনয়ের চাতুর্য্যে নয়। শুন্‌তে পাচ্ছ,—'স্বদেশ-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম' কিন্তু এই জয়ঢক্কার পশ্চাতে প্রাণ কোথায়? চমৎকার ছন্দে জাগরণী কবিতা লিখতে পারলে লেখকের কবি-প্রতিভার সম্মান কর্ব্ব বটে ; কিন্তু জীবন-প্রণালীর সঙ্গে যেখানে দেশাত্মার যোগ নেই, সেখানে কবিকে প্রথম শ্রেণীর দেশসেবক বলা শক্ত কথা। স্বদেশ-সেবককে হ'তে হবে তপস্বী, হ'তে হবে আত্ম-বিশ্লেষণপরায়ণ। সাধনের বলে নিজ দোষ-ত্রুটী দূর কর্ব্বার চেষ্টা থাক্‌বে তাঁর অপরিসীম, উচ্চ চিন্তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে যাতে জীবনটা অগ্রসর হ'তে পারে, তার জন্য যত্ন থাক্‌বে অফুরন্ত। তবে ত' তাঁর স্বদেশ-প্রেমের কবিতা সার্থকতা পাবে। জগতে কাব্য বরং সৃষ্ট না-ই হোক্‌, আগে চাই দেশপ্রাণ মানবের মহৎ জীবন,—যে জীবনকে একবারটী দেখ্‌লে মূকের

মুখে কথা ফুটবে, অকবি নিজে থেকে কাব্যকুশলী হবে। তুমি কি ভাবছ, কলমওয়ালা লোকের অভাব? অভাব হচ্ছে জীবনওয়ালা লোকের।

কলিকাতা
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৪

আজ ভাবনীপুর হইতে দুইটী ধর্ম্মপ্রাণা সম্ভ্রান্তা মহিলা ধর্ম্মোপদেশ পাইবার জন্য আসিলেন। তখনও চারিটা বাজে নাই। সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিলেন। চারিটা বাজিলে পর শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনভঙ্গ করিলেন।

সবই ভগবানের

প্রথমা মহিলার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখুন মা, সংসারে সবই ভগবানের। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-বান্ধব সবই ভগবানের। ইষ্ট-অনিষ্ট, ভাল-মন্দ, কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ এসবও ভগবানের। এমন কিছু নেই, যা' ভগবানের নয়। এই কথাটুকু মনে থাক্‌লেই আর ষড়-রিপুর ভয় থাকে না। মনে উত্তেজনা এল, অম্‌নি বলুন,—"ভগবান্, সবই ত' তোমার, এ উত্তেজনাও ত' তোমার, তোমার জিনিষ তোমার পায়েই সঁপে দিচ্ছি, একে তুমিই নাও, তুমিই এ দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় দাও।" মনে অসত্যানুরাগ এল, অম্‌নি বলুন,—"এ অনুরাগের মালিক ভগবান, ভগবানের জিনিষ ভগবানের কাছেই যাক্।" ক্রোধ এল, লোভ এল, অহঙ্কার এল, অম্‌নি বলুন,—

"ওরে তোরা ত' আমার নয়, তোরা যে ভগবানের, ভগবানের কাছেই যা, সেখানেই তোদের পূর্ণ তৃপ্তি হবে, আমাকে দিয়ে পূর্ণ তৃপ্তি যে অসম্ভব।" এইভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যাই যখন মনে আসুক, অম্‌নি তাকে ভগবানের কাছে চালান দিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—চালান ত' দিয়ে দিলাম, কিন্তু সে যদি যেতে না চায়? কুচিন্তা যদি আমার ঘাড়ে চেপেই ধ'রে থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হ'লেই বা ভয় কি মা? আপনি নিজেও যে ভগবানেরই জিনিষ, ভগবান্ ছাড়া যে আর কারো অধিকার আপনার উপরে নাই, এই কথাটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন। গভর্ণমেন্টের খাস তালুকের উপরে কি অন্য কেউ এসে বাড়ী তুলতে পারে? ধ্যান করুন, আপনার দেহ, আপনার মন, আপনার অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি, আপনার ইন্দ্রিয়নিচয়, আপনার বুদ্ধি, আপনার অনুভব-শক্তি সবই যে পরম প্রেমময় ভগবানের। আপনার শরীরের প্রতি রোমকূপে ভগবানের অধিকার, আপনার মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনে ভগবানের প্রেরণা, আপনার নিঃশাস-বায়ুর প্রত্যেকটী হিল্লোলে ভগবানের অবস্থিতি। ভাব্‌তে থাকুন, এই যে আপনার চক্ষু, যা বিপথে ধাবিত হ'তে চাচ্ছে, তার উপরে প্রেমময় প্রভুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি পড়ছে। ভাব্‌তে থাকুন, এই যে আপনার কর্ণ, যা মঙ্গলের বিরোধী বিষয়ে কৌতূহলী হচ্ছে, তার কাছে এসে পরমকল্যাণময় প্রভুর সুধামাখা কণ্ঠ

ধ্বনিত হচ্ছে। ভাব্‌তে থাকুন, এই যে আপনার জিহ্বা, যা অসত্যের চর্চ্চা কত্তে যাচ্ছে, তাতে এসে রসস্বরূপ ভগবান্ মধুময় প্রেমরস ঢাল্‌তে চাচ্ছেন। ভাবতে থাকুন, এই যে আপনার দেহ, যার অবাধ্যতা আপনাকে সত্য থেকে বিচলিত কত্তে চাচ্ছে, তার মাঝে শ্রীভগবানের প্রাণমথন স্পর্শ, মনোমথন স্পর্শ, হৃদয়মথন স্পর্শ রয়েছে। এই দেহের উপরে, এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপরে, এই মনের উপরে জুলুম কত্তে পারে, এমন সাধ্য কার আছে মা?

অভ্যাস

দ্বিতীয়া মহিলা।—কিন্তু এ কথা যে সব সময়ে মনে থাকে না বাবা।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অভ্যাস করুন, মনে থাক্‌বে। কঠিন কাজও অভ্যাসের দ্বারা সহজ হয়। একদিনে হচ্ছে না ব'লেই হাল ছেড়ে দেবেন কেন? একদিনে হচ্ছে না, দশ দিনে হবে, কিন্তু হ'তেই হবে। তবে অভ্যাস কত্তে হবে নিরন্তর। নিজের ভিতরে নিজের সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদের ভিতরে, নিজের চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্যের ভিতরে ভগবানের অবস্থিতিকে বা তাঁর অধিকারকে, তাঁর অধিনায়কত্বকে স্মরণ কত্তে হবে অবিচ্ছেদে। তাঁর অস্তিত্বকে স্মরণ কত্তে হবে উৎসাহ সহকারে, শ্রদ্ধা সহকারে, ভক্তি সহকারে, নিরতিশয় আগ্রহ ও আদর সহকারে। এই ভাবে অভ্যাস কত্তে কত্তে আপনি স্বাভাবিক ব্যাপারের মত তাঁর স্মৃতিটি সর্ব্বদা মনের ভিতরে জাগ্‌বে।

নিয়ত ভগবৎ-স্মরণের কৌশল

দ্বিতীয়া মহিলা।—কিন্তু বাবামণি, অভ্যাসেরও ত' কৌশল আছে। বিনা কৌশলে কসরৎ কর্ল্লে ত' আর ফলের আশা নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিনা কৌশলে কসরৎ কর্ল্লেও কিছু না কিছু ফল আছেই। তবে কৌশল কর্ল্লে অল্প শ্রমে বেশী ফল, অল্প সময়ে বেশী উন্নতি। এখানে কৌশল হচ্ছে নামজপ। ভগবনের নামজপ কত্তে কত্তে আপনি বোধ এসে যাবে,— "আমি ভগবানের, আমার কাব্য ও বুদ্ধি ভগবানের।" দিবারাত্রি নাম জপ করুন মা,—নিদ্রায়, জাগরণে, শ্বাসে, প্রশ্বাসে।

নাম জপের প্রণালী

দ্বিতীয়া মহিলা।—শাস্ত্রে আছে প্রত্যেক শ্বাসে ও প্রশ্বাসে "সোহহং" এবং "হংস" মন্ত্র জপ কত্তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে মন্ত্রই জপ করুন, প্রত্যেক শ্বাসে ও প্রশ্বাসে অবিরাম ভগবানের নাম কত্তে থাকুন। নামটী জপ্‌বার সময়ে অনুভব কত্তে চেষ্টা করুন, প্রতিবার নমোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভগবান আপনার নিকটস্থ হচ্ছেন, যতই তাঁকে ডাক্‌ছেন, ততই যেন তাঁর আর আপনার মধ্য থেকে দূরত্বটা কমে যাচ্ছে, প্রতিবার নামস্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন আপনিও ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হ'য়েই যাচ্ছেন। এক একবার নামজপ করুন, আর ভাবুন, এই যেন ভগবানের অঙ্গস্পর্শ আপনি পাচ্ছেন, ভগবান্ আপনার অঙ্গস্পর্শ নিচ্ছেন। ভাবুন,—

এই তিনি আপনাকে কোলে ক'রে বস্‌লেন, স্নেহ-আদরে আপনাকে একেবরে ঢেকে দিচ্ছেন, আর আপনিও তাঁকে প্রাণের প্রাণ জেনে কোলে তুলে নিচ্ছেন, স্নেহমাখা আদরে ঢেকে বুকের মাঝখানে রাখ্‌ছেন। ভাবুন,—ভগবান্ তাঁর সমস্ত রূপ, সমস্ত বিভূতি, সমস্ত প্রেম, সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত সরসতা ও সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে আপনার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, আর আপনি আপনার সব কিছু নিয়ে, সকল প্রেম, সকল ভালবাসা নিয়ে, সকল আদর, সকল সোহাগ নিয়ে, সকল আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে তাঁরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।

ভগবান্‌কে আপন করা ও তাঁহার আপন হওয়া

প্রথম মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা, কি ক'রে ভগবানের আপনার হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর নামের সাধন কত্তে কত্তে আপনি মানুষ তাঁর আপনার হ'য়ে যায়। তাঁর আপনার হবার জন্য বা তাঁকে আপন করার জন্য কোনো পুরুষকারের দরকার হয় না মা। স্বভাবেরই মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর আপন হয়, তিনি মানুষের আপন হন। কিন্তু এই স্বভাবকে জাগিয়ে দেবার জন্যই সাধন। সাধনেই পুরুষকার প্রয়োজন।

জপনীয় নামের অর্থ-ভাবনা

অতঃপর পুনরায় জপের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—নাম জপের প্রথম কথাই হচ্ছে নামের অর্থভাবনা। মনে করুন আপনি 'ওঁ' এই শব্দ জপ কচ্ছেন। শুধু জপ কল্লেই হবে না, আপনাকে মনে রাখতে হবে, 'ওম্' বল্লে তাঁকেই বুঝায়, যিনি পরমানন্দের খনি, যিনি আদ্যাশক্তিস্বরূপ, যিনি সারাৎ-সার পরাৎপর নিখিল-ভুবনময় ব্রহ্ম। 'ওম্' যে কার নাম, তা' যদি ভুলে থাকেন, তাহ'লে জপ ক'রে লাভ নেই। এমন অভ্যাস কর চাই, যেন 'ওঁ-কার উচ্চারণ করা মাত্র মনের মধ্যে ঈশ্বরভাব সমুদিত হয়, 'ওঁ', 'দুর্গা', 'হরি', 'আল্লা', 'খোদা', 'গড্', 'বিষ্ণু' প্রভৃতি নাম সেই পরমবেদ্য পরমেশ্বরকে স্মরণের সঙ্কেত মাত্র। যাতে নামোচ্চারণ মাত্র ঐশ্বরিকী স্মৃতি জাগ্রত হয়, তার জন্যে বৃথা নামোচ্চারণ বর্জ্জন কত্তে হবে। যাই দেখছেন যে নাম-জপ হচ্ছে কিন্তু নামের অর্থ-বোধ হচ্ছে না, ঈশ্বরভাব জাগ্‌ছে না, ভগবৎ-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হচ্ছে না, তখনই নামজপ বন্ধ কর্ব্বেন এবং প্রথমতঃ কতক্ষণ ঈশ্বরের নিখিল-গুণগ্রামে স্মরণ ক'রে তারপরে মনে মনে আবৃত্তি কত্তে থাক্‌বেন—'এই যে পরমপুরুষ, এঁরই নাম ওম্, ওম্ বল্‌লেই এই পরমদেবতাকে বুঝায়।' মনে মনে বল্‌তে থাক্‌বেন,—'ওম্ কি? ওম্ হচ্ছেন আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা, আমার পরম প্রেমময় প্রাণের ঠাকুর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ড-বিধাতা শ্রীভগবান।' বার বার আবৃত্তি কর্ব্বেন,—ওঁ মানে ব্রহ্ম, ওঁ মানে ব্রহ্ম, ওঁ মানে ব্রহ্ম।' এইভাবে বারংবার অভ্যাস করার ফলে যখন "ওঁ" উচ্চারণ করা মাত্রই আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর কথাই

মনে হবে, তখন পুনরায় জপে আত্মবিনিয়োগ কর্ব্বেন। এমন দৃঢ় অভ্যাস কত্তে হবে যেন, অর্থবোধও যেই দূর হয়েছে, জপও যেন অম্‌নি থেমে যায়। তা'হলেই জপের পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওঁ"-কারই কি জপ কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ওঙ্কারের কথা উল্লেখ করেছি। যে যে-নামে ডাকুক, ভগবান্ সবটাতেই সমান রাজি। নামের বিভিন্নতা নিয়ে আমরা ঝগড়া করি শুধু অজ্ঞানতা-বশতঃ।

মন্ত্ররাজ ওঙ্কার

প্রথমা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে ওঙ্কারকে মন্ত্ররাজ ব'লে যে বলা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার ত' মন্ত্ররাজ বটেনই। জগতের যত মন্ত্র, সব মন্ত্র একত্র কর্‌লে যা হয়, ওঙ্কার তাই। জগতের যত মন্ত্র, সব মন্ত্রের প্রাণ বা স্বরূপ হলেন ওঙ্কার। সুতরাং ওঙ্কারকে ত' মন্ত্ররাজ বল্‌বেই। একমাত্র ওঙ্কার জপ কর্‌লে জগতের সকল মন্ত্র জপ করা হয়, একমাত্র ওঙ্কার-স্মরণেই জগতের সকল মন্ত্র স্মরণ করা হয়। অপর সকল মন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বিবেচনা রয়েছে, গণ্ডী-ভেদ, বিধি-নিষেধের মারামারি রয়েছে। কিন্তু ওঙ্কার-মন্ত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কোনো প্রভাব বা অধিকার নেই। এই জন্যই ওঙ্কার মন্ত্রকে মন্ত্ররাজ বলা হয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে ওঙ্কার-জপ

দ্বিতীয়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদের পক্ষে কি ওঙ্কার-জপ বিধেয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবিধেয় কেন হবে মা? একদিন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী না দেবী-সূক্ত রচনা করেছিলেন। দেবীসূক্তের অর্থ চিন্তা কর্‌লে কার বিশ্বাস হবে যে, তপস্বিনী বাগ্ একমাত্র ওঙ্কার ছাড়া অন্য মন্ত্রে সাধনা করেছেন? অনাদি অতীত কাল থেকে স্ত্রী-লোকেরা প্রণব-মন্ত্র জপ ক'রে সিদ্ধকামা হয়েছেন। মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক মন্ত্র-সমূহের সুপ্রচারের ফলে স্ত্রীলোকের পক্ষে ওঙ্কার-জপ অবিধেয় হ'য়ে পড়্‌ল। অথবা আরো সত্য ক'রে বল্‌তে হ'লে স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণবমন্ত্র অবিধেয় করার ফলেই সাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র সমূহের সমাদর বাড়্‌ল। কিন্তু এখন যুগ পাল্‌টেছে মা। গৃহস্থ গুরুরা স্ত্রীলোককে যে অধিকার দিতে সাহস পান নি, সন্ন্যাসী-গুরুরা সে অধিকার দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। অতীতের যা বিধেয় ছিল, পুনরায় তাই বিধেয় হচ্ছে। সুতরাং আপনাদের কুণ্ঠার বা দ্বিধার কোনও কারণ নেই মা।

ওঙ্কার-মন্ত্রের ধ্যেয়

দ্বিতীয়া মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওঙ্কার-মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান করব কাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যাঁকে প্রাণ চায়, তাঁকে। হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং

প্রভৃতি মন্ত্রের ধ্যেয় বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ও সুনির্দ্দিষ্ট। প্রণবের ধ্যেয় বস্তু অনির্দ্দিষ্ট, ওঙ্কার-যোগে যাঁর যেমন রুচি, সে তেমন ধ্যান কত্তে পারে।

দ্বিতীয়া মহিলা।—যার কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ধ্যেয় বিগ্রহে রুচি নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তার পক্ষে একাক্ষর এই মহামন্ত্রের নিজেস্ব রূপটাই ধ্যেয়। নামব্রহ্মের ধ্যানই তার পক্ষে অত্যুত্তম।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—দেখুন মা সাধক-সমাজে শত শত 'রূপে'র প্রশংসা রয়েছে। কেউ কৃষ্ণ-'রূপে' প্রাণ মজিয়েছেন, কেউ কালী-'রূপে' ডুব দিয়েছেন। প্রাণ মজাবার বা রূপ-সাগরে ডুব দেওয়ার ভাগ্য সকলের সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-বিগ্রহের প্রশংসা শুনে আপনার মন যে দ্বিধাগ্রস্ত হবে, এটা স্বাভাবিক। কারণ, এটা বিচারের যুগ, নির্ব্বিচারে কিছু মেনে নেওয়া কঠিন। এ ক্ষেত্রে কালী ভাল না কৃষ্ণ ভাল, সেই দ্বন্দ্বের ভিতর না গিয়ে নাম-ব্রহ্মের একাক্ষর রূপটাতেই অভিনিবেশ দেওয়া ভাল।

পরামর্শ করিয়া সন্ন্যাস

মহিলাদ্বয় প্রস্থান করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়ার বাগানে গিয়া বসিলেন। একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাস কখনো অনেক বুদ্ধি-

পরামর্শ ক'রে হয় না, যার হয়, তার স্বভাব থেকেই হয়। তোমার স্বভাব থেকে যদি গৈরিক-রঞ্জিত জীবন ফুটে ওঠে, তবে তাই হবে বিশ্ববাসীর পরম সমাদরের বস্তু, তাতেই জগৎ লাভবান্ হবে, উপকৃত হবে। সন্ন্যাসী হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা না ক'রে, স্বভাবকে সুন্দর, মহৎ, উজ্জ্বল ও উদার করার চেষ্টা কর। তা' থেকে আপনা আপনি সন্ন্যাসের ফুল্ল কমল ফুটে উঠ্‌বে। চেষ্টা ক'রেও যে সন্ন্যাস হয় না, তা' নয়, তবে স্বভাবের সন্ন্যাসই সুন্দরতম সন্ন্যাস।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী গল্প বলিলেন,—এক গৃহস্থ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হ'লেই রাগ ক'রে বল্‌তেন,—'থাম্ গিন্নি, তোকে মজা দেখাচ্ছি, কালই আমি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাব, তখন বুঝতে পার্‌বি।' এই-না ব'লেই এক দৌড়ে তিনি বাজারে গিয়ে হাজির হ'তেন এবং এক পয়সার গেরিমাটি কিনে এনে কাপড় চোপড় রঙ্গিয়ে রৌদ্রে শুকুতে দিতেন। কিন্তু ক্রোধজ বৈরাগ্য কতক্ষণ থাকে? রাগ থেমে গেলেই স্ত্রী ঐ গেরুয়া কাপড় কেটে-ছেঁটে বালিশের ওয়াড় তৈরী কত্তেন। একদিন ত' গৃহস্থ রাগ ক'রে কাপড়-চোপড় গেরিমাটী দিয়ে রঙ্গিয়ে রৌদ্রে দিয়েছেন শুকুতে। এমন সময় তার শ্যালক এসে হাজির। গৃহস্থ তখন তার শ্যালককে খুব যত্ন-সমাদর কত্তে আরম্ভ কর্‌লেন। দুপুর বেলা দুজন আহার কত্তে বসেছেন, খেতে খেতে শ্যালকের দৃষ্টি পড়ল গেরুয়া কাপড়গুলির উপরে। দেখেই সে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে,—'ও কি দত্ত মশাই, গেরুয়া-কাপড় আবার এল কিসের?'

দত্ত মশাই রুষ্ট স্বরে বল্লেন,—'আর ভাই দুঃখের কথা ব'লো না, তোমার দিদিটীর জ্বালায় আমার সংসারী করাই ভার হ'ল। তাই ভেবেছি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাব।' দিদি তখন পরিবেশন কচ্ছিলেন; তিনি বল্লেন,—'এই রকম সন্ন্যাসী ইনি আজ দশ বছর ধরেই হচ্ছেন। এক একবার আমার উপরে রাগ করেন, আর কাপড়-চোপড় রঙ্গান, দুদিন যেতেই রাগ যায় প'ড়ে, তখন আমি ঐগুলি দিয়ে ছেলের কাঁথা আর বালিশ সেলাই করি।' শ্যালক বল্লে,—'ওঃ দত্ত মশাই, এভাবেই বুঝি সন্ন্যাসী হবেন?' দত্ত মশাই বল্লেন—'নাঃ এবার আমি হবই হব, এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই।' শ্যালক হেসে বল্লে,—'সন্ন্যাসী কি ভাবে হ'তে হয় তা' জানেন?' দত্ত মশাই জিজ্ঞাসা কর্লেন,—'কি ভাবে হয় ভাই?' শ্যালক বল্লেন,—'তবে আমি দেখাচ্ছি।' দত্ত-গিন্নী তখন তার ভাইটীর পাতে রুই মাছের মুড়ো পরিবেশন কচ্ছিলেন; কিন্তু ভাইটী সেইদিকে দৃক্‌পাত মাত্রও না ক'রে শক্‌ড়ি হাতেই উঠে গিয়ে আঙ্গিনায় দাঁড়াল এবং নিজের পরা সাদা কাপড়খানা ছেড়ে গেরুয়াখানা টেনে নিয়ে পর্‌ল। তারপরে বল্ল,—'দত্ত মশাই প্রণাম, বড়দিদি প্রণাম।' এই ব'লে শ্যালক সেই যে বের হ'ল, আজও বের হ'ল, কালও বের হ'ল, আর কেউ কখনো সমগ্র জীবনে তাঁর খোঁজটী পর্য্যন্ত পেল না।

গল্পটী শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বাভাবিক সন্ন্যাস এই রকমের। সামান্য একটা উপলক্ষ্যকে আশ্রয় ক'রে সে ফুটে উঠে, অনেক বুদ্ধিশুদ্ধি খাটিয়ে, অনেক ফন্দী-পরামর্শ

ক'রে তবে তার উৎপত্তি হয় না। এই সন্ন্যাসই নিরাপদ সন্ন্যাস। উপন্যাস লেখকদের মধ্যে যেমন দুইটী শ্রেণী আছে, এক শ্রেণীর লেখক আগে প্লট ঠিক ক'রে নিয়ে কলম ধরেন, অপর শ্রেণীর লেখকেরা প্লট কি হবে, তা' ঠিক্‌ না ক'রে লিখতে আরম্ভ করেন এবং গল্পের স্বাভাবিক গতিতে প্লট আপনি জমে যায়, ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দুইটী শ্রেণী আছেন। একদল সন্ন্যাসী "জীবনটাতে সন্ন্যাসকেই ফুটিয়ে তুল্‌ব" এই সঙ্কল্প ঠিক ক'রে নিয়ে পথ চল্‌তে থাকেন, অপর দল জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে পড়েন নিজের অন্তর্নিহিত স্বভাবে।

সন্ন্যাসের অকাঙ্ক্ষা ও আত্মপরীক্ষা

সন্ন্যাস সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অনেকে নিজের স্বভাবকে না চিনে জোর ক'রে সন্ন্যাসী হন। ফলে পিতা-মাতার প্রাণে কষ্ট দিয়ে তারা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন। কিন্তু সংসারীর যে বীজ তাঁদের ভিতর লুক্কায়িত ছিল, কালক্রমে তা' আত্মপ্রকাশ করে এবং যে সংসারী জীবন তাঁরা যাপন কত্তে পাত্তেন উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত রমণীর সাথে—বৈধভাবে, সে জীবন তাঁরা যাপন কত্তে বাধ্য হন গিয়ে নীচবংশীয়া নিকৃষ্টচরিত্রা অশিক্ষিতা ডোম, বাউরী বা পারিয়ার মেয়ের সাথে—অবৈধভাবে। এই জন্যেই, সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষা যদি কারো প্রাণে জাগে, তবে

তাকে সর্ব্বাগ্রে কত্তে হবে আত্মপরীক্ষা, সর্ব্বাগ্রে জান্‌তে হবে নিজের স্বভাব বা পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত প্রচ্ছন্ন সংস্কারকে। যে তা' না জেনে নেয়, সে ঠকে, বড় বিষম ঠকা ঠকে। কেন না শেষটায় যদি অবৈধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগই কত্তে হ'ল, তাহ'লে পিতামাতার মনের আনন্দটুকুকে পূর্ণ ক'রে বৈধ ইন্দ্রিয় সম্ভোগে কি দোষ ছিল? পরিশেষে যদি যার তার মেয়ের সঙ্গেই ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন কত্তে হ'ল, তা'হ'লে ভদ্রঘরের সচ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গেই ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপনে কি দোষ ছিল?

সন্ন্যাসীর পতনের কারণ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি সন্ন্যাসীর পদস্খলনের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—অধিকাংশ সন্ন্যাসীই যে ব্রতভ্রষ্ট হয়, সংযম থেকে স্খলিত হয়, তার কারণ হচ্ছে, গোড়ায় এই আত্মপরীক্ষার অভাব, নিজের প্রকৃতি ও সংস্কার সম্বন্ধে নিজের এই অজ্ঞতা। কিন্তু এ ছাড়াও সন্ন্যাসীর পদস্খলন হয়। সে সকল কারণের মধ্যে সব চাইতে বড় কারণ হ'ল সমবুদ্ধির অভাব। নিজ প্রকৃতির মধ্যে সংসারীর জীব নিহিত নেই, কিন্তু জগৎকে ভালবাসা বিলাতে গিয়ে ভেদজ্ঞান করা হচ্ছে, একজনকে প্রাণের প্রাণ, আর একজনকে সাধারণের স্নেহের পাত্র ব'লে গণনা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রেমিক-হৃদয় সন্ন্যাসীও ব্রতভ্রষ্ট হন, পদস্খলিত হন। তীব্র সাধননিষ্ঠ লোক না হ'লে এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করা বা সামলান বড় কষ্টকর।

স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাস-চ্যুতি

প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক আনুগত্যের ভাবও অনেক সন্ন্যাসীর চিত্ত বিক্ষেপের কারণ বটে, কিন্তু এজন্য দোষ দিব সন্ন্যাসীকে, স্ত্রীলোককে নয়। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" ব্রতচ্যুতির কারণ সত্ত্বেও যার ব্রতচ্যুতি ঘটে না, তাকেই বল্‌ব ব্রতনিষ্ঠ। জনকরাজগৃহে শুকদেব সপ্ত রজনী লোভনীয় স্ত্রীগণে পরিবেষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু কই তার ত' ব্রহ্মচর্য্য টুট্‌ল না। অষ্টাবক্র মুনির সাথে পশ্চিম-দিগ্‌বালা এক শয্যায় শয়ন ক'রে সমগ্র রাত কাটালেন, কিন্তু কই তাঁর ত' সংযমচ্যুতি ঘট্‌ল না। সন্ন্যাসীরা পতিত হয় সন্ন্যাসের দৃঢ়তার অভাবে, এজন্য স্ত্রীজাতিকে গাল দিয়ে কি লাভ হবে। দুর্ব্বলেরা নিজ দোষ পরের কাঁধে চাপায়। স্ত্রীলোকদিগকেও আমরা যে কামুকী, দুশ্চরিত্রা, পাপিষ্ঠা ব'লে গাল দেই, তার কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদের বলশালিতার অভাব।

স্ত্রীচরিত্রের উন্নতি-সাধন

প্রশ্নকর্ত্তার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল্‌ছি না, সকল স্ত্রীলোকই দেবী বা স্ত্রীলোকদের মধ্যে রাক্ষসী নেই। কিন্তু নিজেদের উন্নতি সাধনই যদি আমাদের লক্ষ্য হ'য়ে থাকে, তবে নিজেদের দোষত্রুটীগুলিকে দেখ্‌তে হবে সকলের আগে এবং সেগুলির সংশোধনও কত্তে হবে খুব

ত্বরিত। তারপরে আরো একটী প্রয়োজনীয় কাজ কত্তে হবে। সেটী হচ্ছে স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের চেষ্টা। তার মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে তাঁদের চরিত্রগত উন্নতি সাধনের আয়োজন। যতদিন পুরুষেরা ভাব্‌বে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের ভোগেরই জন্য সৃষ্ট, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরাও নিজেদিগকে ভোগেরই জন্য প্রস্তুত কত্তে বাধ্য হবে। সুতরাং নারীর নৈতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত কত্তে হ'লে, পুরুষদের ভোগবুদ্ধিকে সাধনের অনল দিয়ে, ত্যাগের সোহাগা দিয়ে পরিশোধিত ক'রে নিতে হবে।

কলিকাতা
৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪

নারীর প্রেরণা

বৈকাল বেলা চারিটা বাজিলে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনভঙ্গ করিলেন।

একটী যুবক স্ত্রীজাতির নিকট পুরুষের ঋণ কতখানি তদ্বিষয়ে নানা কথা বলিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণান্তর বলিলেন,—স্ত্রীজাতির নিকটে পুরুষজাতির ঋণ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কত্তে আমি অকৃপণ এবং মুক্তকণ্ঠ। নারীজাতির নিন্দা আমার কণ্ঠে কেউ কখনো শোনে নি, আর নারী-নিন্দকের অকৃতজ্ঞতাকে আমি কখনও ক্ষমা ক'রে উঠ্‌তে পারি না। তবু আমি বল্‌ব, নারীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই জগতের সব

বড় বড় কাজ হয়েছে, এ কথা ষোল আনা সত্য নয়। য়ুরোপের মধ্যযুগের 'নাইট'রা একটী সুন্দরীকে খুশী কর্ব্বার জন্যে অনেব অসাধ্য-সাধন করেছে, কিন্তু তাদের ঐ সব অসম-সাহসিক কার্য্যই জগতের যাবতীয় বড় কার্য্য নয়। স্ত্রীলোককে নিয়ে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে লড়াই হয়েছে, কিন্তু সেইগুলিই জগতের সব চাইতে বড় কাজ নয়। স্ত্রীর মুখের কথা শুনে তুলসীদাসের, আর রক্ষিতা-বেশ্যার কথা শুনে বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য সম্পাদিত হয়েছিল ব'লেই বলা যায় না যে, সব বৈরাগ্যবান্ মহাত্মাই স্ত্রীলোকের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। যীশু, বুদ্ধ, শঙ্করের জীবনের পশ্চাতে কোন্ নারী প্রেরণা যুগিয়েছে বল দেখি? কপিল, কণাদ, পতঞ্জলির জীবনের মূলদেশে কোন্ নারীর অঙ্গুলি-হেলন আছে বল দেখি? মায়ের বুকের স্তন্যে পুরুষেরা মহত্ত্বের উপকরণ পেয়েছে, এই মহাঋণ অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু কৃতজ্ঞ হব ব'লেই স্তাবক হ'তে হবে, এর কোনো মানে নেই। অশুদ্ধা নারী কখনো সত্যের প্রেরণা দিতে পারে না, শুধু লালসার আগুনেই ঘৃত ঢাল্‌তে পারে। আজ জগন্ময় সর্ব্বত্র নারীর জীবন অশুদ্ধতার পঙ্কিলতায় সমাচ্ছন্ন, এ নারী আবার প্রেরণা দেবে কি? এ নারী আবার প্রেরণা দেবে কাকে?

প্রেরণার উৎস

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—প্রেরণা আসে সত্য থেকে, নারী থেকেও নয়, পুরুষ থেকেও নয়। সত্য

প্রতিবিম্বিত হয়, শুদ্ধাত্মার জীবনে,—তিনি পুরুষই হউন, আর নারীই হউন। সত্যের জ্যোতিই তাঁকে সত্যান্বেষীদের দৃষ্টিগোচর করে, সত্যসন্ধদের সংস্পর্শে আনে। এর ফলে যদি কেউ পরার্থে প্রাণ দেবার প্রেরণা পায়, তবে তার জন্য ধন্যবাদ দাও সেই সত্যকে, যা এঁকে সত্যান্বেষীদের সংস্পর্শে এনেছে। সত্যই প্রেরণার উৎস, মানুষ নয়।

প্রেরণা ও বিক্ষেপ

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী যুবক একটী যুবতীকে বিয়ে কত্তে চেয়েছিলেন, আর সেই যুবতী অপর এক যুবককে বিয়ে কর্‌ল। এই দেখে প্রেমার্থী যুবক গিয়ে স্বদেশরক্ষী সৈনিকদলে ভর্ত্তি হলেন আর দিগ্বিজয় কর্ল্লেন,—এই ব্যাপারকে নারীর প্রেরণা বলা যায় না, বলতে হবে নারীর বিক্ষেপ। মনুষ্যত্বের বাজারে এই বিক্ষেপজ সৎকার্য্যের মূল্য খুব বেশী নয়। প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসা গিয়েছিল, সেই প্রণয়পুত্তলী স্ত্রীকেও যখন দেখা গেল ভ্রষ্টা দুশ্চরিত্রা ব'লে, তখন স্বামীটী সংসার-বিরাগী হ'য়ে হিমালয় গুহাতে মনের দুঃখে চৌদ্দ বছর ঊর্দ্ধবাহুতে থেকে তপস্যা কর্ল্লেন,—এ তপস্যার দাম খুব অধিক নয়। কেন না, এর উৎপত্তি প্রেরণা থেকে নয়, বিক্ষেপ থেকে। প্রেরণা স্বভাবের ধর্ম্ম, বিক্ষেপ স্বভাবের প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষেপের কারণীভূত ক্রিয়ার, যেমন ধর এস্থলে ভালভাসার, প্রতিষেধ হয় কিন্তু প্রেরণা দ্বারা নূতন জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রেরণা

নূতন নূতন কল্যাণময় সংস্কারকে গড়ে, বিক্ষেপ পূর্ব্বতন অকল্যাণময় সংস্কারকে ভাঙ্গে।

ভবিষ্যতের ভরসা

অদ্য শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য নামক একটী কলেজের ছাত্র শ্রীশ্রীবাবামণিকে দর্শন করিতে আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নাম কি হে?

শ্যামাদাস।—শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শ্যামাদাস? কবি কালিদাসের ভাই? না?

শ্যামাদাস হাসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্যামের দাসই হও, আর কালীর দাসই হও, তোমরাই কিন্তু আমার প্রভু। আমি যে জীবন ধারণ ক'রে ব'সে আছি, সে শুধু তোমাদের মুখের পবিত্রতার দীপ্তি দেখ্‌বার জন্যে। তোমরাই আমার উপাস্য দেবতা, তোমাদের ভিতর থেকেই ভবিষ্যতের মহামানবেরা দলে দলে আবির্ভূত হবেন, দুঃখদগ্ধ জগতে আনন্দের হাট বসাবেন। তাই আমি তোমাদের মুখের জ্যোৎস্নার পানে তাকিয়ে নিজের সুখদুঃখ ভুলে যাই। তোমাদের নাম জিজ্ঞেস্ কল্লে কি বল্‌বে রামদাস, শ্যামদাস, যদুদাস আর মধুদাস? না, তা' নয়। বল্‌বে উজ্জ্বল জীবন, অখণ্ড যৌবন, পবিত্র হৃদয়, মহান্ গৌরব, বিরাট মঙ্গল।

কলিকাতা

৬ই ভাদ্র, ১৩৩৪

চারিটা বাজিলে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনভঙ্গ করিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীযুক্ত ব—কে লইয়া গড়ের মাঠে চলিলেন।

নাম-সাধকের জীবন-লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত একটী সাধন-সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—এ গানটী থেকেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্ব্বি, তোদের জীবনের উদ্দেশ্য কত মহৎ। নামে দীক্ষিত হ'লেই কেউ সাধক হয় না, নামের একনিষ্ঠ সাধন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সাধন-লব্ধ যাবতীয় শক্তি জগৎকল্যাণে উৎসর্গ কত্তে হবে। তবেই হ'ল সাধক।

সাধ মহানাম জগৎ কল্যাণে
জ্বালাও অনল পরাণে পরাণে,
ছিঁড়িয়া মোহের মদির-বন্ধনে
কর আগুয়ান্ প্রাণ বলিদানে।

—প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাতে হবে, সকলের মোহাবদ্ধ চিত্তের শৃঙ্খল চূর্ণ কত্তে হবে, তোমার সাধনের শক্তি দিয়ে তাদের নিঃস্পন্দ বুকে আত্মোৎসর্গের সাহস যোগাতে হবে।

সুখের কামনা দাও ভুলাইয়া
আঁখির সলিল দাও মুছাইয়া,
অসীম আবেগে লহ মাতাইয়া,
কর ব্রতধারী পরম-সাধনে।

—পরার্থে প্রেরণা দিয়ে এদের পাগল ক'রে তোল, নিজের দুঃখে কাঁদবার কুরুচি এদের বদ্‌লে দাও।

সাধ যদি নাম করি দৃঢ়পণ
জড় দেহ মাঝে জাগিবে জীবন,
কঠিন পাষাণ করি বিদারণ
ঝরিবে নির্ঝর জলদ-গর্জ্জনে।

—মনে ভেবো না, তুমি কিছু কত্তে পার না। সব তুমি পারো। ভগবানের নাম-সাধনের বলে তুমি অসাধ্য-সাধন কত্তে পারো। নামের বলে তোমার জড়দেহের মাঝে চৈতন্যের সঞ্চার হবে, অপরের জড়দেহের মাঝেও চৈতন্যের সঞ্চারে তুমি সমর্থ হবে। নামের বলে তোমার পাষাণ-হৃদয় ভেঙ্গে চুরে করুণার গঙ্গা শতধারায় প্রবাহিত হবে, অপরের পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে মন্দাকিনী-প্রবাহ ছুটাবার সামর্থ্য তোমার হবে।—এতটা হবে, তবে তুমি সাধক। সাধক হওয়া সং-সাজা নয়, একটা নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দাঁড় করিয়ে ছলে বলে কৌশলে দলপুষ্টি নয়, বা অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-সৃষ্টি নয়, সাধক হ'লে জগৎ-কল্যাণে জীবন দিতে হয়। তোমার সাম্প্রদায়িক কোনো চিহ্ন নেই, সাম্প্রদায়িক কোনো গোঁড়ামি নেই, সাম্প্রদায়িক কোনো প্রচেষ্টা নেই,—তোমার আছে সাধনবলে নিয়ত আত্মোন্নতিবিধান এবং স্বকীয় উন্নত জীবনকে নিজ শক্তি, রুচি ও প্রকৃতির অনুরূপভাবে পরার্থে উৎসর্গদান।

সত্য নাম

শ্রীযুক্ত ব—জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামসাধনে কি সত্যই জীবে দয়া এবং পরার্থপরতা জন্মে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জন্মে। যে নামে তা' জন্মে না, তা' সত্য নাম নয়।

গুরু-তত্ত্ব

শ্রীযুক্ত ব—গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, আমাদের গুরুবাদ প্রচলিত গুরুবাদের সঙ্গে এক নয়। গুরুর দেহই কি গুরু? গুরুর নাক, কাণ, চোখ, মুখ, এসব কি গুরু? যিনি নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ, তিনিই গুরু। যিনি অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। অন্ধকার দূর করে কে? আলো, না, আলোর বাহক? আলোই গুরু, লণ্ঠনটা গুরু নয়। লণ্ঠনটার ভিতর দিয়ে তুমি আলোর প্রকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাই লণ্ঠনটার অত আদর, অত যত্ন। আলোহীন লণ্ঠনকে যত্ন কর কি? নিত্যানন্দময় পরব্রহ্মই শ্রীগুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই মন্ত্র, তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত, তিনিই জ্ঞেয়রূপে অপ্রকাশিত। তিনিই মনুষ্যদেহ হ'য়েছেন, কিন্তু মনুষ্যদেহটাই তাঁর সবটুকু নয়। মনুষ্যদেহ সসীম, তিনি অসীম। মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র, তিনি ভূমা। সসীম দেহে অসীমের স্পর্শ আছে, তাই এ দেহের মান। এই ক্ষুদ্র দেহে ভূমার লীলা হচ্ছে, তাই এ দেহের গৌরব। মানব-গুরু উপলক্ষ্য, পরমগুরু লক্ষ্য ; মানবগুরু পন্থা-প্রদর্শক, পরমগুরু

পথ, লক্ষ্য ও প্রদর্শক সবই একাধারে।

ব।—এ কঠিন গুরুবাদ যে বোধগম্য হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একদিনে হবে কেন? সাধন কত্তে কত্তে হবে। পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতাই তোমার গুরু, সাধন পাওয়ার পরে নামই তোমার গুরু, পূর্ণজ্ঞানাবস্থায় পরমাত্মা তোমার গুরু। তুমি যতটা বড়, তোমার গুরুও সেই অনুপাতেই বড়। তুমি যখন সাধন-জগতের দুগ্ধ পোষা শিশু, তখন মানব-গুরু তোমার চরম। তুমি যখন নিজ পায়ে ভর দিতে পাচ্ছ, তখন নাম-গুরু তোমার চরম। তুমি যখন আত্মাকে চিনেছ, তখন ব্রহ্মগুরু তোমার সর্ব্বস্বধন।

নেতি পন্থা

এই সময়ে বৃষ্টি হইতেছিল। শ্রীযুক্ত ব—র হাতে ছাতা ছিল কিন্তু ছাতা দ্বারা বৃষ্টি প্রতিরুদ্ধ হইতেছিল না। গড়ের মাঠ হইতে ইডেন গার্ডেনে গিয়া ইঁহারা উপবেশন করিলেন এবং একটা বেঞ্চিতে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের মধ্যেই ত' তিনি শেষ হ'য়ে যেতে পারেন না! ধর, কৃষ্ণরূপকে নিয়ে তোমার সাধন-ভজন আরম্ভ হয়েছে, হোক্। কিন্তু এইখানেই ইতি হবে না, বুঝ্‌তে হবে যে, আরো আছে। আমরা নেতি-পন্থী। নেতি মানে ন-ইতি। ইতি মানে শেষ। নেতি মানে

শেষ-নহে। সুতরাং নেতি-পন্থী বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে সেই পন্থী, যে পন্থীরা সাধনের সর্ব্বাবস্থায় মনে রাখে, "এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।" আর এক প্রকারের নেতিবিচার আছে, সেটা হচ্ছে আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁর মতানুবর্ত্তীদের। তাঁরা বলেন, নেতি—ইহা নহে। তোমার নাকটা কি ব্রহ্ম? নেতি,—না, ইহা নহে। তোমার সমস্ত মুখখানা কি ব্রহ্ম? নেতি,—না, ইহা নহে। তোমার সমগ্র দেহখানা কি ব্রহ্ম? নেতি,—না, ইহা নহে। তোমার দেহাতিরিক্ত মনটা কি ব্রহ্ম? নেতি,—না, ইহা নহে। এই জগৎটা কি ব্রহ্ম? নেতি,—না, ইহা নহে। সুতরাং ব্রহ্ম ছাড়া যখন অর কিছুই নেই এবং জগৎটাও ব্রহ্ম নয়, তখন জগৎটা কি? না, জগৎটা মিথ্যা, জগৎটা মায়া, জগৎটা রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, কাচে হীরকভ্রম। এইভাবে নেতি-বিচার কত্তে গিয়ে শঙ্কর-পন্থীরা জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের নেতি-বিচার আলাদা। তোমার নাকটা কি ব্রহ্ম? 'নেতি',—অর্থাৎ ব্রহ্ম বটে, কিন্তু এখানেই ইতি হ'য়ে যায় নি, আরো আছে। তোমার চক্ষু-কর্ণাদি সমন্বিত মুখমণ্ডল কি ব্রহ্ম? তোমার উত্তর হবে, ব্রহ্ম বৈকি, তবে 'নেতি'—এইখানেই ব্রহ্মের ইতি হ'য়ে যায় নি, ব্রহ্মতত্ত্বের আরও অনেকটা বলা বাকী রইল। তোমার সমগ্র দেহটাই কি তবে ব্রহ্ম? তুমি উত্তর দেবে, ব্রহ্ম যে তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু 'নেতি',—অর্থাৎ এইখানেই ব্রহ্মের ইতি নয়, আরো এগিয়ে যাও, ব্রহ্মতত্ত্বের আরো রহস্য তোমার কাছে পরিস্ফুট হবে। তোমার মনটা কি ব্রহ্ম? উত্তর হবে, নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের এখানেও শেষ হ'ল না, এখানেও 'ইতি'

হ'ল না। এই বিশ্বজগৎ কি ব্রহ্ম? তুমি বল্‌বে, হাঁ, বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম কিন্তু 'নেতি',—এখানেই ব্রহ্মের ইতি নয়, আরো আছে, সাধন কর, বুঝ্‌তে পার্ব্বে। এই ভাবের নেতি-বিচার ক'রে তুমি জগৎটাকে সত্যময় ব'লে জান্‌বে। তাই তোমার কাছে মানুষ-গুরুও গুরু, ব্রহ্ম-গুরুও গুরু। তাই তোমার কাছে দরিদ্রকে অন্নদানও ভগবানেরই পূজা, কালী-মূর্ত্তির অর্চ্চনাও ভগবানেরই পূজা, আবার নিরাকার পরব্রহ্মের তত্ত্বচিন্তনও ভগবানেরই পূজা। শুধু অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্নরূপ চর্চ্চা।

দার্শনিক মতবাদের স্বাধীনতা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে নেতি-বিচারের পদ্ধতি, যাতে 'নেতি' ব'ল্লে, "ইহা নহে" বুঝায় না, "ইহা-ত' বটেই, পরন্তু আরো আছে" বুঝায়, এ পদ্ধতি তোমাদের একটা বিশেষত্ব। কেন এটা তোমাদের বিশেষত্ব? কেন শিষ্য জগৎটাকে সত্য ব'লে গ্রহণ কত্তে যাবে? গুরু বলেছেন 'সত্য', তারই জন্যে কি? না, তার জন্যে নয়। গুরু যদি বল্‌তেন 'মিথ্যা', তবু শিষ্যকে সত্য ব'লেই গ্রহণ কত্তে হ'ত। কারণ, তোমার সাধকত্বের প্রথম লক্ষণ,—প্রত্যক্ষের উপরে বিশ্বাস স্থাপন, দ্বিতীয় লক্ষণ,—সহজবুদ্ধিকে উৎপীড়িত না ক'রে তার অনুগতভাবে, তার অনুকূল ভাবে মতবাদ গঠন। তুমি কোনো জোর ক'রে চাপান Theory (মতবাদ)-কে মান্‌বে না, যে Theory (মতবাদ) তোমার প্রত্যক্ষের দ্বারাই পুষ্ট, তোমার সহজ বুদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত,

তুমি শুধু সেই Theory (মতবাদ)-ই স্বীকার কর্ব্বে। তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও তোমার সহজবুদ্ধি যদি জগৎকে মায়া ব'লে অনুভব করে, তবে মায়াবাদই তোমার সাধনভজনের দার্শনিক ভিত্তি হবে, এমন কি তোমার গুরু যদি মায়াবাদ-বিরোধীও হন, তবু। কারণ, সর্ব্বতোমুখিনী স্বাধীনতাই তোমার জীবনের মূল ভিত্তি। তবে যে বল্‌ছি, জগৎটাকে মায়া-মরীচিকা ব'লে মনে না করা, জগৎটাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করা, তোমার একটা বিশেষত্ব, তার কারণ এই নয় যে, গুরু শিষ্যকে বল্‌ছেন জগৎটা সত্য, পরন্তু প্রত্যেক সাধন পিপাসু মানুষ তার সহজবুদ্ধির প্রেরণায় জগৎটাকে প্রথম থেকে সত্য ব'লেই মনে করে, শেষে গিয়ে তার বিশ্বাস যেখানেই ঠেকুক। তার এই যে সহজ বুদ্ধির মর্য্যাদা, তাকে রক্ষা করাতেই তোমার গুরুর কৃতিত্ব। নাম-সাধনের ফলে যদি তোমার সহজ বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তোমার দার্শনিক মতবাদও সেই সহজ বুদ্ধির পোষণানুরূপ পুষ্ট হোক্, এ স্বাধীনতা তোমার আছে।

কলিকাতা
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৪

শুদ্ধা ভক্তি

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তির বিকাশের মূল কথাটা হ'ল এই যে, তুমি নিজেকে যাঁর আশ্রিত ব'লে মেনে নিয়েছ, তাঁকে অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী,

অপ্রতিম, অনন্যসাধারণ ও একমাত্র গতি ব'লে বুঝে নিয়েছ কিনা। তাঁকে যদি একমাত্র শরণ ব'লে বুঝে থাক, তাহ'লে সম্পদেও তিনি তোমার আশ্রয়, বিপদেও তিনিই তোমার অবলম্বন। নিজেকে বহুজনের আশ্রিত ব'লে মনে করার মত অসহায়তা জগতে আর কিছু নেই। তুমি যাঁর আশ্রিত, জীবনে মরণে একমাত্র তাঁরই আশ্রিত, অন্য কারো আশ্রয়, সহায়তা, আনুকূল্য, আশীর্ব্বাদ, অনুকম্পা তোমার প্রয়োজন নয়, ঐ একজনের আশীর্ব্বাদে, শুভেচ্ছায়, স্নেহদৃষ্টিতে সব হ'তে পারে। এই বিশ্বাসটীকে অন্তরে দৃঢ় না কর্ত্তে পার্ল্লে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হ'তে পারে না। শুদ্ধা ভক্তির নিষ্ঠা হচ্ছে অব্যভিচারিণী, সে কখনো দ্বিচারিণী হবে না, হ'তে পারে না।

কলিকাতা
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৪

যৌগিক বিভূতি ও নেতি-পন্থা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অখণ্ড-সাধকের নেতি পন্থা সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিলেন,—ব্রহ্মনিরূপণে বিচারের দিকে অখণ্ড-সাধক যেমন ভাবেন 'নেতি,—ন—ইতি, ইতি নহে, শেষ হয় নাই, আরো বাকী আছে', ঠিক তেমনি সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে যখন নানাপ্রকার বিভূতি লাভ করেন, তখনো তেমনি, ভাবেন—'নেতি, ন—ইতি, সাধনের শেষ এখনো হয় নি, আরো সাধন বাকী আছে।' বিভূতিলাভ সাধনের স্বাভাবিক ফল, সাধন কর্ল্লে

ওসব আপনি এসে যায়। বিভূতি দেখে যে ভোলে, সে সাধন ছেড়ে দেয়, বিভূতির জালেই বদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

যৌগিক বিভূতি ও পরোপকার

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু বিভূতির বলে ত' লোকের অনেক উপকারও করা যায়। তবে বিভূতি নিন্দনীয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওসব উপকার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর উপকার। স্থায়ী মূল্য কিছুই নেই। বিশেষতঃ বিভূতি-বলে যাঁরা পরোপকার করেন, ক্রমে ক্রমে তাঁদের শক্তিক্ষয় ঘটে, পরোপকার-প্রবৃত্তির স্থানে পরের উপরে কর্ত্তৃত্ব-প্রয়াস জন্মে, নাম-যশের প্রতি চিত্ত লুব্ধ হয়, শেষে মন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে পড়ে এবং দু'দিন আগে যিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী মহাত্মা, দু'দিন পরে তিনিই হন ঘোরতর বিষয়ী। যৌগিক বিভূতি সাধককে পরমাত্মার স্পর্শ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। ব্রহ্মত্বে যাঁর অধিকার, ক্ষুদ্রত্বে তাঁকে রুচিমান্ করে।

পরোপকারের প্রকৃষ্ট পন্থা

প্রশ্নকর্ত্তা একজন যৌগিক বিভূতি-সম্পন্ন মহাত্মার নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন,—অনেক দুরারোগ্য রোগী তাঁর স্পর্শমাত্রে আরোগ্য লাভ কচ্ছে। এতে কি পরোপকারই হ'ল না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হ'ল সন্দেহ নেই কিন্তু প্রকৃষ্ট পরোপকার হ'ল না। শক্তিমান্ যোগীর ইচ্ছামাত্রে তাঁর রোগ-

যন্ত্রণার অবসান হ'ল বটে, কিন্তু যোগীর স্পর্শে রোগীর রোগের অবসান না হ'য়ে যদি তার ভিতরে সেই শক্তির উন্মেষ ঘট্‌ত, যার বলে সে নিজেই নিজেকে রোগমুক্ত কত্তে পারে, তাহ'লে রোগীর বেশী উপকার হত। তোমাকে আমি ধন দান কর্ল্লাম, এতে আমার পরোপকার-শক্তির যে উৎকর্ষ, তোমাকে আমি ধনার্জ্জনের ক্ষমতা দান কর্ল্লাম, এতে আমার পরোপকারশক্তির অধিকতর উৎকর্ষ। তোমাকে আমি আরোগ্য দান কর্ল্লাম, কিন্তু পুনরায় রোগে পড়্‌বার এতে বাধা রইল না; পরন্তু তোমার আরোগ্য তোমার নিজের শক্তির মধ্য দিয়েই যদি আসে, তোমার পুনরাক্রমণের ভয় থাক্‌বে না। তোমার আত্মশক্তির চেতনা সম্পাদনই হচ্ছে সব চাইতে বড় পরোপকার, সব চাইতে স্থায়ী পরোপকার। কিন্তু বিভূতিমুগ্ধ যোগী এই স্থায়ী পরোপকার কত্তে অক্ষম হন। তার এক কারণ, তিনি নিজেই হচ্ছেন বিভূতির দাস, দ্বিতীয় কারণ, যারা তার সঙ্গের জন্য লোলুপ হয়, তারা আসে দাস-মনোবৃত্তি নিয়ে, আত্মশ্রদ্ধার অভাব নিয়ে, পরানুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

শ্রেষ্ঠ যোগী

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি যোগীদের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সাধন কত্তে কত্তে বিভূতি লাভ হয় প্রত্যেক যোগীরই। কিন্তু এক শ্রেণীর যোগী কয়েকটা মাত্র বিভূতি লাভ ক'রেই মুগ্ধ হ'য়ে যান, সাধন-পথে আর

অগ্রসর হন না বা লোক-সমাজে নিজ কৃতিত্ব জাহির কর্ব্বার জন্যে এত উৎসুক হ'য়ে পড়েন যে, সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়ে কেবল বিভূতি প্রদর্শনেই বিব্রত হ'য়ে পড়েন। এঁরা অধম শ্রেণীর যোগী। আর এক শ্রেণীর যোগী আছেন, যাঁরা বিভূতি পেয়েই মুগ্ধ হন না, বরঞ্চ আরও বিভূতি লাভের জন্য লুব্ধ হন এবং সাধনের মাত্রা বাড়াতে বাড়াতেই চলেন। এঁরা বিভূতিমুগ্ধ যোগীদের চাইতে কিছু উন্নত। আর এক শ্রেণীর যোগী আছেন, তাঁরা বিভূতি লাভ হ'লেও উল্লসিত হন না, না লাভ হ'লেও হতাশ হন না, পরন্তু একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধনই ক'রে যান; সাধনের দ্বারা এঁরা যে চিত্তশুদ্ধি লাভ কারন, লোক-কল্যাণে শুধু তাকেই ব্যবহার করেন, দৈবী বিভূতির শরণাপন্ন হন না। এরা উত্তম শ্রেণীর যোগী। বিভূতি-মুগ্ধ যোগী তাঁর প্রভাব দিয়ে জনসমাজের স্বাধীন মনোবৃত্তিকে নষ্ট করেন, নিজেও অশুদ্ধতার জঞ্জালে জড়িয়ে পড়েন। এই জন্যই তিনি অধম। বিভূতি-লুব্ধ যোগীর লক্ষ্যটা ছোট হ'লেও আকাঙ্ক্ষাটা অতিশয় তীব্র থাকে ব'লে তিনি সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন, ফলে সাধন কত্তে কত্তে তাঁর বিভূতি-লিপ্সা অনেক সময় আপনা হ'তেই দূর হ'য়ে যায়। এই জন্যই তিনি উত্তম। আর, বিভূতির প্রতি উদাসীন যোগী নিজের শুদ্ধ চিত্তের স্পর্শ দিয়ে অপরের অশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধ করেন, নিজের আত্মস্থ চিত্ত দিয়ে অপরের অনাত্মস্থ চিত্তকে আত্মস্থ করেন, নিজের নির্ব্বিকার মন দিয়ে অপরের মনের বিকার ধ্বংস করেন, নিজের আত্মশ্রদ্ধার প্রভাব

দিয়ে অপরের ঘুমন্ত আত্মশ্রদ্ধাকে জাগিয়ে তোলেন। এই জন্যই ইনি শ্রেষ্ঠ যোগী।

বিভূতি, না বিপদ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিভূতিগুলি সাধকের সাধন-নিষ্ঠার পরীক্ষা মাত্র। বিভূতিকে সম্পদ ব'লে মনে করা ভুল। দু'দিন সাধন ক'রেই দেখ্‌তে পেলাম যে, অনায়াসে আমি পশুপক্ষীর ভাষা বুঝ্‌তে পারি, অপরের রোগ নিজ শরীরে গ্রহণ কত্তে পারি, অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সমগ্র জীবনের বৃত্তান্ত ব'লে দিতে পারি, কে কখন কি কথাটা ভাব্‌ছে, তা' বুঝতে পারি, কলকাতায় ব'সে লক্ষ্ণৌর খেয়ালীর গান শুনতে পারি, কামরূপে শুয়ে শুয়ে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাত্মাদের কীর্ত্তনানন্দের ভাগ নিতে পারি—আর কি, আমি একটা হনু রে, ব'লে উল্লাসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে দিলাম সাধন ছেড়ে! তার ফল কি? না, গভীর পতন,—নৈতিক পতন, আধ্যাত্মিক পতন, সার্ব্বাঙ্গিক পতন। দুদিন সাধন ক'রেই দেখতে পেলাম, পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হচ্ছে, কখন কোন্ সুর-নর-তির্যক্ যোনিতে ভ্রমণ করেছে, তার স্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে, যখন যেখানে অবস্থান কচ্ছি, তখন সেই স্থানটাকে ইচ্ছামত পদ্মের গন্ধে, চন্দনের গন্ধে, আতরের গন্ধে, বেলফুলের গন্ধে আমোদিত ক'রে দিতে পাচ্ছি, স্পর্শমাত্র মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর রোগীর রোগ-যন্ত্রণা দূর কত্তে পাচ্ছি,—আর যাই কোথায়, অহঙ্কার এল, সাধন ছাড়লাম, বুজরুকী নিয়েই

ভুল্লাম, আর ডুব্লাম গিয়ে নরকে। দু'দিন সাধন ক'রেই দেখ্তে পেলাম, কথা বল্লেই তা' ফলে, মনে মনে সরবৎ চাইলে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি তা' অবিলম্বে এনে হাজির করে, কাউকে অভিসম্পাত কর্ল্লে তার একটা না একটা অনিষ্ট না হ'য়েই যায় না, খোলা চক্ষে দিগন্ত-বিস্তৃত মহাকালী মূর্ত্তি দেখ্তে পাই, কত দিব্য শব্দ শ্রবণ করি, সাইবেরিয়ার পারদের খনির দৃশ্য কুমিল্লায় ব'সে দেখ্তে পাই,—আর ভাব্না কি, অহঙ্কারে গদ-গদ, ভূমিতে না পড়ে পদ, চল্লাম আমি দ্রুতগতিতে জাহান্নমের পথে। এ ভাবে জগতের সহস্র সহস্র সাধক বিভূতি লাভ ক'রে তা' হজম কর্ব্বার ক্ষমতার অভাবে চিরতলে রসাতলে তলিয়ে গিয়েছেন। এই জন্যই বলি, বিভূতির অপর নাম ঐশ্বর্য্য হলেও, সম্পদ এটা নয়ই, এটা হচ্ছে সাধন-জীবনের চূড়ান্ত বিপদ।

ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীযুক্ত অ—বলিলেন,—দেখুন স্বামীজী, এই যে আপনি ব্রহ্মচর্য্য সদাচার, ত্যাগ প্রভৃতি প্রচার করেন, অনেক সময় আমার মনে হয়, এটা একটা গোঁড়ামি।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—গোঁড়ামি কি রকম?

অ।—এই ভোগসমর্থ দেহ রয়েছে, ভোগ্য সামগ্রীও সম্মুখে। তবু আমাকে সংযত হ'তে হবে কেন? ভোগ করা এখানে প্রকৃতির প্রেরণা। প্রকৃতির ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন এই যে, ত্যাগ ব'লে কোনো বস্তু জগতে নেই। এ জগতে ভোগবাদই একমাত্র সত্য। কিন্তু তোমার অপরিণত মন যাকে ভোগ ব'লে সিদ্ধান্ত কচ্ছে, সেইটুকুই ভোগের চূড়ান্ত নয়। ভোগের যিনি কর্ত্তা, সেই তুমি অসীম। তোমার ভোগও অসীম হবে, তোমার ভোগ্যবস্তুও অসীম হবে। নিজের অসীমত্বকে জান্তে পাচ্ছ না ব'লে সসীম বস্তুকেই তোমার চরম ভোগ্য ব'লে ভুল কচ্ছ। ক্ষুদ্র ভোগকে নিয়েই তুমি ভু'লে না থাক, অনন্ত ভোগের সমুদ্রে যাতে তুমি ডুবতে পার, তারই জন্য তোমার ব্রহ্মচর্য্য, তারই জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম। স্থূল মন স্থূল ভোগকেই ভোগের পরাকাষ্ঠা ভাব্ছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ভগবৎ-সাধনা তোমাকে সূক্ষ্মতর ভোগের স্বরূপ বুঝ্তে দেবে, তখন তুমি ছোট ছেড়ে বড় ভোগের পানে ছুটতে পার্ব্বে।

অ।—আপনি স্বয়ং একজন ত্যাগী। অথচ আপনার মুখেই শুন্ছি, এ জগতে ভোগবাদই সত্য, ত্যাগ ব'লে কোনও বস্তু নেই। এর তাৎপর্য্য বুঝ্তে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আমরা মলমূত্র ত্যাগ করি কেন হে? মলমূত্র ত্যাগ না কল্লে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ অসম্ভব। মলমূত্রের চাইতে খাদ্য-পানীয় উৎকৃষ্ট বস্তু। খাদ্য-পানীয়কে ভোগ করার জন্যে আমরা মলমূত্রকে ত্যাগ করি। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করার জন্যে নিকৃষ্ট বস্তুকে ত্যাগ করি। এখানে ভোগটাই আমার আসল প্রার্থিত, ত্যাগটা অবস্থার সৃষ্টি। যা ত্যাগ না

কর্ল্লে পূর্ণ সুখ পাচ্ছি না, তাকে ত্যাগ কচ্ছি, পূর্ণ সুখের অনুরোধে। উৎকৃষ্টকে ভোগ কত্তে হ'লে নিকৃষ্টকে ত্যাগ কত্তে হবে, তাই আমার ত্যাগ। ভগবানের প্রেমরস ভোগ কত্তে হ'লে বিষয়ের কামরস ত্যাগ কত্তে হয়, তাই আমার ব্রহ্মচর্য্য, তাই আমার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত মানে দাঁড়াচ্ছে উৎকৃষ্টতম-ভোগ। আমি যে ভোগকে সত্য ব'লে মান্‌ছি, সেটা 'eat, drink and be merry (খাও, দাও, মজা মারো)'র দলের ভোগ নয়, সেটা হচ্ছে পরমশ্রেষ্ঠ ভোগের পায়ে নিকৃষ্টতর সকল ভোগকে নির্ম্মমভাবে বলিদান, পরমোৎকৃষ্ট সুখের যজ্ঞাগ্নিতে ক্ষণিক সুখকে আহুতি দান।

কলিকাতা

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৪

আমিষ ও নিরামিষ

অদ্য আমিষ ও নিরামিষ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমিষ বা নিরামিষ সম্বন্ধে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ, একই বস্তু পাত্রভেদে কারো পক্ষে বিষ, কারো পক্ষে অমৃত। আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব দলাদলি আছে। আমাদের দেশেও শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে এই ঝগড়া আছে। কিন্তু শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়ার যুক্তির চাইতে সংস্কারের প্রাবল্য বেশী, য়ুরোপে সংস্কারের চাইতে যুক্তির কাটাকাটি বেশী।

পাশ্চাত্যে দুই দলই নিজেদের মতামতকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সমর্থন কচ্ছেন। একদল বল্‌ছেন—মাংসে protein আছে, সুতরাং মাংস খাও। আর এক দল বল্‌ছেন,—তরিতরকারীতে লোক দীর্ঘজীবী হয়, মাংসের চাইতে দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ,—ইত্যাদি। সম্প্রতি ''ভাইটামিন''-তত্ত্ব আবিস্কারের পর থেকে নিরামিষাশীদের দিকেই বিজ্ঞানের সমর্থন বেশী হচ্ছে। মোটের উপর নিরপেক্ষভাবে এই বলা যায় যে, যাঁরা মস্তিস্কের শ্রম বেশী করেন, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ, আর যাঁরা দেহের পরিশ্রম বেশী করেন, তাঁদের পক্ষে আমিষ অধিকতর উপযোগী। যাঁরা দীর্ঘকাল সম-প্রযত্নে কোনও কাজ কত্তে চান, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ, আর যাঁরা অল্প সময় মধ্যে কাজ শেষ ক'রে ফেল্‌তে ব্যস্ত, তাঁদের পক্ষে আমিষ উপযোগী। শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে আমিষ এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে নিরামিষ উপযোগী। বাল্য ও বার্দ্ধক্যে নিরামিষ এবং যৌবনে আমিষ উপযোগী।

মাংসাহার ও স্বাধীনতা

প্রশ্ন।—কেউ কেউ বল্‌ছেন, মাংসাহারের প্রচলন কম ব'লেই ভারতবাসীর সামরিক শক্তি নেই, এই জন্যই নাকি ভারত পরাধীন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওটা তাদের কল্পনা-প্রসূত অনুমান। কু-যুক্তি দিয়ে যাঁরা মাংসাহারের সমর্থন করেন, জানবে, অধিকাংশ স্থলে উদরপরায়ণতাই তাঁদের যুক্তির গোড়াঘরে ব'সে আছে।

ভারতবাসী যে পরাধীন হ'য়েছে, তার কারণ, মাংসহারের অভাব নয়—সঙ্ঘবদ্ধতা, একতা ও সমপ্রাণতার অভাবই তার কারণ। মোগল-পাঠানের বংশধররা ত' আর হবিষ্যি কত্তেন না। ইংরেজ তাদের হাত থেকে রাজ্য নিলেন কিসের সুযোগে? মাংসভোজী বিশালকায় মোগলদের সাথে মারাঠারা চানাচুর খেয়ে লড়াই দিয়েছিলেন। কোন্ শক্তিতে তাঁরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ঔরঙ্গজেবের পরাক্রমকে উপহাস ক'রে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেল্লেন বল দেখি? জাতিগঠনের মূলমন্ত্র কখনো মাংসাহার বা নিরামিষাহার হ'তে পারে না, ওটা ব্যক্তিগত ব্যবস্থা মাত্র, যার যেমন রুচি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন, সে তেমন আহার কর্ব্বে। জাতিগঠনের মূল মন্ত্র হ'ল সঙ্ঘবদ্ধতা। গোখাদক আর শূকরভোজী, নাপ্পি-সেবী আর হবিষ্যাশী যেদিন আহারের ভেদকে ঐক্যের বিঘ্নরূপে না নিয়ে স্বদেশসেবায় জাতীয় হিতসাধনে এক হবে, সেদিনই ভারতবর্ষ জগতের কাছে নিজ জীবনবত্তার প্রমাণ দিতে পার্ব্বে। আহার সম্বন্ধে যে যেমন শৃঙ্খলা মান্‌তে চায় মানুক, তাতে কখনো কোনো জাতির স্বাধীনতা আট্‌কে থাকে না। বরঞ্চ, একজন যাকে অখাদ্য মনে ক'রে বর্জ্জন করেছে, তাকে যদি জোর ক'রে তাই খাওয়াতে যাও, তবে তাতেই স্বাধীনতা দুর্ব্বল হবে।

স্বাধীনতা ও ত্যাগবুদ্ধি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বাধীনতা লাভের জন্য

সব চাইতে বড় প্রয়োজন যেই জিনিষটা, তার নাম ত্যাগবুদ্ধি। সমগ্র জাতির মধ্যে যদি ত্যাগবুদ্ধির না উন্মেষ ঘটান যায়, উচ্চ নীচ, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর দেশবাসীর ভিতরে যদি পরার্থ-প্রেরণা না সঞ্চারিত করা যায় তা হ'লে অন্যদিকে আয়োজন যতই পাকা হোক না কেন, স্বাধীনতার বিশাল হর্ম্ম্য চ'খের পলকে ধ্ব'সে প'ড়ে যাবে। অর্থাৎ স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে নূতনতর পরাধীনতার সহিত আপোষ কত্তে হবে, নূতনতর নানা অবাঞ্ছনীয় দুঃখদৈন্যের নিষ্পেষণ বিনা প্রতিবাদে সহ্য কত্তে হবে।

কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩৩৪

জীবে প্রেম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি একটা বালকের নিকটে কবিতায় একখানা পত্র লিখিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সর্ব্বজীবে ভালবাসা যার,
সে-ই ত' অজ্ঞান-জীবে
করিবে উদ্ধার।
সবারে যে আপনার জানে,
সেই ত' ঢালিবে সুধা
সকলের প্রাণে।
সবারে যে ডাকে হাসিমুখে,

সেই ত' জাগায় প্রেম
সকলের বুকে।
ব্যথিতই দেবতা যাহার,
সেই ত' অর্চ্চনা পায়
যত দেবতার।
পরদুঃখে চ'খে যার জল,
সেই ত' সবার বুকে
বাড়াইবে বল।
পরেরে যে দেয় এ জীবন,
তাহারে পরশ কভু
করে না মরণ।
প্রেম যার সকলের লাগি,
তার প্রতি ত্রিভুবন
হয় অনুরাগী।
দিবি যদি, দে' না তোর প্রাণ,
যে ভাবে করিলে দান
সকলের ত্রাণ।"

গুরু ও শিষ্য

বৈকালে শ্রীশ্রীবাবামণি নাসিরাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প—কে লইয়া হেদুয়ার পুকুরে বেড়াইতে গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু কে জান? ব্রহ্মই গুরু। তবে

মানুষটাকে গুরু ব'লে মান কেন? না, পথ দিয়ে তুমি যাচ্ছ, হঠাৎ গর্ত্তে প'ড়ে গেলে। যাকেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাকেই বল্‌ছ, তোমাকে টেনে তুলে নিতে। কেউ নিচ্ছে না। একজন এসে বল্লে,—আমি তোকে তুল্‌ব, কিন্তু আমাকে বাপ্‌ ডাকতে হবে। তুমি বল্লে,—সে কি, বাপ্‌ যে আমার একজন রয়েছে, যে-পথে চল্‌তে চল্‌তে পড়ে গেলাম, সেই পথেরই শেষ সীমানায় তাঁর বাস, তিনি থাক্‌তে তোমাকে আবার বাপ্‌ ডাক্‌ব কেন? সে বল্লে,—ওসব শুন্‌ছি না, আগে বাপ্‌ ডাকো, তারপরে তুল্‌ব। অগত্যা তুমি বাপ্‌ ডাক্‌লে। তখন সে তোমাকে টেনে তুল্লে এবং পিতৃ-সম্বোধনে স্নেহমুগ্ধ হ'য়ে তোমার হাতে একগাছা লাঠি দিয়ে বল্লে,—অন্ধকারে চল্‌তে এই লাঠিখানা দিয়ে পথ ঠিক ক'রে নিও, তাহ'লে আর গর্ত্তে পড়্‌বে না। তারপরে তুমি এগিয়ে গেলে। গুরু-শিষ্যও এইরূপ। পথে না উঠা পর্য্যন্তই গুরু-শিষ্যে সম্বন্ধ, পথ পেলে যত সম্বন্ধ সব ঐ পরম গুরুর সঙ্গে।

গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা

প।—কৃতজ্ঞতা কি নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আছে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বিতরণই সদ্‌গুরুর কাজ, অনন্ত মুক্তির দিকে প্রেরণা দেওয়াই সদ্‌গুরুর স্বভাব, চালকলার যোগাড়ে তাঁর মন নেই বা পূজাপ্রাপ্তিতে তাঁর রুচি নেই, তোমার উন্নতিতেই তাঁর আনন্দ, তোমার কল্যাণেই তিনি খুশী। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে,

প্রাণপণে আত্মগঠন আর প্রাণপণে অগ্রগমন। তুমি যদি পথ এগিয়ে না যাও, তবে তাঁর মহৎ প্রাণের মহৎ উদ্দেশ্যটী সফল হ'ল না, তিনি ব্যর্থকাম হ'লেন, এতে অকৃতজ্ঞতাই হ'ল। ফুলদল দিয়ে গুরুর পাদপদ্ম পূজা কল্লেই কৃতজ্ঞতা হ'ল না, তাঁকে অবতার ব'লে প্রচার কর্ল্লেও না, কিম্বা তাঁর নামে গান বেঁধে খোল করতাল বাজিয়ে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে বেড়ালেও না।

গুরু সর্ব্বময়

প—প্রণত হইয়া বিদায় নিতে উদ্যত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কেবল সাধন ক'রে যাও বাবা, সাধন ক'রে যাও। সাধন কত্তে কত্তে একদিন সত্যিকারের উপলব্ধিতে জেগে উঠবে যে, গুরু সর্ব্বময়, গুরু চিন্ময়, মৃন্ময়, মনোময় গুরু চিদতীত, মৃদতীত, মানসাতীত, লণ্ঠনও গুরু, আলোও গুরু, তৈলও গুরু, সলিতাও গুরু, মানুষও গুরু, ব্রহ্মও গুরু, শিষ্যও গুরু, সাধকও গুরু। গুরুর সেই সর্ব্বময় সত্তাকে নিজ উপলব্ধি দ্বারা জেনে নিয়ে তারপরে তুমি মানুষ গুরুকে কর না সর্ব্ব অন্তর দিয়ে পূজা, সর্ব্বস্ব দিয়ে অর্চ্চনা। তাতে কোনো ভুল হবে না।

কলিকাতা

১২ই ভাদ্র, ১৩৩৪

রূপধ্যান

সাচিয়াখালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃ—বলিলেন, নাম জপ

করিবার কালে রূপের ধ্যান না ক'রে যে আমরা পারি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পার না যখন তখন রূপের ধ্যান কর্ব্বে। কিন্তু যখন বুঝ্‌বে যে পার্‌বে তখন রূপধ্যান না ক'রে নামই জপতে থাক্‌বে। নামজপের প্রগাঢ় অবস্থায় আপনি রূপের বিকাশ হবে। এই রূপ স্বয়ম্প্রকাশ রূপ, কোনও প্রকার কল্পিত রূপ নয়।

কৃ—স্বয়ম্প্রকাশ রূপ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কল্পনা না কর্‌লেও যে রূপটী আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। তোমার সসীম মনটী দিয়ে অসীমকে ত' কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাই মন দিয়ে যতক্ষণ ভগবান্‌কে ধরতে চেষ্টা কর্ব্বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কল্পিত রূপই আস্‌বে, সসীম রূপই দেখ্‌তে পাবে। নামজপ কত্তে কত্তে মন যখন অসীমকে ধারণ করার যোগ্য হয়, অর্থাৎ অসীমে মিশে যায়, তখন ভগবানের স্বতঃপ্রকাশ জ্যোতিঃ দেখা যায়।

নামে রুচি

কৃ।—নামে যে রুচি আসে না। যা ক'রে যাচ্ছি, যেন শুধু বেগার শোধ। নামে রুচি আস্‌বে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নাম কত্তে কত্তেই নামে রুচি আস্‌বে। ইক্ষু চিবুতে চিবুতেই রস পাওয়া যায়। না চিবুলে রস পাওয়া যায় না। জোর ক'রে নামে বস্‌বে। মন বস্‌তে চাচ্ছে না, তবু তাকে ঠেলে-ঠুলে নামের মাঝে ফেলে দিতে হবে। দুনিয়ার যত

বাজে চিন্তা এসে মনের দুয়ারে ঠেলা-ঠেলি আরম্ভ ক'রেছে, তাদের একজনকেও বিন্দুমাত্র অভ্যর্থনা দেবে না, একেবারে উদাসীন হ'য়ে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বে। বাজে চিন্তা, বাজে কর্ত্তব্য যতই তোমাকে ডাক্‌তে থাকুক না কেন, কিছুতেই তুমি তাতে কাণ দেবে না। দিনের পর দিন এইভাবে কাজ কত্তে কত্তে নামের আসল রসটার সন্ধান যেদিন পাবে, সেদিন আর চেষ্টা ক'রেও নাম ত্যাগ করা সম্ভব হবে না।

কৃ।—কিন্তু নামে বসলেই মন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হোক্, কিন্তু অধ্যবসায় ছাড়া হবে না। বসুন্ধরাকে বীরেরাই ভোগ করে, কাপুরুষেরা নয়। বিজেতারাই রাজসিংহাসনে উপবেশন করে, পর-পদানত বিজিতেরা নয়। নামের রস পেতে হ'লে নাম-সাধনে দৃঢ় অধ্যবসায় প্রয়োগ করা চাই। একদিনে না হয়, নাই বা হ'ল। একশ' দিনেও ত' হবে।

সৎ-সঙ্গ

কৃ।—ধৈর্য্য যে থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এই জন্যে সৎসঙ্গ দরকার। যাঁরা দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধ'রে সাধন ক'রে নামে রুচি, জীবে দয়া, ভগবানে ভক্তি আর চিত্তশুদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের সংসর্গের এক বিশেষ শক্তিই এই যে, ধৈর্য্যহীন ধৈর্য্যাবলম্বন করে, অধ্যবসায়-বিমুখ অধ্যবসায় পরায়ণ হয়।

সদ্-গ্রন্থ

কৃ।—সৎসঙ্গ যখন দুর্ল্লভ হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তখন সদ্গ্রন্থকে সৎসঙ্গ ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে। সদ্গ্রন্থের নাম ক'রে বাজারে আবার এমন গ্রন্থ অনেক আছে, যাতে সংশয়-সন্দেহ বাড়ে। লোক-খ্যাতি সে সব গ্রন্থের যতই হোক্, তুমি সেগুলিকে সদ্গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত ব'লে মনে ক'রো না।

সদ্গ্রন্থের দুর্লভতার কারণ

কৃ।—এরূপ সদ্গ্রন্থ বড় দুর্ল্লভ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার মানে এই যে, যাঁদের হাতে মা সরস্বতী লেখনী তুলে ধরেছেন, তাঁদের সবাই সৎ জীবন-যাপন-কারী নন। তবু খুঁজ্‌লে সাধনে উৎসাহ-বর্দ্ধক, দ্বিধা-কুণ্ঠা-নাশক, সংশয়হারক সদ্গ্রন্থের একেবারে অভাব কখনই হবে না।

উলঙ্গ হইয়া সাধন করার প্রকৃত অর্থ

অতঃপর অপর একটী যুবক উলঙ্গ হইয়া সাধন করার বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উলঙ্গ হইয়া সাধন কর্‌বার রীতি অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু উলঙ্গ হওয়ার প্রকৃত মর্ম্ম কাপড়-চোপড় খুলে বসা নয়। মনের গায়ে যত সংস্কারের প্রলেপ লেগে আছে, মনকে বেষ্টন ক'রে

যত লালসা ও বাসনার বসন জড়ান রয়েছে, সেইগুলিকে বর্জ্জন করা, সেইগুলি থেকে মনকে প্রত্যাহারের বলে টেনে এনে একক ও নিঃসঙ্গ করাই হ'ল উলঙ্গ-সাধনের মর্ম্মকথা। সাধন কত্তে হ'লে মনকে একেবারে সর্ব্বসংস্কারবিহীন কত্তে হবে, এই হ'ল আসল কথা। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বকে অনেক সাধক এমন স্থূলভাবে গ্রহণ করেছেন যে, মনকে পাপ-লালসা-মুক্ত করার বদলে দেহটাকেই বস্ত্র কৌপীন-হীন করেছেন মাত্র।

উলঙ্গ-সাধনার কুফল

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—এর কুফলও ফলেছে যথেষ্ট। যেখানে সাধন করার ফলে মন ইন্দ্রিয়বিষয়ের উর্দ্ধে চ'লে যাবে, সেখানে ইচ্ছা ক'রে উলঙ্গ হওয়ার ফলে মনটা দেহের নিম্নকেন্দ্রগুলিকে আশ্রয় ক'রে যত কুৎসিত কল্পনারই সঙ্গ করেছে। নিজ সাধারণ অভ্যাসমত বস্ত্রকৌপীন প'রে সাধনে বসলে যেখানে ধ্যান জম্‌ত চমৎকার, সেখানে উলঙ্গ হ'য়ে বস্‌তে যাবার দরুণ আগেই মনের ভিতরে জেগে উঠেছে দুনিয়ার যত ভোগ-গন্ধি সংস্কারগুলি। তখন তুমি কি তাদের সঙ্গে লড়াই-ই দেবে, না সাধন কর্ব্বে?

ব্রহ্মচর্য্য ও উলঙ্গ-সাধনা

প্রশ্ন-কর্ত্তা বলিলেন,—বহু মহাত্মা আছেন, যাঁরা উলঙ্গ থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এর মানে এই যে, বহু মহাত্মারই সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মভাব জন্মেছে, অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়েছে, তাই তাঁদের পক্ষে কাপড়-পরা আর না-পরা এক কথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে বুঝ্‌তে হবে না যে, এই সমদর্শিত্ব লাভ হ'য়ে গেলে কাপড়-পরা ছেড়ে দিতে হবে। এমন অসংখ্য সাধক আছেন, যাঁরা মনে জ্ঞানে পশুর মত হিংস্র, পশুর মত কামুক রয়ে গেছেন—আবাল্য উলঙ্গ থেকেও। এসব স্থলে উলঙ্গত্ব তাঁদের ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার সহায়ক হয় নি। এমন অসংখ্য সিদ্ধপুরুষ আছেন, যাঁরা সর্ব্বাবস্থায় জিতেন্দ্রিয়, তথাপি উলঙ্গ থাকেন না। এসব স্থলে উলঙ্গ থাকাকে তাঁরা একটা বাহাদুরী ব'লেই বর্জ্জন করেছেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যারা ব্রহ্মচর্য্যের সাধক, তাদের এই বিষয়ে বেশ নিষ্ঠাবান্ হতে হবে। উলঙ্গভাবে অবস্থান করা তাদের পক্ষে কখনো উচিত নয়। উলঙ্গ হ'য়ে শয়ন করাও তাদের পক্ষে যত্নপুর্ব্বক বর্জ্জনীয়। নিজ উলঙ্গমূর্ত্তি তারা কখনো দেখ্‌বে না। আর কারো উলঙ্গমূর্ত্তি তাদের দেখা ত' দূরের কথা, স্মরণ পর্য্যন্ত করবে না। নাম জপ কত্তে চাও, কাপড়-কৌপীন প'রেই কর না।

মুদ্রাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও উর্দ্ধরেতা

অপরাপর কতিপয় বিষয় আলোচিত হইবার পরে ব্রহ্মচর্য্য-সহায়ক মুদ্রাদির কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

নিয়মিতভাবে লঘুমহামুদ্রা, * যোনিমুদ্রা, সঞ্জীবনী মুদ্রা অভ্যাস কত্তে পার্লে ব্রহ্মচর্য্য খুব শীঘ্র লাভ করা যায়। এই মুদ্রাগুলির বিশেষত্ব এই যে, যে শক্তির বলে শুক্রকোষে সঞ্চিত বীর্য্য পুনরায় দেহমধ্যে গৃহীত হয়, সেই শক্তি দিনের পর দিন জাগ্রতে থাকে, বাড়তে থাকে। অণ্ডকোষের স্বভাবই হচ্ছে রক্ত থেকে শুক্রকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া এবং সেই শুক্রকে খরচের জন্য শুক্রকোষে পাঠান। মানসিক সংযমের সাধনের দ্বারা এমন অবস্থা অনায়াসেই সৃষ্টি করা যেতে পারে, যাতে অণ্ডকোষে রক্তপ্রবাহের গতি অত্যধিক না হয় এবং তার ফলে শুক্রকোষে এসে অত্যধিক শুক্র জ'মে না পড়ে। কেননা, শুক্রকোষটা শুক্রে ভরপূর হ'য়ে গেলে আপনি সে উপচে প'ড়ে যাবে, চাই এখন জ্ঞাতসারেই যাক, কি অজ্ঞাতসারে সুপ্তিস্খলনরূপেই যাক্। অণ্ডকোষের ধর্ম্মই হচ্ছে, শুক্রকে অণ্ডকোষ থেকে শুক্রকোষে পাঠান। অণ্ডকোষের যদি কোনো ব্যাধি না থাকে, তা' হ'লে সে সিদ্ধপুরুষের দেহেরও রক্ত থেকে শুক্র পৃথক্ ক'রে শুক্রকোষে পাঠাবেই পাঠাবে। একে নিবারণ কর্ব্বার ক্ষমতা কারো নেই। তবে যাঁরা ঊর্দ্ধরেতা, তাঁরা এমন এক শক্তিকে নিজেদের দেহের ভিতরে জাগ্রত করেন, যার বলে শুক্রকোষে সমাগত শুক্র আসামাত্রই পুনরায় শরীরের মধ্যে পরিগৃহীত হ'তে থাকে এবং এর ফলে বীর্য্যক্ষয় চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

* শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত "সংযম-সাধনা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই যে শক্তি, একে জাগ্রত কত্তে মুদ্রাগুলির অভ্যাস খুবই প্রয়োজনীয়।

ঊর্দ্ধরেতার অপ্রকৃত অর্থ

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুনেছি, ঊর্দ্ধরেতা সাধন কত্তে নাকি স্ত্রীলোক লাগে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওসব শুনেছ ব্যভিচারী ও কদাচারী লোকদের মুখে। ঊর্দ্ধরেতার সকল সাধন তোমার নিজ দেহকে নিয়েই হবে, এর জন্য আর কারো দেহ থেকে কোনো সহায়তা নিতে হয় না। তবে, এক সময়ে গৃহীদের ধর্ম্মজীবনের ভিতরে কুসংস্কার, অজ্ঞতা আর বিপথ-পরিচালিত গুরুবাদ এমন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, যার ফলে নিতান্ত পবিত্র ব্যাপারটাকেও অতি কদর্য্য সব ব্যাপারের দ্বারা কলুষিত করা হয়েছিল।

নাসাগ্র বা ভ্রূমধ্য

অতঃপর শ্রীযুক্ত দ— ও তাঁহার একটী নববিবাহিত বন্ধু (হ—) আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে লইয়া হেদুয়ার পার্কে যাইয়া বসিলেন।

শ্রীযুক্ত দ—বলিলেন,—আমি নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির ক'রে উপাসনা করি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাসাগ্র কোনটা? নাকের ডগা?

দ।—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আরে না তা' নয়। সাধারণ কথায় নাসাগ্র বল্‌তে নাকের ডগায় বুঝায় বটে, কিন্তু যোগীদের ব্যবহার অন্যরূপ। তাঁরা নাসাগ্র বল্‌তে ভ্রূ-মধ্যকে বোঝেন। নাকটা যে surface (সমতল) টার উপরে রয়েছে, সেইটুকুর আকার ত্রিভুজের মত। এই ত্রিভুজের অগ্রই হ'ল নাসাগ্র। তাই যোগীরা নাসাগ্র বল্‌তে ভ্রূ-মধ্য বোঝেন। উপাসনা-কালে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দেবে, নাকের ডগায় দৃষ্টি দিলে কিন্তু বিপদ ঘট্‌তে পারে।

দ।—ভ্রূ-মধ্যে কি ভাবে দৃষ্টি দিব, একবার দেখিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—মনটাকে ভ্রূ-মধ্যে রাখলেই দৃষ্টি আপনা-আপনি ভ্রূ-মধ্যে যায়। এর জন্য জবরদস্তি কত্তে হয় না। জবরদস্তি ক'রে সাধন-ভজন সত্যযুগে চল্‌ত। এখনকার সাধন-ভজন সবই সরল পথে। যেটা সহজে হয়, সেটার জন্য কৃচ্ছ্র-সাধন নিষ্প্রয়োজন। ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি দেবার জন্য চ'খের রগগুলিকে পীড়া দেওয়ার কোনো দরকার নেই, মন ভ্রূ-মধ্যে গেলেই দৃষ্টিও নিজে থেকেই সেখানে যায়।

বিশিষ্টায়াম

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—উপাসনার সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের কোনো নিয়ম পালন কর?

দ।—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উপাসনা-কালে শ্বাস-প্রশ্বাসকে একটু

ধীরগামী কর্ব্বে। * তাই ব'লে আবার খুব ধীরগামী কত্তে হবে না। মনে কর, তোমার এক একটি শ্বাস গ্রহণ কত্তে বা প্রশ্বাস ত্যাগ কত্তে দশ সেকেণ্ড সময় স্বভাবতই লাগে কিন্তু জোর ক'রে ধীরগামী কল্লে তুমি ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ সেকেণ্ডেও একটি শ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ কত্তে পার। এ জায়গায় কি কর্‌বে জানো? দশ সেকেণ্ডের জায়গায় পনের সেকেণ্ড সময় লাগাবে মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হবে, কিন্তু অতি ধীর নয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে জোর-জবরদস্তি খাটাতে গেলে ভীষণ বিপদ হ'তে পারে। সুতরাং সাবধান! আর, দম বন্ধ ক'রে রাখারও কোনো দরকার নেই। শ্বাস টান্‌ছ আর ফেল্‌ছ একটুখানি ধীর, অতি সামান্য ধীর ক'রে নিচ্ছ, এইমাত্র। এটাও এক রকমের প্রাণায়াম। একে বলে বিশিষ্টায়াম।

সস্ত্রীক সাধন

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত হ—কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরে হ—, বিয়ে করার পর জীবনটাকে কিরূপ বোধ কচ্ছিস?

---

* এই উপদেশ ব্যক্তিগত; সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। সুতরাং পুস্তক পড়িয়াই কেহ এই উপদেশানুসারে চলিবার মনস্থ করিবেন না। কারণ এই প্রণালীর শ্বাস-নিয়মন সকলের পক্ষেই উপযোগী হইবে, এমত নহে। ''সংযম সাধনা'' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। এই উপদেশটুকু সর্ব্বসাধারণের পাঠ্যগ্রন্থে প্রকাশের উদ্দেশ্য এই যে, এখানে বিশিষ্টায়ামের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

হ।—আমি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভুলি নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, এই ত' চাই! বিয়ে করার অনেক আগে থেকেই যে সবাইকে সাধন-ভজন কত্তে বলি, তার কারণই এই। তাহ'লে আর বিয়ের পরে পথভ্রান্তি জন্মে না। এখন তোমার স্ত্রীকে তোমার উচ্চ-চিন্তাগুলির অংশী ক'রে নাও। Give her your best thoughts, let her share with you the same high aspirations. (তাঁকে তোমার উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি দাও, তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহের অংশ তাঁকে দাও।) বিয়ের পর যুবক যুবতীরা না কত্তে পারে কি? ইচ্ছা কর্ল্লে তারা স্বর্গের রাজত্ব পেতে পারে, ইচ্ছা কর্ল্লে তারা নরকেও ডুব্‌তে পারে। স্ত্রীকে তুমি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গিনী কর, তাঁকে শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপাসিকা ক'রে তোল।

কলিকাতা

১৩ই ভাদ্র, ১৩৩৪

পরার্থ

অদ্যকার লিখিত একখানা পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পরহিততরে যাঁর প্রাণ,
দিবানিশি আমি তাঁরি গাই গুণ-গান।
পরেরে যে আপনার জানে,
মোর প্রেম অবিরত ছোটে তাঁর পানে।

ব্যথিত যে নেয় বুকে তুলে,
তাঁর তরে যাই আমি ত্রিভুবন ভু'লে।
দেবতার অর্চ্চনার ফুল
ধন্য হয় পড়ি' তাঁর চরণে রাতুল।
হও তুমি এমনি মানব,
প্রাণ দিয়া জীবনের বাড়াও গৌরব।"

গুরুগিরি ও স্বাধীনতা

অদ্য কোনও এক সাধুর শিষ্য আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে তাঁহার গুরুদেবের নিম্নলিখিত মতামত প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা,—সস্ত্রীক সাধন না করিলে কাহারও মুক্তি নাই; যারা অবিবাহিত থাকিয়া সাধন-ভজন করে, চিরকৌমার্য্য বা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহারা ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পায় না, প্রত্যেককেই মাছ-মাংস খাইতে হইবে, যে না খাইবে, তাহার দেহ কখনই ধর্ম্ম-সাধনার, কি কর্ম্ম-সাধনার যোগ্য বল লাভ করিবে না; বৈষ্ণব ধর্ম্মই জগতের চরম ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কোটি জন্মেও কাহারও মুক্তি নাই, কারণ, হিন্দু মরিলে, সে শাক্তই হউক, শৈবই হউক, 'হরিবল' 'হরিবল'ই ব'লে, 'কালী-বল' বা 'দুর্গা বল' বলে না; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বক্তা তাঁহার যাবতীয় বক্তব্য বলিয়া বিদায় হইলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের স্বাধীনতাকে যারা সম্মান করে না, তাদের পায়ে মাথা লুটান বিড়ম্বনা, তা'দিগকে আচার্য্য

ব'লে গ্রহণ করা এক বিষম অশান্তি। মানুষ সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন মানুষ, তারপরে সে গুরুর শিষ্য। তোমার স্বাধীন রুচির সম্মান রেখে যিনি পরমার্থের পথ দেখাতে পার্ব্বেন না, তাঁকে দূর থেকে নমস্কার ক'রেই বিদায় হবে, তাঁর শাসনকে জীবনের উপরে চাপ্‌তে দিও না। সকল রোগীর জন্যই যারা টিঞ্চার আইওডিন্ ব্যবস্থা করে, জেনো, তারা কখনো সুচিকিৎসক নয়। মানুষগুলি বরং বিনা চিকিৎসায় মরুক, তবু হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ সেবন কিছু নয়। চেয়ে দেখ্ দেখি বাবা, ধর্ম্মজগৎটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আর উপদেষ্টারা চাচ্ছে, দুনিয়ার সব লোককে অন্ধ রেখে নিজেদের খেয়ালমত চালিয়ে নিতে। কেউ তার শিষ্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সবাই চাচ্ছে একপাল অন্ধের মোড়লী কত্তে।

স্বাধীনতা

তারপর শ্রীশ্রীবাবামণি একটী কবিতা লিখিয়া সমাগত ভক্তদের উপহার দিলেন।

স্বাধীনতা! উপাস্য আমার
জীবন চরণে তব
দিই উপহার!
ছিঁড়ি মিথ্যা লাজের শৃঙ্খল,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়া পূজি
চরণ-যুগল।

তোমার যে না করে সম্মান,
তাহার অপূর্ব্ব কথা
মানে না পরাণ।
তুমি আজি জাগো গো মরতে,
জ্বাল বহ্নি সকলের
হৃদয় পরতে,
কর সবে উন্মাদের প্রায়,
নিজ হাতে কাটি শির—
দিক্ তব পায়।

কলিকাতা,
২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

চতুষ্পাঠী ও কলেজের শিক্ষা

বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চতুষ্পাঠী ও কলেজের শিক্ষার তুলনা করিলেন। বলিলেন,—চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা নীচের ছাত্রদের পড়ায়। তার ফলে উচ্চশ্রেণীর ছাত্র নিজের শিক্ষাকে পাকা ক'রে নিতে পারেন। বিশেষতঃ পড়াতে গিয়ে তার নিজের ভিতরেই এমন সব নূতন চিন্তা জাগে, যা সে তার অধ্যাপকের কাছে পায় নি। কিন্তু কলেজের ছাত্র প'ড়েই যাচ্ছে, লব্ধ-বিদ্যাকে কোথাও প্রয়োগ করার তার সুযোগ নেই, নিজের শিক্ষার কাঁচাটুকু পাকা ক'রে নেবার সম্ভাবনা নেই, শিক্ষিত বিষয় অপরকে শিখাতে গিয়ে

নূতন ভাবসৃষ্টির অবসর নেই, ফলে বল্‌তে হবে যে, টোলের ছাত্রদের কাছ থেকেই আমরা স্বাধীন চিন্তার প্রত্যাশা কত্তে পারি, কলেজের ছেলেদের নিকট পারি না। কিন্তু কাণ্ডটা ঘট্‌ছে উল্টো। এর কারণ কি বল্‌তে পার? এর কারণ হচ্ছে চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা বর্ত্তমান যুগের জীবন-সংগ্রামের অনেকগুলি দিক্ থেকে নিজেদিগকে দূরে রাখ্‌ছে, আর কলেজী ছাত্রেরা তা' করে না। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা অল্পে সন্তুষ্ট, কলেজী ছাত্রদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অধিক। এই জন্যই স্বাধীন চিন্তার প্রকাশের এ তারতম্য। স্বাধীন দেশে সন্তুষ্টচেতাই হচ্ছেন স্বাধীন চিন্তার জনক, আর পরাধীন দেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট ব্যক্তিই হচ্ছেন স্বাধীন চিন্তার জনক।

প্রচলিত গুরুবাদ

তারপরে গুরুবাদের কথা আসিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—এখন যা গুরুবাদ চল্‌ছে, ওটা ত, একটা জুচ্চুরির দুর্গ। আনুগত্যের নাম ক'রে গুরুরা শিষ্যের চ'খে ঠুলি বেঁধে দিচ্ছেন। কোনো গুরু শিষ্যদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর দাঁড়াতে দিচ্ছেন না, সবাই বলছেন,—"এটা মানো, ওটা মানো, যেহেতু আমি বল্‌ছি।" শিষ্যের নিজের বিচার-বুদ্ধিকে, স্বাধীন অনুধাবনার ক্ষমতাকে কেউ জাগ্রত কচ্ছেন না, সবাই বল্‌ছেন,—"মামেকং শরণং ব্রজ, আমায় পূজা কর, আমার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর।" কারো কারো গুরু-গৌরব একেও অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে, যা ব্যক্তব্য নয়, তাই তাঁরা বল্‌ছেন, যা কর্ত্তব্য নয়, তাই তাঁরা

কচ্ছেন, যা ভাবা উচিত নয়, তাই তাঁরা ভাবছেন, যা ভাবানো উচিত নয়, তাই তাঁরা ভাবাচ্ছেন। বিদেশীর পরাধীনতা যেমন অপ্রার্থনীয়, এই সকল গুরুদেবের অধীনতাও তেমন অপ্রার্থনীয়। বৈদেশিক পরাধীনতা যেমন মনুষ্যত্বের অপচায়ক, এই শ্রেণীর গুরুদেবদের পরাধীনতাও তেমনি মনুষ্যত্বের অপচায়ক।

প্রকৃত গুরু

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বুক ঠুকে বল্‌তে পর্‌বেন,—সত্যের জন্য আমাকে অগ্রাহ্য কর, এমন কি অবাধে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্য্যন্ত কর, কেন না, এ জগতে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, তার তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর সকল কিছুই লঘু, যোগৈশ্বর্য্যও লঘু, ইন্দ্রপদও লঘু, তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রসাদও লঘু। তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বলতে পার্ব্বেন, যদি প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে কিছু পাও, তবেই আমাকে মেন, নইলে ছেঁড়া কাঁথার মত, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের মত আমাকে বর্জ্জন ক'রো। যথার্থ গুরু বল্‌বেন—অনুমানে আমাকে মান্‌তে যেও না, মানতে হয় ত' প্রত্যক্ষ নির্ভর ক'রে মানো। যথার্থ গুরু বল্‌বেন,—আমার কথায়, আমার চিন্তায়, আমার কার্য্যে যদি অসত্য দেখ্‌তে পাও, ওটা আমার একটা লীলা ব'লে মনকে ফাঁকি দিও না, অসত্যের প্রতিবাদ কত্তে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হ'য়ো, মিথ্যাকে অমান্য ক'রো।

জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম

অতঃপর ব্রহ্মচর্য্যের উপচায়ক ব্যায়াম সম্বন্ধে বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয়েরও ব্যায়াম আছে কিন্তু গুহ্যমূলের ব্যায়ামগুলি, যেমন,—মূলবন্ধ মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা, সঞ্জীবনী মুদ্রা,—উৎকৃষ্টরূপে অভ্যস্ত না হওয়ার পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম কত্তে যাওয়া ঠিক্ নয়।

তৎপরে শ্রীশীবাবামণি জননেন্দ্রিয়ের কয়েকটী ব্যায়ামের প্রণালী বলিলেন। (সংযম-সাধনা-দ্রষ্টব্য)।

বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন-মার্গ

এই সময়ে একটী অপরিচিত আগন্তুক আসিয়া সন্নিকটে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,—দেখুন মহাত্মাজী, কেউ কেউ বলেন যে, বৈদিক সন্ধ্যা কর্ল্লেই সব হ'তে পারে, তান্ত্রিকমন্ত্র জপ করার আর প্রয়োজন নেই। একথার সত্যতা কতটা? প্রকৃতই কি তান্ত্রিক-মন্ত্রগুলি নিরর্থক?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ধরুন, আপনি এবং আপনার ভাইরা স্কুলে গিয়েছেন পড়্তে। এই সময়ে আপনার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী থেকে এক ঝুড়ি আম, একথালা সন্দেশ, এক হাঁড়ি রসগোল্লা এল। বাড়ী এসে খাবার চাইতেই মা বল্লেন,—ঐখানে সব রয়েছে, যার যা নেবার, নাও। আপনি শুধু আম খেয়েই পেট ভর্লেন, আর একজন শুধু সন্দেশ দিয়েই কাজ সার্ল। তৃতীয় ভাই শুধু রসগোল্লা দিয়েই ক্ষুধা

মিটাল। আর, চতুর্থ ভাইটী প্রথমে খেলে আম, তারপরে খেলে সন্দেশ, তারপরে পেটের বাকি অংশটুকু ভর্ত্তি ক'রে নিলে রসগোল্লা দিয়ে। বলুন দেখি, সবার ক্ষিধে মিটল না?

আগন্তুক বলিলেন,—কেউ কেউ বলেন,—বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ না কর্লে কারো উদ্ধার নেই। তান্ত্রিক ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এসব ধর্ম্ম অবৈদিক। সুতরাং এসব ধর্ম্মাবলম্বীদের নাকি কখনো উদ্ধার হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জয়পুর-যোধপুর অঞ্চলের লোক তরকারী দিয়ে ভাত খায় না; খেলেও ঘৃত আর চিনি দিয়ে মেখে খায়। আর, গাল দেয় যে, বাঙ্গালীরা এম্নি ভূতো জাত যে, ভাতের সঙ্গে আঠারো তরকারী মেখে ভাতের জাত মেরে দেয়, স্বাদ নষ্ট ক'রে ফেলে। এসব হ'ল গোঁড়ামি-প্রসূত কথা। একই মকরধ্বজ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন সহপানে সেবন করে। হাসাপাতালের রোগীরা সবাই একই ঔষধ খায় না, রোগ বু'ঝে এক এক জন এক এক ঔষধ খায়। ডাক্তার বাবু দন্তশূলে কোকেন্ লাগিয়ে উপকার পেয়েছিলেন ব'লে যে পেটের রোগী, চ'খের রোগী, কাণের রোগী প্রভৃতি সকলের জন্যই কোকেন্ ব্যবস্থা কর্ব্বেন, এমন ত' হ'তে পারে না।

তুমিই প্রথম সত্য

আগন্তুক বলিলেন,—সকল ধর্ম্মই ডেকে বল্ছে, "আমার মতন আর কেউ নেই, আমিই জগতে একমাত্র সত্য, আর সব

ধর্ম্ম মিথ্যা বা ফাঁকিবাজি।" এ অবস্থায় আমরা কি কর্ব্ব বলুন!

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যেখানে সবাই বল্‌ছে, আমিই সত্য সেখানে সর্ব্বাগ্রে জান্‌বেন, আপনিই সত্য। আপনি আছেন ব'লেই আপনার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম এ সব রয়েছে। আপনি না থাক্‌লে এরা এত ডাকাডাকি কত্ত কাকে? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আপনিই সত্য, আপনার চাইতে বড় সত্য আর কেউ নেই।

কলিকাতা

১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪

হে প্রভো করহ মোরে

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও একটী পল্লীগ্রামে স্থিত একটী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের পাঠ-প্রারম্ভিক উপাসনাকালে সুরসহযোগে আবৃত্তি করিবার জন্য অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নিম্নলিখিত পদ্যটি রচনা করিয়া পাঠাইলেন।

ভৈরবী; ঝাঁপতাল

হে প্রভো করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান।।
দেহে, মনে, প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার।।
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।

নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির।।
অসত্য, অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে।।
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন।।
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতিপদে।।
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর।।
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

মন গড়িবার উপায়

বেলা চারিটার পরে শ্রীশ্রীবাবামণির মৌনভঙ্গ হইলে একটী ভদ্রলোক তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, মন যখন যে কথা বুঝবার জন্য তৈরী হয়, তখন সে সেই কথাটা বোঝে। যে মন যে জাতীয় জিনিষটী গ্রহণ কত্তে অভ্যস্ত, সেই জাতীয় জিনিষ পেলেই সে সহজে হজম কত্তে পারে। চিরকালের মাংসাশী দুধ খেলে হজম করতে পারে না। কেন পারে না? অভ্যাস নেই ব'লে? মনটাকে উচ্চচিন্তায় অভ্যস্ত কর, দেখ্‌বে, যে কথা আজ বুঝতে পাচ্ছ না, কাল তা' পারবে। দেহের চাইতে মনের শক্তি

ও স্বাধীনতা শতগুণ অধিক। যেমন ক'রে মনকে ঘুরাবে, তেমন ক'রেই সে ঘুর্‌তে পার্‌বে। অপরের মন যে কথাকে বুঝতে পেরেছে, মনকে যোগ্যরূপে গ'ড়ে তুল্‌তে পারলে তুমিও তা' বুঝ্‌তে পার্ব্বে।

প্রশ্ন।—কি ক'রে মনকে গড়্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মনকে সঙ্কীর্ণ একটা স্থানে বেঁধে রাখ্‌লে মনের গঠনও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যায়। তখন সে তার অভ্যাস-বিরোধী ভাবকে গ্রহণ কত্তে পারে না। মনটাকে অনন্তের মধ্যে ফেলে দাও, সীমাহীন তত্ত্বে সে বিচরণ করুক,—তখন সে সব ভাব গ্রহণ কত্তে পার্ব্বে।

প্রশ্ন।—অনন্তের মধ্যে কি ক'রে ফেল্‌ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের নামযোগে। ভগবান্ অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রকাশের স্বরূপ। ভগবানের ভিতরে মনকে ফেলে দিলে মন অনন্ত তত্ত্ব সংগ্রহের সামর্থ্য পাবে।

ব্রহ্মচর্য্য কি সম্ভব

অপর একটী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যই কি ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব সম্ভব।

প্রশ্ন।—পুরাণাদিতে ত' দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি শিব পর্য্যন্ত কাম-শরে জর্জ্জরিত হ'য়েছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু শিব পরাভূত হন নি, তিনি মদন-ভস্ম করেছিলেন। মদন-ভস্ম করার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের আছে। শিবের মত কাম-লাঞ্ছন আরো লক্ষ লক্ষ যোগী জন্মেছেন,—যাঁদের কোনো ইতিহাস কেউ লেখে নি।

প্রশ্ন।—শিবের যদি ব্রহ্মচর্য্যই লাভ হয়েছিল, তবে আবার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কার্ত্তিকেয়ের জন্মের পশ্চাতে জগতের কল্যাণ-সঙ্কল্প রয়েছে। আর, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-ব্যাপারে শিবের যা আচরণ, সেটা গৃহী-হিসাবে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী-হিসাবে নয়। কার্ত্তিকেয়ের জন্ম দিয়ে শিব গৃহী হিসাবেই নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'রেছেন। শিব গৃহী-ব্রহ্মচারীর অদর্শ। গৃহী-ব্রহ্মচারীতে আর সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীতে অদর্শ ও আচরণের পার্থক্য আছে। শিব চির-ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী ছিলেন না, তাই কার্ত্তিকেয়ের জন্মদান তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী হয় নাই। কারণ, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে মৈথুন-মাত্রেই নিষিদ্ধ নহে, শুধু কল্যাণ-বুদ্ধি-বর্জ্জিত মৈথুনই নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ শিব আগে করেছেন মদনভস্ম, তারপরে দিয়েছেন সন্তানের জন্ম। এতেই তিনি গৃহীদের নিত্যকালের গুরু হ'য়ে রয়েছেন। মদন-ভস্মের কাহিনী প্রত্যেক গৃহীকে এই আশ্বাসই দিচ্ছে যে রূপৈশ্বর্য্যের খনি পার্ব্বতীকে অঙ্কোপরি রেখেও জিতকাম থাকা যায়, আর সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ ক'রেই তারপরে জগৎকল্যাণকারী বীরবিক্রমকেশরী সন্তানকে জন্মাতে হয়।

প্রশ্ন।—কিন্তু শিবের কামক্রিয়া সম্বন্ধে শিব-ভক্তদের নানা জঘন্য বর্ণনা আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এসব বর্ণনার জঘন্যতার জন্য শিবঠাকুর দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে বর্ণনাকারীর কামাতুর মন। যার মন কামরস উপভোগের জন্য অধীর, সে অপরের কামক্রিয়া বর্ণনেও সুখ পায়। এসব শিব-ভক্তদের তাই হয়েছে।

প্রশ্ন।—পরাশর, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনি-ঋষিরাও ত' কাম-দমন কত্তে পারেন নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উপাখ্যানে "রোমান্স্" জমাবার উপায় হিসাবে পুরাণকারেরা কখনো কখনো এঁদের জীবনের স্খলনগুলির বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এই একটী-আধটী স্খলনই এঁদের জীবনের শেষ কথা নয়। আর, এঁরাই বিধাতার শেষ সৃষ্টি নন। এঁদের চেয়ে শতগুণ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েছেন এবং হবেন। পরাশর আর ভরদ্বাজকে দিয়েই সৃষ্টি-রহস্যের ইতি হ'য়ে যেতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্ন।—এইমাত্র আমি একজন সাধুর কাছ থেকে এলাম। তিনি বলেন, বীর্য্যকে ক্ষয়িত ক'রে তারপরে তা' যৌগিক প্রক্রিয়ার শরীর-মধ্যে টেনে আনবার নাম ব্রহ্মচর্য্য। তিনি আরও বলেন,—শরীরের সারধাতুকে শরীরেই কৌশলক্রমে রক্ষা ক'রে কামক্রিয়ার নাম ব্রহ্মচর্য্য। এসব ব্যাখ্যা কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, কদাচারীর ব্যাখ্যা, ব্যাভিচারী ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা। ধর্ম্মের নাম ক'রে পাপের এতে হচ্ছে প্রশ্রয়। এতে নিরেট মূর্খেরা ভুলতে পারে, কিন্তু এই কদাচার ধর্ম্মেরও পথ নয়, কুশলেরও পথ নয়। এটা জাহান্নমেরই পথ।

বেদ ও শাস্ত্র

অতঃপর বেদ সম্বন্ধে কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেদ কাকে বলে? স্বয়ম্প্রকাশ নিত্যদীপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বেদ। বেদ কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না, তার মানে কি? বেদ তোমার ভিতরেই লুকান আছে। কতগুলি সংস্কৃত, পালি বা আরবী কথাই ধর্ম্মের প্রমাণ নয়, তোমার নিজের ভিতরের সিদ্ধান্তই প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। শাস্ত্রের শ্লোক ত' অনুমানের আশ্রয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রমাণ। অনুমানে আর প্রমাণে তফাৎ আছে। 'অনু' মানে 'কম', 'অনুমান' মানে 'মাপের চাইতে কম।' 'প্র' মানে 'প্রকৃষ্ট', 'প্রমাণ' মানে 'মাপের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সমান'। শাস্ত্র সত্যের অনুমানে সহায়তা করে, প্রত্যক্ষ-দর্শন প্রমাণ করে। এব্রাহিম আধম ব'লে একজন মুসলমান রাজা ছিলেন, তিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে ফকিরী নিলেন এবং দিবারাত্রি ধর্ম্মানুষ্ঠান কত্তে লাগ্‌লেন। দীর্ঘকাল সাধন-ভজনের পরে একদিন দেখা গেল, তিনি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একখানা ক'রে পাতা স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস কত্তে লাগ্‌ল,—

'ওকি আধম, কচ্ছ কি?' তিনি বল্‌লেন,—'তত্ত্বজ্ঞান ভিতরে জেগেছে, তাই পুঁথিটাকে নিষ্প্রোয়জন মনে হচ্ছে।' মোট কথা শাস্ত্রের শত লেখার চাইতে মানুষের নিজস্ব অনুভূতির দাম বেশী, একশখানা শাস্ত্র গ্রন্থের চাইতে এক কণা প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধির ওজন বেশী।

প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মানে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কাকে বলে, তাও মনে রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চায় যে সুখ আছে, এ ত জীব-মাত্রেরই ইন্দ্রিয়সুখের আগ্রহ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার যে সুখানুভূতি, তাকে কি প্রত্যক্ষ অনুভূতি বল্‌ব? বেদ, কোরাণ বা বাইবেলের ওজনকেএই শ্রেণীর উপলব্ধির ওজনের চাইতে কম বল্‌ব? না, তা' নিশ্চয়ই বল্‌ব না। কারণ, সুখমোহের যে দাস,কামার্ত্ততায় যে অন্ধ, তার অনুভূতির আবার প্রত্যক্ষই বা কি, পরোক্ষই বা কি? তার অনুভূতিগুলি যে অসম্পূর্ণ অনুভূতি, অস্পষ্ট অনুভূতি, তার দর্শন যে ছায়া-দর্শন, অদূরদর্শন, সত্য যে তার কাছে ধরা পড়ে না, তার জড়-বুদ্ধির মুঠোর ভিতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে সত্য সূক্ষ্মগতিতে পালিয়ে যায়। এই শ্রেণীর লোকের অনুভূতি যদি বেদ, কোরাণ, বাইবেলের তত্ত্বের বিরোধী হয়, তা'হলেও শাস্ত্রের ওজন কম ব'লে মনে করা চল্‌বে না। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা ব'লে ভাবা চল্‌বে না, শাস্ত্রানুশাসন অমান্য কর্‌লে চল্‌বে না। কিন্তু জিতেন্দ্রিয়ত্বের মধ্য দিয়ে যাঁর দিব্যচক্ষু খুলেছে,

অনন্তদূরবর্ত্তী স্পষ্ট দেখ্‌বার যাঁর সামর্থ্য জেগেছে, চক্ষু যাঁর রূপের ধাঁধায় অন্ধ নয়, মন যাঁর কামনার শৃঙ্খলে বদ্ধ নয়, পায়ে যাঁর বেড়ি পড়ে নি, হাতে যাঁর হাতকড়ি নেই, চিত্ত যাঁর নিজের অধীন, হৃদয়াবেগ যাঁর আত্মবশ, বিচার-বুদ্ধি যাঁর স্বার্থানুগত নয়, পরন্তু সত্যানুগত, সাহস যাঁর বাহাদুরীর প্রলোভন নয়, পরন্তু আত্মপ্রত্যয়েরই মাত্র আভা, তাঁর যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সেই উপলব্ধির বিরুদ্ধে যদি সপ্তর্ষি-মণ্ডলও তাঁদের ব্রহ্মবিজ্ঞান নিয়ে দাঁড়ান, তবু জান্‌বে এই উপলব্ধিই সত্য, অপর সব তাঁর পক্ষে মিথ্যা।

গুরু ও ভগবান

প্রশ্ন।—ভগবান্‌কে কি প্রত্যক্ষ করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়ই যায়।

প্রশ্ন।—কে দেখিয়ে দেবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যিনি দেখ্‌বেন, তিনিই দেখিয়ে দেবেন এবং যাঁকে দেখ্‌বেন, তিনিও দেখিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন।—মধ্যপথে একজন পথ-প্রদর্শকের দরকার নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানকে চাও কি? তবে শুধু ভগবানের কথাই ভাবো। পথ-প্রদর্শকের কথা ভেবে ভগবানকে ভোল কেন? ভগবানেরই জন্য পাগল হও, তোমার আর ভগবানের মধ্যে আবার আর একজনকে এনে ব্যবধান জুটাও কেন? ভগবানের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ যোগ হোক্। ভগবানের কথা

ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন তুমি আকুল অধীর হবে, তখন যদি মধ্যপথে সহায়ক কেউ জোটেন, জুটুন। না জুটলেই বা বৃথা চিন্তা কেন?

প্রশ্ন।—ধ্রুবের ত' গুরুর দরকার হয়েছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু ধ্রুব 'গুরু' 'গুরু' ব'লে কাঁদেন নি, 'হরি' 'হরি' ব'লেই কেঁদেছিলেন। 'হরি' নামে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই তাঁর গুরুলাভ হ'ল। দীক্ষা লাভের পরেও ধ্রুব 'গুরু' 'গুরু' ক'রে জীবন কাটান নি, গুরুকেও ভুলে গিয়ে গুরুদত্ত নাম নিয়ে শ্রীহরিকেই ডেকেছিলেন। হরিই ছিলেন ধ্রুবের লক্ষ্য, নানা উপলক্ষ্যের মধ্যে গুরু ছিলেন একজন। লক্ষ্যের জন্য উপলক্ষ্যকে ত্যাগ করা যায়, বিস্মৃত হওয়া যায়।

প্রশ্ন।—গুরুকেই যদি ভগবান্ ব'লে ধ্যান করা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সৃষ্টি আর স্রষ্টায় তফাৎ নেই। ভগবানই পিতা হ'য়ে, মাতা হ'য়ে, পুত্র হ'য়ে, গুরু হ'য়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যে-কাউকে ভগবান্ ব'লে ভাবা, ধ্যান করা কেন চল্‌বে না। গুরুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম এসে যায় ব'লে তাঁতেই ভগবদ্‌ভাব আসে গভীরতর হ'য়ে এবং অতি সহজে,—ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-সাধনার জগতে এটা একটা চিরন্তন মনস্তত্ত্ব। কেউ যদি এই মনস্তত্ত্বের অনুগত হ'য়ে গুরুতেই ভগবদ্ভাব অর্পণ ক'রে সাধন ক'রে যায়, তাহ'লে তার দিক্ দিয়ে ভুল কিছুই হবে না, কিন্তু গুরুদেবেরা যদি শিষ্যদের ডেকে কেবলই বলতে থাকেন,—"জানিস্? আমিই ভগবান্।

আমাকে পূজা করাই ভগবান্‌কে পূজা করা। আমাকে পূজা করার জন্য তুই ভগবান্‌কে পার্‌লে ভুলে যা",—তবে তা' হবে এক মহাবিপত্তির কথা।

গুরুগিরি ও বুজরুগী

প্রশ্ন।—আমাদের সেই সাধুজী গুরু সম্বন্ধে এরকম বলেন না। শ্রীশ্রীবাবামণি—যিনি যেমন অধিকারী, তিনি তেমনই বল্‌বেন। এতে আর বাধা কে দেবে বাবা? আর, যিনি যেমন অধিকারী, তিনি তেমনই বুঝ্‌বেন। এরই বা বিপর্য্যয় ঘটাতে কে পার্ব্বে? কাণে একটা মন্ত্র দিলেই গুরু হওয়া যায় না, গুরু হওয়া বড় শক্ত কথা। আজকাল এই যে অত সহজে একজন আর একজনের গুরু হচ্ছে, তার ফল কি জানো? যত্ন ক'রে কষ্ট ক'রে গুরুপদবী লাভ কত্তে হ'ল না ব'লে গুরু তাঁর মনুষ্যত্বে খাটো হন। আর মানুষ্যত্বে খাটো হন ব'লেই বিদ্রোহী শিষ্যকে ক্ষমা কত্তে পারেন না, আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌তে পারেন না,—"সত্যের জন্য আমাকে বর্জ্জন কর, আমার প্রতি মোহাকৃষ্ট হ'য়ে সত্যকে অবমাননা ক'রো না।" বর্ত্তমানের প্রচলিত এই গুরুবাদরূপ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র বিদ্রোহ দেখেও কি বুঝতে পাচ্ছ না যে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম exploitation (পরের মাথায় হাত বুলান) সহ্য কর্ব্বে না? যুগধর্ম্ম চায় না, দুটো সংস্কৃত-শ্লোক আউড়েই কেউ গুরু হ'য়ে যাক্, হঠযোগের দুটো প্রক্রিয়া দেখিয়েই কেউ তোমার জীবন-তরণীর কর্ণধার হোক্।

পরন্তু, নিজের জীবনের জ্বলন্ত মনুষ্যত্ব দেখিয়েই বর্ত্তমানের গুরুকে শিষ্যের মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী চিত্তকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। তাতে গুরুরও লাভ, শিষ্যেরও লাভ।

পতিসেবা ও মনুষ্যত্ব

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি হেদুয়ার পার্কে ভ্রমণ করিতে গেলেন। একজন ভক্তের সহিত নিম্নলিখিত আলোচনা হইল।

প্রশ্ন।—পতিসেবাই নারীজাতির একমাত্র কর্ত্তব্য কিনা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্ত্রীভাবে পতিসেবা, বধূভাবে শ্বশ্রূসেবা, গৃহিণী-ভাবে সংসারের সেবা, কন্যাভাবে পিতৃমাতৃসেবা, শিষ্যাভাবে গুরুসেবা, মাতৃভাবে সন্তানসন্ততির সেবা, ভগিনীভাবে সহোদর-সহোদরাদের সেবা এবং মানুষভাবে মনুষ্যত্বের সেবাই নারীর কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন।—মনুষ্যত্বের সেবার সহিত যদি পতিসেবার বিরোধ হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই হবে শ্রেয়ঃ পন্থা। যেখানে তা' সম্ভব হবে না, সেখানে মনুষ্যত্বের দাবীই সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়।

পতি পরম দেবতা

প্রশ্ন।—পতি কি সতীর দেবতা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নিশ্চয়! তবে, সতীও পতির দেবতা।

নারীদের স্বৈরিণী হবার পথ রুদ্ধ করার জন্যই চিরুণীতে "পতি পরম দেবতা" কথাটা খোদাই করার ব্যবস্থা হয় নি। পত্নীর মনুষ্যত্বকে স্বীকার ক'রে পতিকে সত্য সত্য দেবতা থাক্‌বার চেষ্টাও কত্তে হবে। পতি সতীর দেবতা, সতী পতির দেবতা, এক দেবতা অপর দেবতার মনুষ্যত্বকে সম্মান ক'রে, সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা ক'রে, পোষণ ক'রে ক্রমবিবর্দ্ধী হবার সুযোগ ক'রে দেবেন। এজন্যই একে অপরের দেবতা। মনুষ্যত্ব এক পরম সম্পদ। দেবতারাও মনুষ্যত্বকে লোভনীয় জ্ঞান করেন।

মনুষ্যত্বের মানে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাবা, মনুষ্যত্ব কথাটার মানে নিয়ে গোলমাল আছে। একদল ভোগবাদী লম্পট মনুষ্যত্বের এক নূতন Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) প্রচার কচ্ছেন, তাঁদের মত পরপুরুষের রূপাকৃষ্ট হ'য়ে নিজ স্বামীকে বর্জ্জন না কর্লে নারীর নারীত্বের মর্য্যাদা থাকে না, ভোগের আগুনে নিজ সতীত্ব, নিজ পবিত্রতা সমর্পণ না কর্লে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্ব প্রকৃত সম্মান পায় না। তাঁরা বলেন,—কাম একটা নৈসর্গিক প্রকৃতি, এ প্রকৃতির মান রাখাই হ'ল মনুষ্যত্বের প্রমাণ। এই পূতিগন্ধময় পশুসুলভ মনুষ্যত্বের দাবীর কথা কিন্তু আমি বলি নি। যে মনুষ্যত্ব ত্যাগের উপরে, সংযমের উপরে, পরার্থের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, যে মনুষ্যত্ব ত্যাগ-বৈরাগ্যের মধ্যেই নিজের পরিপুষ্টি পায়, সেই মনুষ্যত্বের কথাই বল্‌ছি। পত্নী-

ভাবে স্ত্রী স্বামীর সম্যক্ সেবা কর্ব্বে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিপোষণের দিকে লক্ষ্য রেখে, দৃষ্টি রেখে, খেয়াল রেখে।

স্ত্রী-জাতির চিরকৌমার্য্য

প্রশ্ন।—স্ত্রী-জাতির চিরকৌমার্য্য সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অপরের প্ররোচনা ব্যতীত নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় যদি কোনও স্ত্রীলোক চিরকুমারী থাক্‌তে চান, তবে আমি তাঁর সঙ্কল্পের সমর্থন করি। কিন্তু কুমারী থাক্‌ব বল্‌লেই সব হ'য়ে গেল না। চিরকৌমার্য্যকে রক্ষা করার জন্য যতখানি আয়োজন আবশ্যক, সবটুকু কত্তে হবে। মন কখনো ভোগলিপ্সু হ'য়ে জীবনটাকে গুপ্ত ব্যভিচারের পথে চালিয়ে নিতে না পারে, এমন সাধন-শক্তি সঞ্চয় কত্তে হবে। প্রণয়ার্থী কৌশলী পুরুষ তাঁর প্রচ্ছন্ন আসক্তির জাল বিস্তার ক'রে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্পকে নষ্ট ক'রে না দিতে পারে, এমন সদসদ্-বিবেক-বল লাভ কত্তে হবে। লম্পট পশু কখনও বাহুবলে না ব্রহ্মচারিণীর দেহকে জয় কত্তে পারে, এমন অসুরমর্দ্দিনী শক্তি তাকে লাভ কত্তে হবে, প্রয়োজনমত তাঁকে মানুষের বুকে ছোরা বসাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। জানবে, তবে তার চিরকৌমার্য্য-ব্রত অটুট থাক্‌বে।

চিরকুমারীর বিপদ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—চিরকুমারীর

বিপদ পদে পদে। অনেক লম্পট সধবা দেখ্‌লে সেই স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় না, কারণ, সধবা নারীকে দেখ্‌লে কারো কারো নিজ মাতৃমুখ মনে পড়ে, অনেকের বা অপরের উপভুক্তা জেনে ঘৃণা ও অরুচি হয়। বিধবার দিকে দৃষ্টি পড়্‌লে, অনেক লোকই বিধবা-জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের চির-পোষিত পবিত্রতার সংস্কারটায় অভিভূত হ'য়ে যায়, মনের পাপবুদ্ধি অনেক সময় মনেই বিলয় পায়। যে সব বিধবা নিজেদের জীবনের মধ্যে সৎস্বভাব ও সাধন-ভজনকে খুব সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন, তাঁদের পানে লম্পটের চোখ পাতাটী খুল্‌তে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু কুমারীর সম্পর্কে অবস্থা তা' নয়। সাধু অসাধু সবাই জানে, কুমারী কারো স্ত্রী নয়, কারো বিধবা নয়, কুমারীর পক্ষে দাম্পত্য-জীবন গ্রহণে বাধা নেই এবং কুমারীকে স্ত্রীরূপে প্রার্থনায় কোন দোষ নেই। ফলে সহস্র কামুকের কাম ঐ একটী কুমারীকে কেন্দ্র ক'রে বাড়্‌তে থাকে। যে ব্যক্তি সধবার প্রতি কামুক হ'তে পাত্ত না, বিধবার সম্বন্ধে কুভাব পোষণ কত্তে পাত্ত না, সেও কুমারীকে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা কত্তে আরম্ভ করে। এই জন্যেই সামান্য নারীর পক্ষে চিরককৌমার্য্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু "যতদিন পর্য্যন্ত ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, পরার্থপর ভগবৎ-পরায়ণ, সাধনসম্পন্ন ও উন্নতচেতা পুরুষকে স্বামী রূপে না পাব, ততদিন কৌমার্য্য রক্ষা ক'রে পবিত্রভাবে জীবন-যাপন কর্ব্ব",—এরূপ সঙ্কল্প প্রত্যেক বালিকার ভিতরেই থাকা উচিত। তার ফল ভাবী সধবার পক্ষেও শুভময়।

স্ত্রীপুরুষের কামভাব বর্জ্জনের উপায়

অপর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—দুইটি লোকের ভিতরে তারা স্ত্রীই হোক্, কি পুরুষই হোক্, পরস্পরের কামভাব জন্মালে আত্মরক্ষার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম উপায় বর্জ্জন। কারো প্রতি কুভাব এলে, দেহে ও মনে তার সঙ্গ বর্জ্জন করবে।

প্রশ্ন।—কিন্তু বর্জ্জনের চেষ্টাতেও যদি কাম না যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' হ'লে অবশিষ্ট উপায়—গ্রহণ। কিন্তু এই গ্রহণ দৈহিকভাবে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবে। উভয়ে উভয়কে স্পর্শমাত্র না ক'রে যদি গভীর অধ্যবসায়-সহকারে এক সঙ্গে একই প্রণালীতে সাধন-ভজন কত্তে থাক, তাহ'লে পরস্পরের আধ্যাত্মিক একত্ব এমন ভাবে অজ্ঞাতসারেই স্থাপিত হ'য়ে যাবে যে, কাম আর থাক্‌বে না। কাম ত' একটা আকর্ষণ। উভয়ের মধ্যে উভয়কে আকর্ষণ করার যে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে, একত্র সাধনের ফলে তা' দূরীভূত হবে অর্থাৎ সাধনেরই বলে পরস্পরের আধ্যাত্মিক অসাম্য সাম্য লাভ করবে। বেশী জল ও অল্প জলে পূর্ণ দুটী বাল্‌তির তলদেশে যদি একটা নল সংযুক্ত ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লে যতক্ষণ দুটোর জলই সমান না হয়, ততক্ষণই নলের মধ্যে জলের স্রোত থাকে, একটা বাল্‌তির জলের প্রতি অপর বাল্‌তির জলের তীব্র আকর্ষণ থাকে। কিন্তু দুটো যখন জল সমান হয়, তখন আর আকর্ষণও থাকে না স্রোতও থাকে না। একত্র-সাধনের ফলে দুটী বিভিন্ন-শক্তি সম্পন্ন লোকের শক্তির সাম্য হয়, তাই কামদমন হয়।

প্রশ্ন।—যখন একত্র সাধনের সুযোগ না হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তখন ভগবানের নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের মূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্বে।

প্রশ্ন।—নাম জপ কর্ব্ব ভগবানের, আর মূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্ব কাম-সম্পর্কিত ব্যক্তির, এতে ভগবানের নামের অমর্য্যাদা হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিন্দুমাত্রও না, বরঞ্চ তাঁর নামের অত্যদ্ভুত মহিমা প্রমাণিত হবে। নামটী যে ভগবানেরই নাম, এই কথাটী দিবারাত্র স্মরণে রাখ্‌বে। নামটীর সঙ্গে যে ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ, এই কথা দৃঢ়ভাবে স্মৃতিতে রেখে সেই নাম ধ'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তেই একে অন্যের মূর্ত্তি ধ্যান কর্ব্বে। এতে ক্রমেই দেখ্‌তে পাবে যে কামের উপরে নামের জয় কেমন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নামের বলে তোমার কদর্য্য লালসার পাত্রটীই তোমার কাছে ক্রমশঃ অপাপ-বিদ্ধ ভগবানরূপে স্ফুট হ'তে থাক্‌বে। ধীরে ধীরে দেখ্‌তে পাবে, যাকে দেখ্‌লে আগে কামের উদ্রেক হ'ত, এখন দেখ্‌লে ভক্তি হয়, নিষ্কাম প্রেম জন্মে ;—আগে তার প্রতি আকর্ষণ ছিল দেহের, এখন তার প্রতি প্রীতি হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মানুভূতির ফলে। নামের বলে এ রকম অসম্ভব কাণ্ড হয়। অবিশ্বাসী লোকে নামকে আদর করে না, তাই, দুঃখকষ্টে জ্বলে-পুড়ে মরে। বিশ্বাসী মানব-নামের বলে অবহেলে পূর্ণশান্তিকে লাভ করে।

এই সময়ে আটটা বাজিল। শ্রীশ্রীবাবামণি পুণরায় মৌনী হইলেন।

কলিকাতা
১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৪

সাধন-সঙ্কেত

অদ্য একটী যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পাদবন্দনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে মন্ত্র দিবার পরে আর কোনও উপদেশ করেন নাই; এক্ষণে তাঁহার কি কর্ত্তব্যে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরুদেবের কাছে গিয়ে নিবেদন কর যে, শুধু মন্ত্র পেয়ে তুমি তৃপ্ত হচ্ছ না, মন্ত্রের সাধন সম্বন্ধেও বিস্তারিত উপদেশ চাই।

যুবক।—গুরুদেব জীবিত নেই। তাতেই আমার এ বিষম দুর্গতি ভোগ কত্তে হচ্ছে। যেখানেই আমি এই বিষয়ের মীমাংসার জন্যে যাচ্ছি, সেখানেই প্রায় সকল সাধুই আমাকে বল্‌ছেন, নূতন ক'রে দীক্ষা নিতে। আমি কিন্তু কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, নূতন ক'রে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই। সকল নামই ভগবানের, সুতরাং সকল নামের সাধনের মধ্য দিয়েই ভগবানের কৃপালাভ হয়। নাম পাল্‌টাবার কোনো প্রয়োজন হবে না, নিষ্ঠাপূর্ব্বক নাম জপ ক'রে যাও।

যুবক।—মন স্থির করব কোন্‌খানে?

শ্রীশ্রীবাবামণি,—কোন্‌স্থানে মন স্থির কত্তে তোমার সহজ বোধ হয়?

যুবক।—তাও আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারি না। এক এক

সময়ে এক সাধুর উপদেশ শুনে এক এক জায়গায় মন স্থির করার চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। সব জায়গায়ই সমান কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নানামুনির মতে চল্‌তে গেলেই এরূপ হয়। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌তে পার্ব্বে?

যুবক।—অনুমতি করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তুমি সকল মুনির কথায় উদাসীন থেকে একটী মুনির কথানুসারে চল্‌তে পারবে?

যুবক।—কার কথা শুনতে হবে বলুন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যত সাধু-মহাত্মার কাছে গিয়েছ, তাঁদের মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ব'লে কার উপদেশ তোমার মনে লেগেছে?

যুবক।—কে শ্রেষ্ঠ উপদেশ দিয়েছেন, কে নিকৃষ্ট উপদেশ দিয়েছেন, তা' আমি কি ক'রে বিচার কর্ব্ব বলুন? তবে একজন উদাসী সাধু আমাকে যা' যা' বলেছিলেন, তাতে আমার মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তিনি কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

যুবক।— তিনি বলেছিলেন, ভ্রূমধ্যে মন স্থির কত্তে। সবাই আমাকে নূতন ক'রে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন, কিন্তু ইনি আমাকে মন্ত্র পালটাতে নিষেধ কর্ল্লেন। ইনি বলেছিলেন, প্রথম কিছুদিন মালাজপ ক'রে পরে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের অভ্যাস কত্তে। আমি বল্লাম, মন্ত্রটী অত্যন্ত দীর্ঘ।

তাতে তিনি বল্লেন,—সম্পূর্ণ মন্ত্রটী জপ করার সময়ে মালা দিয়ে সংখ্যা রেখো, আর শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করার সময়ে শুধু বীজ-অংশটুকু পৃথক্ ক'রে নিও।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ইনিই যথার্থ কথা বলেছেন। এর চাইতে উৎকৃষ্ট উপদেশ আর কিছু হ'তে পাত্ত না। এই উপদেশানুসারেই তুমি একমনে একপ্রাণে চল্‌তে থাক। ভিন্ন গুরুর শিষ্যকে নিজ শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করার জন্য অনেক ব্যাধ জাল পেতে ব'সে আছে, তুমি তাদের কোনো কথাতেই মুগ্ধ হ'য়ো না।

কলিকাতা
১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৪

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিবিধ সাধন

হেদুয়ার পার্কে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের সাধন দুই দিক্ দিয়ে কত্তে হয়। আয়বর্দ্ধনও কত্তে হয়, ব্যয়সঙ্কোচও কত্তে হয়। ব্যায়ামের দ্বারা আয় বাড়ে, জপ-ধ্যানের দ্বারা ব্যয় কমে। যাঁরা শুধু আয় বাড়াবার দিকে দৃষ্টি দেন, তাঁরা সূক্ষ্মবুদ্ধি কিন্তু যাঁরা আয়ও বাড়ান, ব্যয়ও কমান, তারা হ'লেন স্থিরবুদ্ধি। ব্রহ্মচর্য্যের সাধককে স্থিরবুদ্ধি হ'তে হবে, তবেই পূর্ণ সাফল্য।

গুরু-দক্ষিণা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত শ—ও শ্রীযুক্ত ব—প্রভৃতি

সমভিব্যাহারে গড়ের মাঠে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— এক গুরু তাঁর শিষ্যদের ডেকে এনে বল্লেন,— "গুরু-দক্ষিণা দাও।" সব শিষ্য নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল, শুধু দুইজন শিষ্য গুরুর অভিমুখী হ'লেন। প্রথম শিষ্য বল্লেন,— "এই নিন্ গুরুদেব, আমি আমার সকল ধন-সম্পদ আপনার পায়ে সঁপে দিচ্ছি।" দ্বিতীয় শিষ্য বল্লেন,—"ধন-সম্পদ দিয়ে আর কি হবে গুরুদেব, আপনি চাচ্ছেন আমার জীবনের উন্নতি, আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা কর্ল্লাম যে, আত্মগঠন কর্ব্ব, মনুষ্যত্ব লাভ কর্ব্ব, গুরুর মান রাখ্‌ব; যে মহান্ আদর্শের প্রচারের জন্য আপনি এত যত্ন পাচ্ছেন, সেই আদর্শের পায়ে আমি আমার জীবন উৎসর্গ কর্ব্ব, জন্মে জন্মে আমি ঐ একই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ কর্ব্ব।"

শ্রীযুক্ত—শ বলিলেন,—দ্বিতীয় শিষ্যই শ্রেষ্ঠ, প্রথম শিষ্য মধ্যম কিন্তু অপরাপর শিষ্যেরা অধম। কেননা, গুরু-দক্ষিণা দেবার ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত এদের নেই, দেবার চেষ্টা ত' দূরেরই কথা।

শ্রীযুক্ত ব—জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরু-দক্ষিণা কি কখনো দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুদক্ষিণা প্রকৃতই অদেয়। অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দিয়েও যোগ্য ভাবে দেওয়া হ'য়ে ওঠে না। এই জন্য গুরুকে না দিতে পার্ল্লে দিতে হয় জগৎকে। জগৎ-সেবাই গুরুসেবা। এই কথাটা মনে রেখে অনিচ্ছাকে ঢেকে রাখবারও একটা ছোঁয়াচে রোগ আছে। সেই রোগ সম্পর্কে সাবধান।

মনঃস্থৈর্য্যের কথা

তৎপরে সাধন সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরে মন স্থির করার চাইতে দেহমধ্যে মন স্থির করাই শ্রেষ্ঠ। দেহের মধ্যে আবার ভ্রূমধ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। দেহমধ্যে মন স্থির করার কারণ বোঝ? এক কণা electron (বিদ্যুদণু) এর মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিরাজমান। একটী মাত্র শব্দের মধ্যে সমগ্র বেদ বিদ্যমান। একটী মাত্র শ্বাস ও প্রশ্বাসের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বর্ত্তমান। দেহটার মধ্যে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বাস কচ্ছে। সাধন কর, বুঝতে পাবে।

কলিকাতা

১৮ইই ভাদ্র, ১৩৩৪

বিভূতি দর্শন

অদ্য একজন সাধক শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—নাম-জপের সময়ে আমার নানারকম দর্শন হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এসব কথা কাউকে বলতে নেই। সাধন কর আর লোকের সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনে নানাভাবে সহায়তা কর। কি দেখ্‌ছ, বা কি শুন্‌ছ, ওসব কথা সযত্নে গোপন ক'রে রাখ্‌তে হয়।

কীর্ত্তনে বা সাধনে তামসিক সঙ্গ

কীর্ত্তন সম্বন্ধ আলোচনা উঠিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

নিজের অনুরূপ সুশিক্ষিত ও পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি লোকের সঙ্গে ব্যতীত কীর্ত্তনে গভীর আনন্দ হয় না। তামসিক লোকের সঙ্গে ব'সে জপ-তপ করাও উচিত নয়। আক্ষরিক শিক্ষা কারো কম থাকে, কারো বেশী থাকে, তাতে যায় আসে না। সাত্ত্বিক রুচি ও শুদ্ধবুদ্ধির লোকের সঙ্গ নেবে।

নামজপ ও অভিক্ষা

দৈব সম্বন্ধে কথা উঠিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেদের পুরুষকারে বিশ্বাস কর্‌। ভিক্ষা ভগবানের কাছেও চাইবি না।

প্রশ্ন।—তবে আবার তাঁর নামজপ কত্তে বলেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—নামজপ করা আর প্রার্থনা করা এক কথা নয়। যে যাঁকে ভাবে, সে তাঁর স্বরূপ পায়। ভগবানের নামের সাধন তোদের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, তোরা ভগবান্‌ হবি। তখন তোদের আত্মশক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সকল অসম্ভবকে সুসম্ভবে পরিণত কর্ব্বে। ভগবান্‌ হবি ব'লেই তোরা ভগবানের নাম কচ্চিস্‌,—ভাগবানের দানের ভাণ্ডার থেকে দুমুঠো ভিক্ষা পাবার জন্যে নয়।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অধিকার

গায়ত্রী সম্বন্ধে কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গায়ত্রী-মন্ত্র ত' জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যান। এ মন্ত্রে কোনো

সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নেই। ব্রহ্মগায়ত্রীতে প্রত্যেক সাধনেচ্ছু নরনারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

প্রশ্ন।—তবে এতকাল গায়ত্রী স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হ'য়ে এসেছে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ওটা আমাদের ভুল হ'য়ে এসেছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাতে সবারই সমান অধিকার। গায়ত্রী কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া উত্তরাধিকারের বস্তু নয়, যে কেউ সাধন কর্ব্বে গায়ত্রীতে তারই অধিকার। সাধন কর্ব্বে না, অথচ গায়ত্রীতে অধিকারের দর্প ক'রে বেড়াবে, এই অবাঞ্ছিত অবস্থাটী যাতে না আসে, তারও জন্য অতীতের অনেক আচার্য্য যাকে তাকে গায়ত্রীমন্ত্র দান করেন নি। সাধ্যমত আশ্রমোচিত ব্রহ্মচর্য্যপালন কর্ব্বে, যথাশক্তি নিজেকে পরহিতার্থে নিয়োজিত কত্তে কখনো কুণ্ঠিত হবে না, এই হবে যার জীবনব্রত, সে যার বংশেই জন্মুক, গায়ত্রী সে পাবে।

অহিন্দুর গায়ত্রী জপ

প্রশ্ন।—অহিন্দুরাও গায়ত্রী জপ কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—শ্রদ্ধা থাক্‌লে পারে বৈ কি? তোমরা হিন্দু হ'য়েও কি যীশুর মূর্ত্তিকে প্রণাম কর না? মুসলমানের মসজেদ, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা, হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধের বিহার, শিখের গুরুদ্বার প্রভৃতি যাই দেখ্‌তে পান না কেন অনেক হিন্দু সমান ভক্তিভরে প্রণাম করেন। এতে কি অপরাধ হয়? একই ভগবানকে

বিভিন্ন মানব-সমাজ বিভিন্নভাবে পূজা কচ্ছেন, নিজ নিজ বুদ্ধির আড়ষ্টতা বা সুতীক্ষ্ণতা দিয়ে নিজ নিজ ভগবানের এক একটা স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ধারণা কচ্ছেন। উপাসনার প্রণালীতে যতই তফাৎ থাকুক, উপাসিত হচ্চেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মই। যার প্রণালীর ভিতর যেটুকু সুন্দর, সেইটুকুই যে কেউ গ্রহণ কত্তে পার। "মুহম্মদর্ রসুলাল্লাহ" (মহম্মদই ভগবানের প্রেরিত পুরুষ) কথাটায় যার আপত্তি আছে, সেও "লাইলাহাইল্লাল্লাহ্" (পরমেশ্বর অদ্বিতীয়) কথাটা গ্রহণ কত্তে পারে।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মন্ত্র জপ করা চলে কি

প্রশ্ন।—তা' হ'লে হিন্দুরা মুসলমানের মন্ত্র আর মুসলমানেরা হিন্দুর মন্ত্র জপ কত্তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—খুব পারে। চিত্তের উদারতা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পবিত্র মন্ত্র জপ করা খুব লাভজনকও বটে। কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বীর যে মন্ত্র নিজ সাধনধর্ম্মের বিরোধী, তা' কখনো জপ করা উচিত নয়। আমি ত' নিজ জীবনে অহিন্দুদের নানা মন্ত্র লক্ষ লক্ষ বার জপ করেছি। হিন্দুদেরও নানা সম্প্রদায়ের নানা মন্ত্র বলতে গেলে, কোনটাকেই বাদ দিই নি। তাতেই উপলব্ধিতে পেয়েছি যে, ওঙ্কারই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ।

নানা মন্ত্র জপের সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নানা মন্ত্র জপের সুফলের দিকটা হচ্ছে এই। এক একটা ক'রে মন্ত্রকে ধ'রে ঢেঁকীতে কোটার মত একেবারে ছাতু ক'রে ফেলতে পার্‌লে তবে তার ভিতরের সূক্ষ্ম রূপটী ধরা পড়ে, তখন ভগবানের গুপ্ত নাম প্রকাশিত হ'য়ে চোখের সাম্‌নে দাঁড়ায়, কাণের কাছে বাজে। তূলা-ধূনা কত্তে পার্‌লেই নানা মন্ত্র জপের এই শুভময় ফললাভ হয়।

নানা মন্ত্র জপের কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যারা চূড়ান্ত না ক'রে ছেড়ে দেয়, শেষ পর্য্যন্ত না দেখেই ফিরে আসে, এমন অস্থিরবুদ্ধি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে নানা মন্ত্রের সাধন কত্তে যাওয়ার বিপদ অশেষ। এদের মধ্যে অনেকে নিজ ইষ্টনামে নিষ্ঠা হারিয়ে শেষে গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়ায়, নয়ত নামে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়। এজন্যই আমি তোমাদের বলি,—সতীর পতি হবে এক, শিষ্যের গুরু হবে এক, ভক্তের ভগবান হবে এক। এই জন্যই আমি তোমাদের হাজার বার বলেছি,—জপের শত্রু বহুমন্ত্র। পঞ্চপতি একমাত্র দ্রৌপদীতেই সম্ভব হয়েছে, আর কারো পক্ষে নয়। লক্ষ্য ক'রে দেখো, নারীর আদর্শ সীতা, সতী, সাবিত্রী। মন্ত্র সম্পর্কেও এমন নিষ্ঠা চাই।

একেরে আপন করি'

একটী নাবগত যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির হস্তাক্ষর রক্ষার জন্য তাঁহার নোটবহি বাহির করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে লিখিলেন,—

একেরে আপন করি' সবারে আপন কর্,
একেরে লভিয়া বুকে সবারে হৃদয়ে ধর্।
একের মহিমা-মাঝে
বিশ্বের গরিমা রাজে
একেরে জানিয়া জান্ কোটি বিশ্ব-চরাচর।।
এক শুধু এক নহে বিচিত্র তাহার মূর্ত্তি,
একের মাঝারে কোটি ব্রহ্মাণ্ড লভিছে স্ফূর্ত্তি,
অশান্ত অনন্ত একে
আপন স্বরূপ শেখে,
বহুধা বিস্তারি' নিজে একেতে লভিছে পূর্ত্তি।।
মহাশূণ্যতার মাঝে পূর্ণতা যে দিল, এক
তাঁহারে জানিয়া, তুই অনিমেষ চোখে দেখ্
অতীত ও অনাগত
জানিত অপরিজ্ঞাত,
সকলের সমন্বয় সংহতি ও ব্যতিরেক।।

বহুর মাঝারে একের নিবাস

আর একজন তাঁহার খাতা বাড়াইয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

বহুর মাঝারে একের নিবাস,
একের মাঝারে সব ;
শূন্যের মাঝে পরিপূর্ণতা,
শান্তিতে মহারব।
কোলাহলে শোন ধ্যানমৌনতা,
স্থিরতার মাঝে গতি,
অঙ্কুরে বীজ, শেষে আরম্ভ,
সূচনায় পরিণতি।
সব বিপরীত মিলি, যেইখানে
নিজেরে হারিয়ে যায়,
একের মোহন মধুর মূরতি
সেথাই প্রকাশ পায়।

তৃষ্ণা নাই যার

অপর একজন তাঁহার খাতা বাড়াইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

অফুরন্ত আনন্দের অনন্ত ভাণ্ডার
তাঁহার সুন্দর মন, তৃষ্ণা নাই যার।

(সমাপ্ত)

অখণ্ড-সংহিতা প্রথম খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

---

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে ''ভাই''॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিয়া অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব।
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

---

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥
নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠবে মেতে,
সবাই সবার আপন হলে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই।
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।

(৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়।।

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়।।

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়।।
যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।

(৯)

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।
গভীর পঙ্কে আবদ্ধ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;

কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে ;
দাস, ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।
বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান
হইল বিভল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—
যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব।
কঙ্কাল-সার নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।
রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া ত্রাস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।
দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান
কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ,
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান্,

অখণ্ড-সংহিতা

সাধনার বলে হও মহীয়ান্,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে ;
সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহের,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে
আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভুবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বল্গা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

* অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত 'ভারতবর্ষ উঠিবে আবার'।